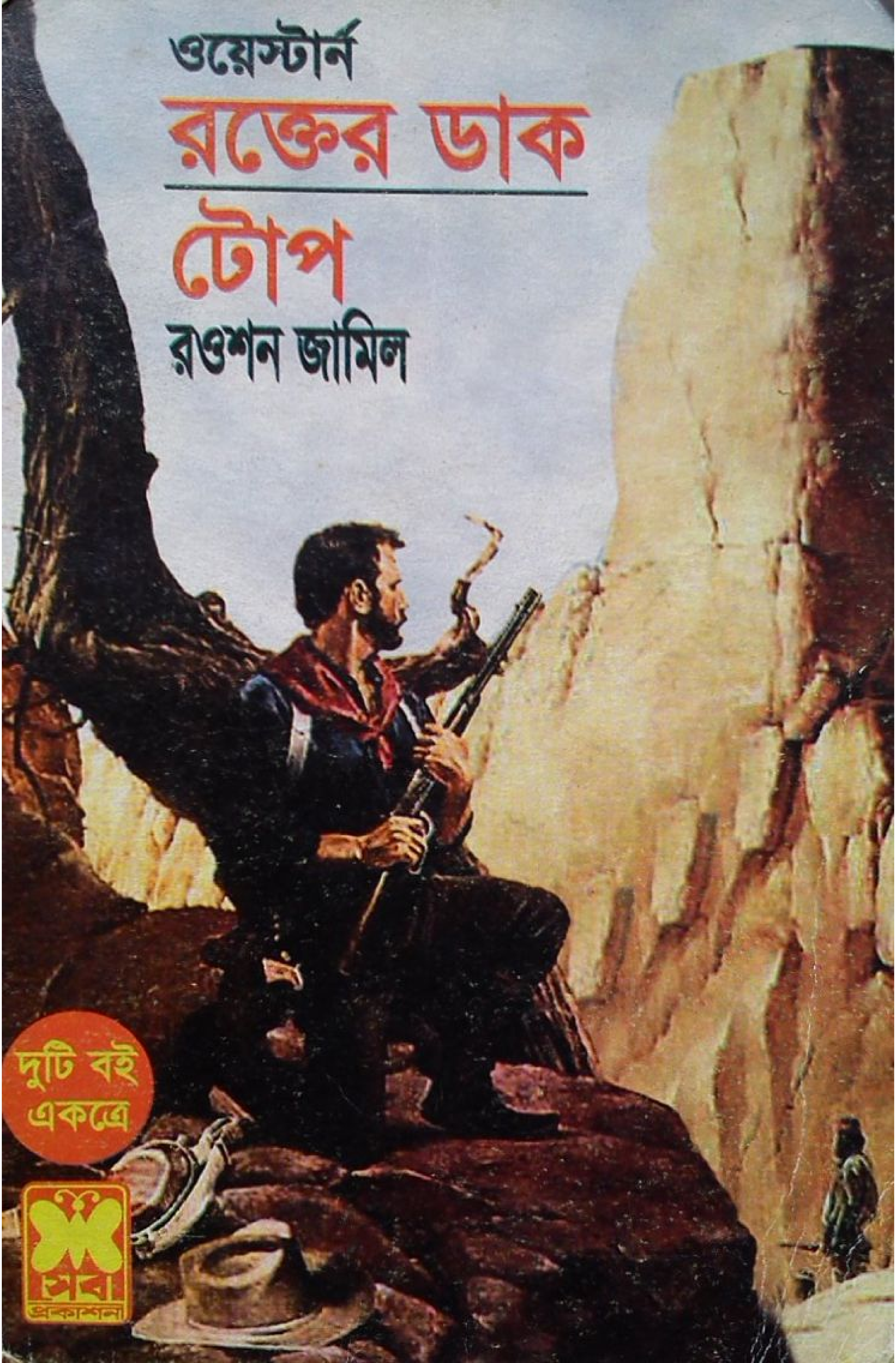
ওয়েস্টার্ন

রক্তের ডাক

টোপ

রওশন জামিল



দুটি বই একত্রে

সেবা প্রকাশনী

ওয়েস্টার্ন
দুটি বই একত্রে
রওশন জামিল

রক্তের ডাক

স্ত্রীর হত্যাকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরিন ওসমান। ওদিকে হত্যাকারীও চুপ করে বসে নেই – লেলিয়ে দিয়েছে চল্লিশজন ভাড়াটে পিস্তলবাজকে। অ্যারিযোনার মগলোন পর্বতমালায় ওরিনকে কোণঠাসা করল ওরা। খবর পেয়ে সারা দেশ থেকে ছুটে এল ওসমান পরিবারের সদস্যরা।

টোপ

প্রতিহিংসার আগুনে ধিকিধিকি জ্বলছে কিটি হার্স্ট ওসমান: ওর বাবার সর্বনাশ যারা করেছে তাদের ধ্বংস না করে ওর শান্তি নেই। ঘটনাচক্রে হাতের কাছেই পেয়ে গেল ওরিন ওসমানকে। অ্যাপাচিদের দুর্ভেদ্যতম ঘাঁটি সিয়েরা মাদ্রেসে ওকে পাঠানোর জন্যে টোপ ফেলল কিটি। ওরিন পা দিল ফাঁদে – সঙ্গে তিন বন্ধু। এক শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনি।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

রক্তের ডাক : ৫-১১২

টোপ : ১১৩-২৪০

প্রকাশিত ওয়েস্টার্ন

রওশন জামিল	
বাথান-১+২	৪৫/-
সন্ধান+ছায়াশত্রু	৪৯/-
প্রত্যয়+অতন্দ্রপ্রহরী	৪৭/-
ওয়ান্টেড+ভয়	৪৩/-
স্বর্ণতৃষা+কুহকিনী	৪১/-
রক্তের ডাক+টোপ	৪৯/-
কাজি মাহবুব হোসেন	
এরফান ভলিউম-১	৫১/-
(আলেয়ার পিছে, আর কতদূর)	
এরফান ভলিউম-২	৪৯/-
(মৃত্যুর মুখে এরফান+অ্যারিজোনায় এরফান)	
এরফান ভলিউম-৩	৫১/-
(ডেথসিটি+আবার এরফান)	
রক্তাক্তখামার+সেই এরফান	৫০/-
দাবানল ১+২	৩৬/-
ভাগ্যচক্র ১+২	৩৫/-
পাতকী+জ্বলন্ত পাহাড়	৪০/-
মানুষ শিকার+বাঁধন	৪০/-
এপিঠওপিঠ+লুটতরাজ	৪৫/-
রাইডার+অপমৃত্যু	৪৩/-
রক্তরাঙা ট্রেইল+ভয়াল শটগান	৪৪/-
ল্যাসোর ফাঁস+বুনো পশ্চিম	৪৪/-
পাহাড়ী স্লোন	২৮/-
নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী	২৯/-
হার্ডি স্লোন	৩২/-

শওকত হোসেন	
ঘেরাও+নীল নকশা	৪৯/-
অস্থির সীমান্ত+উত্তপ্ত জনপদ	৪২/-
প্রতিপক্ষ+দখল	৪৩/-
প্রহরী+সংঘাত	৪৭/-
আক্রান্ত শহর+অবরোধ	৪৯/-
বৈরী বলয়+অপসারণ	৪৫/-
ত্রাহি+জালিয়াত	৫৮/-
আসাদুজ্জামান/বজলুর রহমান	
দুর্বৃত্ত+বাজি	৫৭/-
কাজী শাহনূর হোসেন	
স্বর্ণসন্ধানী-১	২৬/-
স্বর্ণসন্ধানী-২	২৬/-
বদলা	২৬/-
কারসাজি	২৬/-
শয়তানের চক্র	২৬/-
লোভের ফাঁদে	২৬/-
মৃত্যুপ্রতীক্ষা	২৬/-
নির্জন প্রান্তর	২৯/-
জাতশত্রু	২৭/-
তাহের শামসুদ্দীন	
শ্যেনদৃষ্টি	২৬/-
কাজী মায়মুর হোসেন	
ওয়েস্টার্ন/রক বেনন ভলিউম-১	৩৪/-
(দস্যু বেনন+সীমান্তে সাবধান)	
উৎখাত	২৭/-

রক্তের ডাক

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৭

এক

ওসমানরা কুসংস্কারে বিশ্বাসী, কেউই বলবে না এ-কথা, তবু সেইদিন যদি আমি আসার আগে একটা রুমালে গিঁট দিয়ে রাখতাম, কিংবা আগুনে ফেলে আসতাম একটা বেলচা, তা হলে হয়তো এসব কিছুই ঘটত না।

ব্ল্যাক মেসার মাথায় উঠে আমি যে-দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার মন বুনো হাঁসের মত পশ্চিম আকাশে ডানা মেলতে চাইল।

সামনে, প্রায় যোজন দূরে খাড়া বিশাল এক প্রাচীর। ব্ল্যাক মেসার চেয়ে ওই প্রাচীরের উচ্চতা কমপক্ষে হাজার ফুট বেশি। মগল্যোন পবর্তমালা। স্থানীয় লোকদের ভাষায় মাগি-ওউন।

পশ্চিমে আকাশ-ছোঁয়া সব চুড়ো। দুর্গম, দুরারোহ। ঢালে গভীর অরণ্য। যে-অংশে বনভূমি হালকা হয়ে এসেছে, সেখানে মাঝে মাঝে ন্যাড়া খাঁজ চোখে পড়ে। তার ও-পাশে বিস্তৃত মরুভূমি।

উত্তর ও পুব দিগন্তে, স্মোকি পর্বতমালার গোড়ায় নিবিড় পাইন বন। ব্ল্যাক মেসার কোল ঘেঁষে, পায় ছশো ফুট নিচে খরস্রোতা নদী। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে দুরন্ত ফেনা। এখানে সেখানে গভীর টলটলে নীল পানি। নদীর পাড়ে অলসভাবে বিকেলের রোদ পোয়াচ্ছে এক ঝাঁক বক।

যত দেখছি, ততই বাড়ছে আমার মুগ্ধতা। টনটো বেসিনে যাচ্ছি আমরা। আমাদের ওয়াগন আর গরুর পাল নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমি রাস্তা খুঁজতে বেরিয়েছি। মনে হলো একটা সম্ভাব্য পথ দেখতে পেয়েছি, তাই ফিরে যাব বলে ঘুরতে শুরু করলাম। কিন্তু শেষ হলো না ঘোরা, তার আগেই খুলিতে আঘাত পেলাম একটা, পরমুহূর্তে অনুভব করলাম পড়ে যাচ্ছি আমি।

পড়ে যাচ্ছি? ছয়শো ফুট নীচে? আমার টুঁটি চেপে ধরল আতঙ্ক, একটা আদিম আর্তচিৎকার শুনতে পেলাম... আমার নিজের চিৎকার।

তারপর একটা ঝুলন্ত নড়বড়ে পাথরে ধাক্কা খেলো আমার কাঁধ। সেই আঘাতে খসে পড়ল পাথরটা, আবার নীচে পড়তে শুরু করলাম। খাড়া মসৃণ পাথুরে ঢালে আমার পা স্পর্শ করল আগে, তারপর ফের শূন্যে উঠে গেলাম, কাত হয়ে একটা পাথরের ওপর দিয়ে পড়ে গেলাম গড়িয়ে।

পাহাড়ী আগাছা আমাকে ধরে রাখল এক মুহূর্ত, প্রাণপণে চেষ্টা করছি ওগুলো আঁকড়ে ধরে থাকার, পারলাম না– ঝুপ করে পড়ে গেলাম নদীতে।

তলিয়ে গেলাম আমি। বাতাসের অভাবে আমার ফুসফুস ফেটে যাওয়ার দশা হলো। উঠতে চাইলাম, কিন্তু একটা জলজ লতা পায়ে জড়িয়ে গিয়ে টেনে ধরল নীচের দিকে। পাগলের মত পা ছুঁড়ছি। হঠাৎ ঢিলে হয়ে গেল লতার

বাধন, ছাড়া পেয়ে ভেসে উঠলাম একটা বাঁধের মুখে।

বাতাসের জন্যে হাঁ করলাম মুখ, তীব্র একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল, প্রায় আটকে গেল আমার দম, বড় বড় পাথরের মাঝ দিয়ে ভাসতে ভাসতে একটা ছয় ফুট জলপ্রপাতে গিয়ে পড়লাম। স্রোতের টানে বাঁধের আর একটা নালার ভেতর দিয়ে ভেসে গেলাম আমি, তারপর পায়ে তল পেলাম।

টলতে টলতে এগোচ্ছি, আচমকা একটা পিচ্ছিল পাথরে পা হড়কে পড়ে গেলাম আবার। এ-বার আরও গভীর পানিতে টেনে নিল স্রোত। জায়গাটা পাহাড়ের নীচের দিকে, গাছপালা হেলে পড়ে আড়াল তুলেছে। কোনওমতে একটা ডাল ধরে ফেললাম। অতিকষ্টে উঠে এলাম ডাঙায়। পাড় ঘেঁষেই একটা বুড়ো সাইক্যামেলার গাছ। পানির তোড়ে মাটি ক্ষয়ে গিয়ে গুঁড়িতে গর্ত সৃষ্টি হয়েছে।

জ্ঞান হারানোর আগে, বুকে হেঁটে ওই অন্ধকার ফোকরে আশ্রয় নিলাম আমি।

অনেকক্ষণ পর প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আমার চেতনা ফিরল। শীতে, কাঁপুনিতে বোধশক্তি ফিরে পাচ্ছি ধীরে ধীরে। হঠাৎ কান খাড়া হয়ে উঠল। কাছেই কথা বলছে কেউ।

'একটা ভবঘুরে কাউবয়কে বস এত ভয় পাচ্ছে কেন?'

'বসের ব্যাপারে নাক গলানোর জন্যে তোমাকে মাইনে দেয়া হয় না, ড্যাম্পার। বসের আদেশ, ওকে যেভাবেই হোক খুঁজে বের করে খুন করতে হবে। দরকার হলে এক হপ্তা খোঁজো, কিন্তু ওর লাশ চাই। পুঁতে ফেলতে হবে। আর যদি না মরে গিয়ে থাকে– আমরা সেটা পাকাপোক্ত করব।'

'ঠাট্টা করছ? ছশো ফুট ওপর থেকে পড়েছে শালা। বাজি ধরতে পারো, পড়তে শুরু করার আগেই পটল তুলেছে। অত কাছ থেকে মেকনের মিস হবে না। বিশেষ করে ওর টার্গেট যখন দাঁড়িয়েছিল।'

'ও-সব বুঝি না– লাশ চাই।'

মিলিয়ে গেল ওদের ঘোড়ার শব্দ। ভেজা মাটিতে নিঃসাড়ে পড়ে রইলাম আমি, ঠাণ্ডায় দাঁতকপাটি লাগার জোগাড়, বুঝতে পারছি এখুনি গরম হতে না পারলে মারা যাব। হাত নাড়ানোর চেষ্টা করলাম। এমনভাবে নেতিয়ে পড়ল যেন একটা নিষ্প্রাণ বস্তু।

একটা পাথরের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছি আমি। অসাড় আঙুলগুলো ওখানেই জমে গেছে। গর্তের আরেকটু ভেতরে সরে গেলাম। জমাট হিম কাদামাটি, তবু আপাতত এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে আমাকে। গর্ভস্থ ভ্রূণের মত গুটিয়ে ফেললাম নিজেকে। নানান প্রশ্ন ভিড় করছে মাথায়।

আমি কে? কোথায় এসেছি? কারা খুন করতে চায় আমাকে? কেন?

সমস্ত চিন্তাভাবনা গুলিয়ে যাচ্ছে, কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। দপ্ দপ্ করছে খুলি। ব্যথায় চোখ কোঁচকালাম। একটা পা ভীষণ শক্ত হয়ে গেছে, আদৌ নড়বে কিনা সন্দেহ। হাতের দিকে চোখ পড়তেই দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম। পতনের

সময়ে পাথর চেপে ধরার চেষ্টা করেছিলাম, তালুর ছাল উঠে গেছে– একটা নখ উপড়ে গিয়ে লাল মাংস বেরিয়ে পড়েছে।

মেকন নামের এক লোক গুলি করেছিল আমাকে, মনে পড়ল। বহু চেষ্টা করেও ওই নামের কাউকে মনে করতে পারলাম না আমি। বুঝতে পারছি বাঁক নেওয়ার সময় চোট পেয়েছিলাম বলেই এখনও বেঁচে আছি। ক্ষতস্থানে আঙুল ছোঁয়াতেই ছ্যাঁক করে উঠল, ঝট করে টেনে নিলাম। ঠিক ডান কানের ওপরে খুলির চামড়া পুরু হয়ে ছড়ে গেছে।

শীত জাগিয়ে দিয়েছে আমাকে। কণ্ঠস্বর মস্তিষ্ক সচল করেছে। এই দুটো উপাদান এক হয়ে বাঁচার সুযোগ দিয়েছে একটা। কিন্তু কী লাভ বেঁচে? ভাবলাম। নিথরভাবে পড়ে থাকতে হবে শুধু, তা হলেই হিমশীতল মৃত্যু দ্রুত গ্রাস করবে আমাকে। সমস্ত কষ্ট, যন্ত্রণার অবসান ঘটবে।

চকিতে আর একটা কথা মনে পড়ল।

ড্রুসিলা...আমার স্ত্রী ড্রুসিলা কেরি ওসমান। ও এখন কোথায়?

ড্রুসিলার কথা মনে হতেই বাঁচার আকুতি জাগল আমার মাঝে, ওঠার প্রয়াস পেলাম। পাহাড়ে, ওয়াগনে বসে আমার পথ চেয়ে আছে ও। আমাদের গরুর পালও আছে ওখানে। নিশ্চয়ই ড্রুসিলা দুশ্চিন্তা করছে আমার জন্যে। একা রয়েছে ও– একদম একা।

অন্ধকার হয়ে আসছে। রাত নামলেই ওদের তল্লাশিতে ভাটা পড়বে, অন্তত আজকের মত। সুতরাং আমাকে যদি কিছু করতে হয়, এখনই শুরু করতে হবে সেটা।

হামাগুড়ি দিয়ে গর্ত ছেড়ে বাইরে এলাম আমি, সাইক্যামোরের ডাল ধরে সোজা হলাম। সারাক্ষণ সেঁটে থাকছি গাছের গায়ে, যেন আড়াল পাই।

নদীর ধারে উন্মুক্ত বনভূমি, ঝোপ নেই বললে চলে, তবে ঝুরিবহুল বুড়ো সাইক্যামোরগুলো ছাতার মত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে, ফলে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে প্রায় জাঁকিয়ে বসেছে অন্ধকার।

আমার জামাকাপড় ছিঁড়ে ফালাফালা, বুটজোড়াও নেই। ঠক্‌ঠক্ করে পরস্পর বাড়ি খাচ্ছে দাঁত। পতনের সময় গান বেল্ট ঢিলে হয়ে খসে পড়েছে। পিস্তল, বউই নাইফ দুটোই গেছে ওই সাথে।

তুষারপাত শুরু হয়নি, তবু কনকনে ঠাণ্ডা। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার জন্যে গা মালিশ করতে লাগলাম। এর ফলে শরীরের উত্তাপ কিছুটা হলেও বাড়বে। একটা পা নাড়াতে পারছি না, তবে অনুভব করছি ভাঙেনি।

আশ্রয়...গরম আশ্রয় চাই আমার। অবশ্যি ওয়াগনে একবার পৌঁছুতে পারলে জামাকাপড়, কম্বল, পিস্তল সবই পাব। ড্রুসিলাকে দেখতে পাব। নিশ্চিত হতে পারব যে ও সুস্থ আছে। ড্রুসিলার ভালমন্দই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

জানি, আমাকে মাথা খাটাতে হবে। একমাত্র চিন্তাশক্তির জোরেই মানুষ সৃষ্টির সেরা জীবে পরিণত হয়েছে, বাবার কাছে এ-কথা জেনেছি আমি। তিনি

বলতেন, প্রাণিজগতের অন্যাদের সাথে মানুষের তফাত কেবল এক জায়গায়। বেঁচে থাকার জন্যে সবাই সংগ্রাম করছে, কিন্তু মানুষ তার চিন্তার সাহায্যে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়কে চিনতে পারে। প্রতিদিন সে যা করে, বা দেখে, তাতে তার অভিজ্ঞতা হয়। এবং এই অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-শক্তির বলে সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনামাফিক সে এগিয়ে যায় নিজের লক্ষ্যের দিকে।

আতঙ্কই এখন আমার মূল শত্রু; ঠাণ্ডার চাইতে ভয়ঙ্কর, কিংবা বলা যায় আমার সেই অজ্ঞাতনামা শত্রুর চেয়েও, যার ইশারায় আঘাত করা হয়েছে আমাকে– লোক লাগিয়ে খোঁজা হচ্ছে এখন।

কে হতে পারে লোকটা? আমাকে মেরে তার কী স্বার্থ?

বুনো অ্যাপাচি এলাকায় আছি আমি। কাছেপিঠে শ্বেতাঙ্গ বসতি খুব কম। ওদের কেউই চেনে না আমাকে।

বস্তুত, যদ্দূর জানি, আমরা এই অঞ্চলে এসেছি সে-খবর একজন ছাড়া অন্য কারও জানার কথা নয়। গ্লোবের স্টোরকীপার, ওর কাছে পথঘাটের হদিস জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন অনেকেই গ্লোবে দেখেছে আমাদের, কিন্তু ওখানে আমার কোনও শত্রু নেই, কথা বলিনি কারও সাথে, অথবা এমন কোনও আচরণ করিনি যে-কারণে কেউ অসন্তুষ্ট হয়ে থাকতে পারে আমার ওপর।

খুব সাবধানে, ধীরে ধীরে গভীর জঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হলাম। অস্তাচলগামী সূর্য পথের নির্দেশ দিচ্ছে।

নড়াচড়া যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে দিল। লক্ষকোটি সুচ ফুটছে যেন অসাড় পায়ে, তবু এগিয়ে চললাম– যথাসাধ্য চেষ্টা করছি আমার কোনও ট্র্যাক যেন রয়ে না যায় পেছনে।

হামাগুড়ি দিয়ে বালিয়াড়ির ওপর ওঠার সময় একটা গোলাকার ধারাল পাথর ঠেকল হাতে। প্রাগৈতিহাসিক কুঠার, হাতে বানানো।

চকিতে মনে পড়ল লিও প্র্যাগারের কথা। বস্টন কলেজের ওই তরুণ গবেষক মোরায়, ও'নীলের বাথানে বেশ কিছু দিন ছিল। সে-সময়েই আমাদের আলাপ-পরিচয়। রেড ইন্ডিয়ানরা আসার আগে এক প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এই দেশে। ওই গবেষক সেই প্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করছিল।

প্রায় চার-পাঁচ হপ্তা ওর সাথে-সাথে ছিলাম আমি। বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়েছি ওকে। বস্তুত আমিই প্যাগারকে দেখিয়েছিলাম কীভাবে গাছের ডাল চেঁছে তীরের ফলা বানাতে হয়। টেনেসির পাহাড়ে চেরোকী কিশোরদের মাঝে বড় হয়েছি আমরা, এ-সব আমাদের জানা।

অনুমান করলাম, ডিম্বাকৃতি এই পাথরটা, যার আয়তন আমার মুঠির সমান, ওই প্রাচীন সভ্যতারই একটা নমুনা হবে হয়তো। ঘষে ধার তোলা হয়েছে একদিকে। কুঠারটা হাতে পেয়ে কিছুটা সাহস বাড়ল আমার। বালিয়াড়ির মাথায় গিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

স্রোত আমাকে নদীর ভাটিতে কতদূর টেনে এনেছে জানি না, তবে

আধমাইলের বেশি হবে না নিশ্চয়ই। আমার মনে আছে ড্রুসিলাকে যেখানে রেখে এসেছি সেখান থেকে ওই মেসায় পৌঁছুতে ঘোড়ার পিঠে পাঁচ-ছয় মাইল পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল আমাকে।

অনুমানের ভিত্তিতে হাঁটা দিলাম। এমনিতে ওইটুকু দূরত্ব হেঁটে অতিক্রম করতে ঘণ্টা তিনেক লাগত; কিন্তু এখন আমি আহত, একটা পা মচকে গেছে, অসংখ্য চোট পেয়েছি শরীরে। প্রতিমুহূর্তে ধরা পড়ার ভয় আছে। তা ছাড়া এটা পাহাড়ী এলাকা; পড়ে গিয়ে যতটা পিছিয়ে পড়েছি সেটা পুষিয়ে নেয়ার জন্যে দুর্গম চড়াই ভেঙে ওপরে উঠতে হবে।

বারবার হোঁচট খেয়ে পড়ছি। কখনও বুকে হেঁটে অথবা পাথর কিংবা গাছের ডাল ধরে উঠছি। তবু একটু-একটু করে এগোচ্ছি আমি, অব্যাহত রেখেছি সংগ্রাম। একসময় যখন দেখলাম আর এগোনো সম্ভব নয়, একটা গুহা খুঁজে বের করলাম। গুহা বলতে ঝড়বাদলে মাটি সরে গিয়ে গর্ত সৃষ্টি হয়েছে, সামনে ঝোপঝাড় থাকায় প্রায় দৃষ্টিসীমার আড়ালে। কোনওমতে কুণ্ডলী পাকিয়ে একজন লোক থাকতে পারবে ওখানে। হামা দিয়ে ভেতরে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

বেশ কয়েক ঘণ্টা পর জেগে গেলাম ঠাণ্ডায়। কিন্তু আগুন ধরাতে সাহস হলো না– শত্রুরা আমার অবস্থান টের পেয়ে যেতে পারে। অগত্যা ঘুরে আর একটু ভেতরে গিয়ে ফের চোখ বন্ধ করলাম।

ভোর। প্রথম প্রহরের পাণ্ডুর আলো ফুটেছে আকাশে। ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসলাম, গুহার নিচু ছাতে চাঁদি ঠুকে গেল, তাড়াতাড়ি চেপে ধরলাম হাত দিয়ে, মনে পড়ল– আমি একজন তাড়া-খাওয়া মানুষ।

পড়ে গিয়ে আমার পা মচকে গেছে, তার ওপর রাতে হেঁটেছি, নাড়াতে পারছি না ব্যথায়। আগেই খোয়া গেছে বুটজোড়া, এখন মোজাও নেই। হয়তো কোথাও আমার ট্রেইল নির্দেশ করছে ওগুলোর অংশবিশেষ।

ঠাণ্ডায় নিস্তেজ হয়ে আসছে শরীর, তবু আপ্রাণ চেষ্টা করছি আমার সমস্ত মনোযোগকে একটি সমাধানের লক্ষ্যে পরিচালিত করার। হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি সামনের পথ আরও কঠিন– বিপজ্জনক।

এতক্ষণে ড্রুসিলা নিশ্চয়ই বুঝে গেছে কোনও মারাত্মক বিপদে পড়েছি আমি, কারণ বিয়ের পর থেকে একটা রাতও বাইরে কাটাইনি। আমার ঘোড়াটাও হয়তো ফিরে গেছে ওয়াগনে। সওয়ারিবিহীন ঘোড়া কেবলমাত্র একটি ইঙ্গিতই দিতে পারে: কোনও ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটেছে।

একটা বুড়ো সাইক্যামোরের গুঁড়ি থেকে দুটো আয়তাকার বাকল ছাড়িয়ে নিলাম। তারপর কুঠার ও দাঁতের সাহায্যে আমার বেল্টের চামড়া কেটে বাকলদুটো বাঁধলাম দুই পায়ে। এতে করে তালুদুটো খানিকটা হলেও রক্ষা পাবে।

এরপর মাটিতে গভীর গর্ত খুঁড়ে এক মানুষ সমান একটা লম্বা নরম শেকড়

বের করলাম। তারপর পাতাসমেত গাছের ডাল ভেঙে ওই শেকড় দিয়ে বাঁধলাম আমার গায়ের সাথে। জিনিসটা দেখতে হাতাহীন কোটের মত হলো। এখন বাতাসের বেগ সামান্য হলেও বাধাপ্রাপ্ত হবে, শরীরের উত্তাপ একেবারে হিম হয়ে যাবে না।

সময় পেলে কাজটা হয়তো আরও ভালভাবে করতে পারতাম। কিন্তু এ-মুহূর্তে সময়েরই প্রচণ্ড অভাব। ভয়ঙ্কর ফুলে গেছে ডান পা, অথচ সে-দিকে নজর দিতে পারছি না। বেঢপ কোটখানা বানাতে গিয়ে ইতিমধ্যে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে হাতের জখম থেকে। মাটি থেকে একটা মরা ডাল কুড়িয়ে নিয়ে রওনা হলাম আমি। ডালটাকে ছড়ি হিসেবে ব্যবহার করব।

গতরাতে আমি যদি এক মাইলও এগিয়ে থাকি, তা হলে সেটা আমার সৌভাগ্য– সামনে আরও কয়েক মাইল যেতে হবে। শুরুতে নিশ্চয়ই নদীর ধারে লাশ খুঁজবে ওরা, অন্তত সন্দেহজনক কিছু চোখে না পড়া অবধি।

সূর্য মাথার ওপরে। ক্যানিয়নের চড়াই বেয়ে সাইপ্রেস ঝোপের দিকে এগোচ্ছি আমি। ডানে বাকহেড মেসার দেয়াল। ওই মেসার উত্তরে ড্রুসিলা এবং ওয়াগন রেখে এসেছি। ওয়াগনে রাইফেল, বাড়তি পিস্তল আছে। একবার যদি পৌঁছুতে পারি ওখানে...

হঠাৎ দূরে একটা চিৎকার শুনে ধক্ করে উঠল বুক। থমকে গেলাম মুহূর্তের জন্যে, কান খাড়া করলাম। বোধ হয় কারও চোখে পড়েছে কিছু, ডাকছে অন্যদের। অন্তত তাই ভাবতে হবে আমাকে। এখন থেকে একজন জ্যান্ত মানুষকে শিকারের জন্যে খুঁজবে ওরা।

ওয়াগনের খবর যদি ওদের জানা থাকে– এবং সেটাই স্বাভাবিক– অনেক হালকা হয়ে যাবে ওদের দায়িত্ব। শত্রুর সংখ্যা কত আমার ধারণা নেই, তবে বুঝতে পারছি ওদেরকে কেবল ছড়িয়ে পড়ে মেসার দেয়ালের দিকে এগোতে হবে। নদীকে মূল সীমারেখা বা বেইস লাইন হিসেবে ধরে গোটা এলাকায় তল্লাশি চালাতে পারবে ওরা। তারপর মেসার মাথায় উঠে ওয়াগনের ওপর চড়াও হবে। সে-ক্ষেত্রে আমার পালানোর সুযোগ একরকম বন্ধই হয়ে যাবে।

দুর্ঘটনার পর থেকে নিজের কথা ভাবতে ইচ্ছে করছে না আমার। জানি অবস্থা ভাল নয়, তবে কতটা খারাপ জানতে ভয় হচ্ছে। ওয়াগনের কাছে না যাওয়া অবধি এ-ব্যাপারে কিছুই করতে পারব না আমি। এই মুহূর্তে ওষুধ বা একজন ডাক্তারের চেয়ে একটা পিস্তলই আমার বেশি দরকার। পিস্তল পেলে যে-লোক আমাকে অ্যামবুশ করেছিল তার সঙ্গে রফা করতে পারব।

ছড়ির সাহায্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছি। পা ফুলে প্যান্টের সেলাই ছিঁড়ে পড়ার দশা হয়েছে। এভাবে ফুলতে থাকলে বাধ্য হয়ে আমাকেই সেলাই কেটে দিতে হবে। হাতের অবস্থা সঙ্গিন, মাথা ঝিমঝিম করছে। খচখচ করে কী যেন বিঁধছে বুকের একপাশে, হয়তো পাঁজরের কোনও হাড় ভেঙে গেছে। কিন্তু সে-দিকে আমার খেয়াল নেই– এখনও যে বেঁচে আছি এই তো ঢের।

আহত হওয়ার সময়ে ব্ল্যাক মেসার এককোণে দাঁড়িয়েছিলাম। দক্ষিণপুবে বাকহেড মেসার সাথে যোগাযোগ আছে ওটার। আমার ধারণা, সাইপ্রেস ঝাড় পেরিয়ে ক্যানিয়নটা সম্ভবত বাকহেড মেসাটার পশ্চিমে গিয়ে পড়েছে। এখন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে থেকে সোজা এগোলে হয়তো বাকহেডের মাথায় চড়তে পারব। আবার হাঁটতে লাগলাম আমি।

অজস্র কাঁটা ঝোপ আর পাথরে বোঝাই ক্যানিয়ন। সাধারণত এমনটা দেখা যায় না। বারদুয়েক আগুন লেগেছিল এখানে, বিক্ষিপ্ত কিছু পোড়া কাঠ তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ফের বেড়ে উঠেছে গাছ, আগের চেয়েও মোটা-তাজা হয়েছে জংলা ঝোপ। প্রতিটি দাবানলের পর এমনটিই ঘটে থাকে প্রায় সব জায়গায়।

একটা দিক আমার পক্ষে আছে। ঘোড়াসহ ক্যানিয়নের ওপরে ওঠার চেষ্টা করবে না কেউ। কাউপাঞ্চারদের রগ আমার চেনা, নিতান্ত দায়ে ঠেকে না পড়লে ঘোড়া থেকে নামার বান্দা নয় ওরা।

স্যাডলে চেপে একজন কাউহ্যান্ড দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা খাটতে রাজি। কিন্তু তাকে যদি কখনও হাঁটতে বলা হয়, কোথাও বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে সে– তারপর ফের জিনে উঠে বাড়ির পথ ধরবে।

ঠাণ্ডা কমেনি... বরং বাড়ছে। এ-ব্যাপারে মাথা না ঘামানোর চেষ্টা করছি, এগিয়ে যাচ্ছি ইঞ্চি ইঞ্চি করে। হাড়-ভাঙা পরিশ্রমে এই শীতেও ঘামছি আমি, এবং এটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে বেশি। ঘাম একবার জমে গেলে রক্ষে নেই, ঠাণ্ডা প্রতিরোধ করতে গিয়ে আমার শরীরের সমস্ত উত্তাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে– মারা যাব আমি।

একবার থেমে বরফ খুঁড়ে পানি খেলাম। ক্যানিয়নের এই অংশে সূর্যের আলো ঢোকে না বিশেষ, তাই ইতিমধ্যেই বরফ জমেছে। অধিকাংশ সময় অবিরাম এগোচ্ছি, কীভাবে নিজের দায়িত্বে অবহেলা করতে হয় আমি শিখিনি। আমার দীর্ঘ একহারা শরীরটা বেড়ে উঠেছে কঠোর অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে। দেশ আমার টেনেসির পাহাড়ে। ওখানকার লোকেরা বলত আমি সুর-কালা, নাচের আসরে বেমানান কারণ আমার জোড়া মিলবে না। কিন্তু লড়াইয়ের মাঠে সর্বদা হাজির থাকতাম, মুষ্টিযুদ্ধ, পিস্তল, বা চাকুবাজি এগুলোর কোনওটিতেই আমার সাথে পেরে ওঠা কঠিন ছিল। আমাদের ওসমান পরিবারের সবাই দক্ষ বন্দুকবাজ।

দুপুর নাগাদ ক্যানিয়নের শেষ-প্রান্তে চলে এলাম। অদূরে মেসার পাথর ভেঙে ঝুপ করে নেমে গেছে আমার একটা ক্যানিয়নে। অন্যদিকে, আমার ডানে বাকহেড মেসার বিশাল সমতল ক্ষেত্র। কয়েক ক্রোশ জুড়ে নিবিড় বনানী।

পরিস্থিতি বিচার করার জন্যে পিছিয়ে ঝোপের ভেতর গিয়ে বসলাম আমি। মাথা কাজ করছে না ঠিকমত। কষ্ট হচ্ছে চিন্তা করতে– তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে সব কিছু। ঘামে ঝাপসা হয়ে আসছে চোখ, কপাল মুছলাম হাত দিয়ে

ওয়াগনটা আনুমানিক তিন মাইল দূরে আছে এখান থেকে। ওই দূরত্ব পেরোতে হয়তো সূর্যাস্ত হয়ে যাবে। তার বহু আগেই অশ্বারোহীরা তোলপাড় করবে মেসা; প্রতিটা ঝোপ, প্রতিটা গাছ, প্রতিটা পাহাড়ী ফাটল খুঁজবে তন্নতন্ন করে।

আমি শক্তপালা এ-কথা আমার পরিচিত লোকেরা সকলেই স্বীকার করে। আমি খালি পায়ে ছয় ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা। একশো আশি পাউন্ড ওজন। এর প্রায় সবটাই কাঁধ ও বাহুতে। দশাসই লোক আমাকে বলা যায় না, কিন্তু যখন কোনও কাজে হাত দেই সেটা করে তবে ছাড়ি।

তবে এখন আমি দুর্বল। প্রচুর রক্ত হারিয়েছি, তার ওপর খাটুনি– ক্লান্ত বোধ করছি। বুঝতে পারছি শরীরের এই অবস্থায় লড়া সম্ভব হবে না। পায়ে চোট, দৌড়ুতেও পারব না। এখন ওদের সামনে পড়লে চোখের নিমেষে মারা পড়ব– আমাকে খুন করবে, হয়তো এ-জন্যে টাকাও দেয়া হয়েছে লোকগুলোকে।

মেসা পেরোতে হলে চার হাত-পায়ে হাঁটতে হবে, বেশিক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। সমতল প্রান্তরে আমাকে ধরে ফেলা মোটেই কঠিন হবে না একজন ঘোড়সওয়ারের পক্ষে। এই প্রাগৈতিহাসিক কুঠারে কুলোবে না তখন, আরও শক্তিশালী অস্ত্র থাকা প্রয়োজন ছিল আমার কাছে।

ঘুরে হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের গভীরে ঢুকে গেলাম, চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম পাইন পাতার ওপর। মাথা ব্যথা করছে, ভারি হয়ে আসছে চোখের পাতা।

'ড্রু,' বিড়বিড় করে বললাম, 'আমি আর পরছি না– আমাকে মাফ করে দাও।'

গুটিসুটি মেরে আরও গভীরে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করছি, হঠাৎ পাথুরে জমিতে খুরের শব্দ পেয়ে জমে গেলাম পাথরের মত। প্রতিমুহূর্তে বাড়ছে হৃদ্স্পন্দন। তারপর একসময় দূরে মিলিয়ে গেল শব্দটা।

বেলুনের মত ফুলে উঠেছে আমার মাথা। ওঠাতে গিয়ে নিজের কাছেই অসম্ভব ভার বোধ হলো, মনে হলো আর কোনও দিন বুঝি মাটি থেকে উঠতে পারব না।

'ড্রু, আ... আমি আসছি–'

দুই

একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে ফাঁকা বনস্থলীর দিকে তাকিয়ে আছি আমি। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

ওয়াগনটা নেই।

শুক্লপক্ষের চাঁদ আকাশে। নীচে, বনের মাঝে নিস্তব্ধ নিশ্চল ধবধবে সাদা

শূন্য মাঠ। চারপাশের গাছপালা জমাট অন্ধকারের দেয়াল তুলে দাঁড়িয়ে। প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় হা-হা করে উঠল পাইন বন। শীত-নিশির এই প্রথম প্রহরে ঈশ্বর যেন তাঁর সমস্ত শিল্পনৈপুণ্য উজার করেছেন কিছু মানুষকে বিব্রত করতে, যাদের একজন বোধ হয় আমি।

ক্যানিয়নে অনেকক্ষণ মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়ে থাকার পর এখানে এসেছি। ওখানে সুচ-ফোটানো ঠাণ্ডায় বরফের ওপর মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিলাম আমি। যখন রাত নেমেছে কেবল তখনই সাহস পেয়েছি নড়ার। অচেনা আততায়ীরা অনবরত ঘোরাফেরা করছিল আমার কাছাকাছি। হন্যে হয়ে উঠেছে ওরা। একবার, ডান দিকে অস্পষ্ট কথাবার্তার আজওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম, ক্যাম্প ফায়ারের শিখা দেখেছি এক ঝলক।

ওরা কত অজস্রবার আমার পাশ দিয়ে চলে গেছে সে-সব কিছুই বলতে পারব না, খুব অল্প সময়েই সজাগ ছিলাম আমি। তবু ছায়ারা গাঢ় হতেই আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জাগিয়ে দিয়েছে আমাকে; বাতাসে এক মুহূর্ত কান পেতে, সেই নড়বড়ে ছড়িতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি।

সমস্ত যন্ত্রণার মাঝেও এখানে আসার জন্যে সারাটা দিন উন্মুখ হয়েছিলাম আমি, স্বপ্ন দেখেছি এই জায়গার। জানতাম, আমার কষ্ট দূর করার মত জিনিস মিলবে ওয়াগনে– অস্ত্র পাব। সবচেয়ে বড় কথা, ড্রুসিলা থাকবে ওখানে; আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব সুস্থ রয়েছে।

কিন্তু ও নেই। চলে গেছে।

ক্ষত পরিচর্যার চেয়ে এখন বরং অস্ত্রেরই আমার প্রয়োজন বেশি। আমি জাত লড়াকু... এ আমার মজ্জাগত স্বভাব, সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আহত হলেও লড়ব; যদি মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়ায় তবু চেষ্টা চালাব লড়তে।

এমনিতে আমি শান্ত সাদাসিধে মানুষ। গায়ে পড়ে লাগতে যাই না কারও সঙ্গে। কিন্তু যদি বাধ্য করা হয়– পাল্টা আঘাত হানব। তাই বলে এ-জন্যে আমার মনে কোনও অহঙ্কার নেই। বড়াই করি না। জানি, এই বৈশিষ্ট্য জন্মের সময়ে উত্তরাধিকার সূত্রে আমার রক্তে চলে এসেছে।

আমার লাগামহীন জীবনে ড্রুসিলাই প্রথম লাগাম, পেমের অনাবিল ছোঁয়া এনেছিল ও। বলতে কী, ওর প্রতি ভালবাসাই আমাকে টেনে এনেছে এখানে।

অথচ সেই ড্রুসিলা চলে গেল! ও ভাল করেই চেনে আমাকে। জানে, আমি সহজে মৃত্যুবরণ করার পাত্র নই। বুনো প্রকৃতির সাথে ড্রুসিলার পরিচয় ঘনিষ্ঠ। ওর অন্তত বিশ্বাস করা উচিত ছিল আমি ফিরে আসব– কেবল সময়ের অপেক্ষা। স্বেচ্ছায় এখান থেকে যায়নি ড্রু, অনুভব করলাম, বিশেষত ও যখন জানে যত বড় দুর্ঘটনাই ঘটুক– আমি ফিরে আসবই।

সহসা আর একটা জিজ্ঞাসা জাগল মনে। এ-জায়গায় আমি ফিরে আসব এটা একরকম জানা কথা। অথচ এখানে কোনও পাহারা নেই। আততায়ীদের একজনও আসেনি এখানে। কেন?

এর উত্তর সহজ, আপন মনেই জবাব দিলাম আমি, এই জায়গার খবর ওরা

জানে না। পরমুহূর্তে মনে হলো তাই-বা কী করে হয়? একটা ওয়াগন, গরুর পাল লুকিয়ে রাখা কি এতই সোজা?

আর দেরি করলাম না আমি। ওয়াগনটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল ছড়ি ঠুকে ঠুকে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। কোনও ট্র্যাক নেই। যেখানে আগুন জ্বেলেছিলাম সে-দিকে তাকালাম। কয়লা, ছাই কিছুই চোখে পড়ল না। কফির পাত্র চড়ানোর জন্যে একটা লম্বা খুঁটি গুঁজে দিয়েছিলাম। এখনও ওতে আগুন থাকার কথা, সেটাও নেই।

তবে কি ভুল জায়গায় এলাম? না... একটা বিশাল বাজ-পড়া পাইন গাছের গোড়া থেকে জ্বালানি কাঠ জোগাড় করেছিলাম আমি, যথাস্থানেই আছে ওটা। যে-পাথরের ওপর বসে রাইফেল সাফ করেছিলাম সেটাও আছে।

কেবল আমার খচ্চরটানা ওয়াগন আর গরুগুলো নেই... এবং সেই সঙ্গে ড্রুসিলা।

ওকে ভালবাসি আমি। ড্রুসিলা আমার স্ত্রী: কলর‍্যাডোর এক সুউচ্চ পাহাড়ে অসুস্থ পরিত্যক্ত অবস্থায় পেয়েছিলাম ওকে, পরে উদ্ধার করে নিজের কেবিনে নিয়ে আসি।

মনে হচ্ছে ঠাণ্ডায় আমার মাথা ভোঁতা হয়ে গেছে। শীত করছে ভীষণ। পলকা ছড়িতে ভর দিয়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালাম চারপাশে; কোনও সূত্র বা আশার আলো দেখতে পেলাম না।

ড্রুসিলা আমাকে ফেলে রেখে যাবে না। যদি একান্তই কোনও কারণে যেতে বাধ্য হয়ে থাকে, মাটিতে ট্র্যাক থাকবে ওর।

আতঙ্ক গ্রাস করল আমাকে। অনুভব করলাম আতঙ্কের ভৌতিক হাত সড়সড় করে আমার মেরুদণ্ড বেয়ে গলার দিকে এগোচ্ছে। ভয়ঙ্কর, সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটেছে এখানে। আমাকে ধরার জন্যে মরিয়া প্রচেষ্টা, ট্র্যাক মুছে ফেলা সব কিছুই একটা কুকর্মের ইঙ্গিত দিচ্ছে; তবে সেটা কী ভাবতে সায় দেয় না আমার মন।

জেদ চেপে গেল আমার, অতিকষ্টে নড়েচড়ে উঠলাম, অসহ্য চিনচিনে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল সারা গায়ে। ওই লোকগুলোর ক্যাম্প আমি খুঁজে বের করব, দেখব ড্রুসিলা আছে কি না। এই সুযোগে শত্রুদেরও চিনতে পারব। ওয়াগন, গরু ওগুলোও নিশ্চয়ই পেয়ে যাব ওখানে।

ঘুরে এগোনোর চেষ্টা করলাম। হাত ফসকে পড়ে গেল ছড়িটা। আছাড় খেলাম আমি, দাঁতে দাঁত চেপে দমন করলাম আর্তনাদ। তুষার-জমাট মাটিতে দুহাতের ভর রেখে চেষ্টা করলাম ওঠার, কিন্তু আবার পড়ে গেলাম মুখ থুবড়ে, মাথায় আঘাত পেয়ে নিমেষের জন্যে গোটা পৃথিবী দুলে উঠল আমার সামনে, তারপর চেতনা লোপ পেল।

দ্রষ্টব্য: স্বর্ণতৃষা।

সারারাত ওভাবেই পড়েছিলাম আমি, যখন জ্ঞান ফিরল তখন সূর্য উঠেছে। নিথর হয়ে শুয়ে রইলাম কিছুক্ষণ, হাড়ের সমস্ত ঠাণ্ডা শুষে নেওয়ার সুযোগ দিচ্ছি রোদকে। আমার ঝিমুনি কাটেনি– পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন নই। তারপর একসময় ফিরে এল বোধশক্তি; মনে পড়ল আমি একজন তাড়া-খাওয়া মানুষ, সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় পাইন গাছের তলায় শুয়ে আছি।

সাবধানে মাথা ঘোরালাম। পেটের ভেতর পাক মারছে, মনে হলো নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে, বমি চাপলাম বহু কষ্টে।

আমার চোখ এখন একটা বিন্দুতে স্থির। পাইন পাতায় হা-হা বাতাস খেলছে। সামনেই বনস্থলী– খাঁ খাঁ করছে।

দ্রুত সচল হলো স্নায়ু। উজ্জ্বল দিনের আলোয় জরিপ করলাম গোটা এলাকা। একটা ট্র্যাকও দেখতে পেলাম না; কোন পথে এসেছিলাম আমরা, ওয়াগনটাই-বা গেল কোথায় বোঝার উপায় নেই। সব যেন বেমালুম মিশে গেছে।

পাহাড়ী এলাকায় টিকে থাকতে হলে যে-সব জিনিস দরকার– অস্ত্র, খাবার, থাকার জায়গা, জামাকাপড়– কিছুই আমার নেই। তবু পাছে ড্রুসিলার কোনও অমঙ্গল হয়ে থাকে, এই ভয়েই শঙ্কিত বোধ করছি। বেশ বুঝতে পারছি, আমাকে গায়েব করে ফেলার জন্যে কেউ একজন এতটা উঠে-পড়ে লেগেছে যে আমাদের উপস্থিতির সব চিহ্ন মুছে ফেলেছে।

এক ঘন্টা বাদে শত্রু ক্যাম্পে হাজির হলাম আমি। এখানে রাত কাটিয়েছে ওরা। এখন কেউ নেই। কমপক্ষে বারোজন লোক ছিল। অসংখ্য ট্র্যাক চোখে পড়ল। সিগারেটের শেষাংশ, খালি কফিপট ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একটা আধখাওয়া রুটিও দেখতে পেলাম।

কিন্তু কোনও ওয়াগন ট্র্যাক আমার নজরে এল না। একজোড়া ক্ষুদ্র বুটের ছাপ খুঁজছিলাম, তাও দেখতে পেলাম না। অথচ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ড্রু সুকৌশলে একটা না একটা সূত্র রেখে যাবেই। আমার রীতিনীতি ও জানে। ট্রেইলে চলাকালে কী কী ব্যাপারে নজর রাখতে হয় সব শিখিয়েছি ওকে... অথচ সেগুলোর কিছুই নেই ওখানে। নিশ্চিত হলাম ড্রুসিলা অন্য কোথাও আছে হয়তো– এই ক্যাম্পে সে একবারও আসেনি।

অনেক চেষ্টা করেও হিসেব মিলছে না। ওয়াগনটা হাওয়া হয়ে গেল কোথায়? এই মেস্যা থেকে বেরোনোর পথ মাত্র তিনটে। সবখানেই ঢুঁ মেরেছি। কোথাও কোনও ট্র্যাক দেখতে পাইনি। তা ছাড়া ছয়টা খচ্চরই মিসৌরির। দৈত্যাকার জীব। ওগুলোও ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেছে। ওই ওয়াগনে আমাদের দেড় টন রসদ ছিল।

ক্রমশ আমার সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে, ড্রুসিলা বা ওয়াগনের ব্যাপারে ওই লোকগুলো কিছুই জানে না। সে-ক্ষেত্রে এমন কী ঘটল যে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা? ড্রুসিলা এখন কোথায়? কার নির্দেশে গুলি করা হয়েছিল আমাকে? তার কী স্বার্থ এতে?

এই সাথে আরও কয়েকটা প্রশ্ন দানা বাঁধল আমার মনেঃ আমাকে যারা খুন করতে চায় তারা এই মুহূর্তে কোথায়? চলে গেছে? নাকি আবার ফিরে আসবে?

সন্দেহ নেই, খোঁজা সবে শুরু হয়েছে। এ-রকম মরিয়া তল্লাশি এত তাড়াতাড়ি শেষ হতেই পারে না।

গাছপালার ভেতর দিয়ে এগোচ্ছি আমি, একটুতেই হাঁফ ধরে যাচ্ছে, মাঝে-মধ্যে জিরিয়ে নিচ্ছি থেমে।

ওয়াগন রেখে আমি যখন বাকহেড মেসা থেকে টনটো বেসিনে যাওয়ার পথ সন্ধান করছিলাম, ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় একটা গভীর ক্যানিয়ন চোখে পড়েছিল। দক্ষিণপশ্চিমে চলে গেছে ওটা। প্রায় পাঁচশো ফুট গভীর। ভয়ঙ্কর দুর্গম অঞ্চল, তবে একটা ঝরনা রয়েছে নীচে। পানি যখন রয়েছে, শিকারও পাওয়া যাবে ওখানে।

উপশমের জন্যে ওয়াগনের ভরসায় থাকলে আর চলবে না। এখন থেকে আমি একা; বিরূপ বিশ্বে বাইরের সাহায্য ছাড়া বাঁচতে হবে—আমি শত্রুব্যূহের মাঝে পড়েছি।

সারাদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় আমার দফা যখন প্রায় ঠাণ্ডা, তখন সন্ধ্যের মুখে একটা প্রাকৃতিক সেতুর তলায় আশ্রয়ের সন্ধান পেলাম। সেতু বলতে শুয়োরের পিঠের মত একটা বিশাল চুনাপাথর, ঝরনার পানি থেকে কম করে হলেও একশো আশি ফুট ওপরে মুখ বাড়িয়ে আছে। পাথরের নীচে গর্ত। একজন মানুষ গুটিসুটি মেরে থাকতে পারে। হিংস্র পশু ছাড়া আর কোনও দুর্যোগের ভয় ওখানে নেই বললে হয়। চারপাশে বিক্ষিপ্ত ঝোপ আর বড় বড় পাথরচাঁই সুন্দর আড়াল তুলেছে।

পাথর ঠুকে শুকনো ডালপালা দিয়ে ছোট্ট করে আগুন ধরালাম। উষ্ণতায় আরাম পাচ্ছি। অবসাদ, পেশীর জড়তা কাটল কিছুটা। ঠাণ্ডা ভাব দূর হলো—যদিও উল্লেখ করার মত নয়।

একটা বাকলের চারদিক মুড়ে খানিকটা পানি গরম করলাম তাতে। হাত ধুলাম সাবধানে, তারপর প্যান্ট নামিয়ে তাকালাম পায়ের দিকে। ক্ষতবিক্ষত, জায়গায় জায়গায় কালসিটে, আসল মাপের দেড় গুণ ফুলে গেছে। ছেঁড়া শার্টের অবশিষ্টাংশ দিয়ে সেঁক দিলাম প্রায় এক ঘণ্টা। এতে কতটা কী হবে জানি না, তবে বেশ ভাল বোধ হচ্ছে।

আগুন নিভিয়ে গাছের পাতা বিছালাম এককোণে, তারপর শুয়ে পড়লাম কুণ্ডলী পাকিয়ে।

প্রচণ্ড খিদে দুঃস্বপ্নের কবল থেকে উদ্ধার করল আমাকে। তবে আগে পানি গরম করে পায়ে সেঁক দিলাম আরেক দফা, উষ্ণ পানি খেলাম কয়েক ঢোক—ঠাণ্ডা শরীর গরম হবে। মনে হলো ইহজীবনে গরমের সুখ আর বুঝি আমার কপালে হবে না। খিদেয় ইঁদুর ডাকছে পেটে তবু এই মুহূর্তে আমার সবচেয়ে আগে পোশাক দরকার— গরম তুলতুলে পশমী কাপড়।

সেঁক দিচ্ছি, সেই সাথে সচল আমার মাথা। আমাকে আক্রমণ করার কারণ হাতড়াচ্ছি মনে মনে।

সীমান্ত এলাকায় মোটিভ বোঝা তেমন কষ্টের কাজ নয়। এখানে সব কিছুই পরিষ্কার। বাঁধাধরা ছককাটা জীবন। প্রত্যেকেই জানে সমাজে তার অবস্থান কোথায়। সবার সমস্যাই প্রায় এক। ফালতু অপচয়ের মত সময় নেই কারও। প্রত্যেকেই বেঁচে থাকার সংগ্রামে নিরন্তর ব্যস্ত। আমার ধারণা, মানুষের যখন খাওয়া-পরার অভাব থাকে না, থিতু হয়ে বসে, কেবলমাত্র তখনই সে পরের ব্যাপারে নাক গলানোর ফিকির খোঁজে।

কিন্তু সীমান্তের পরিস্থিতি এইরকম নয়। মহান, বাহাদুর হওয়ার সুযোগ যেমন আছে, তেমনি ইচ্ছে করলেই শঠ, নীচ হওয়া যায়; তবে সে-চেষ্টা করার আগে কঠিন লোক বলে নাম কিনতে হবে তাকে– নইলে দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারবে না এ-পথে। এইধরনের লোকেরা সাধারণত পরিণামে গুলিতে কিংবা ফাঁসির দড়িতে মারা পড়ে। আমি লক্ষ করেছি যখনই সহজ হয়ে আসে মানুষের জীবনযাত্রা, নিজের ব্যাপারে তার উদ্বেগ বাড়ে।

সীমান্তবাসীদের গোপন পাপ বলে কিছু নেই। যারা নিজেদের পাপ ঢাকতে সচেষ্ট, তারা ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় বাস করে। কারণ ওখানে লুকোনো সম্ভব। সীমান্তে জায়গা অনুপাতে লোক কম। ফলে এ-দেশে গোপন আর গোপন থাকে না।

কেউ আমাকে খুন করতে চাইছে, এবং স্পষ্টত সেই লোকই আমার ওয়াগন লোপাট করেছে, এবং ড্রুসিলা আর গরুগুলোকে ধরে নিয়ে গেছে সেই সাথে।

ওয়াগন গুম করার অর্থ আমি বুঝি। ড্রুসিলার মত সুন্দরী মেয়ে যে-কোনও পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ওর চেয়ে ওয়াগন আর রসদের প্রতিই ওদের লোভ বেশি। এ-রকম ভাবার অবশ্যি কারণ আছে।

সীমান্তে একজন লোক আর যাই করুক, মেয়েছেলের শ্লীলতা হানি করে না। এমনকী সে যদি বেশ্যা হয় তাও নয়। এখানে মেয়েলোক বিশেষ নেই, তাই সম্মান যথেষ্ট। রাস্তায় ওদের টিটকারি দেওয়ার অপরাধে বহু কুখ্যাত আউট-ল তার দলের লোককে খুন করেছে।

আমার পা এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছে, নাড়াতে পারছি সহজে, ফোলাও কমে গেছে বেশ।

দুপুরের দিকে খরগোশ পেলাম। একটা ইংরেজির 'ওয়াই' আকৃতির ডালের সাহায্যে খুঁচিয়ে গর্ত থেকে বের করলাম ওকে। তারপর ভোঁতা কুঠার দিয়ে জবাই করে আগুনে ঝলসে খেলাম। কিন্তু একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ শুধু খরগোশ খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। চর্বিযুক্ত মাংস চাই তার।

বহু হরিণ চোখে পড়ছে। একবার একটা এলক দেখলাম, কমপক্ষে আড়াইশো পাউন্ড মাংস হবে। কিন্তু আমার চাহিদা আরও ছোট কিছু। একে তো বিরাট জানোয়ার বধ করার মত অস্ত্র নেই কাছে, তা ছাড়া আমি একা মানুষ– বেশি মাংস দিয়ে করব কী?

বিকেল প্রায় গড়িয়ে গেছে, ক্লান্তি ভর করছে আমার শরীরে, বাকহেড মেসার এককোণে একটা পাথুরে কারনিসে শুয়ে ঝিমোতে লাগলাম। সামনে ও বাঁয়ে পাইন ক্রীকের ভয়াল ক্যানিয়ন। পেছনে মেসা।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে দেখে ঠিক করলাম আর দেরি না করে ফিরে যাব গুহায়। রওনা হব, হঠাৎ বাতাসে নাক টানলাম বার কয়েক... ধোঁয়ার গন্ধ আসছে। পোড়া কাঠের গন্ধ, অনেকক্ষেত্রে কয়েক হপ্তা অবধি রয়ে যায়। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় কিংবা বৃষ্টিতে আবার জেগে ওঠে ওই গন্ধ। কাছেপিঠেই আগুন ধরিয়েছিল কেউ, আঁচ করলাম আমি।

কারনিসটা ক্যাকটাস ঝোপের পেছনে অবস্থিত, প্রায় মেসার ঢালের লাগোয়া। এখানে পাহাড় পুরোপুরি ঋজু না হলেও বেশ খাড়া, পাথরস্তূপ আর বুনো লতাপাতার মাঝে গিয়ে শেষ হয়েছে।

ঝোপঝাড় ভেঙে নামতে শুরু করলাম। ক্রমেই তীব্র হচ্ছে পোড়া কাঠের গন্ধ, সেই সাথে মাংস পোড়া গন্ধও নাকে আসছে।

এইবার সত্যিকার অর্থেই ভয় বোধ করলাম আমি, ড্রুসিলার জন্যে। পরিষ্কার বুঝলাম যখন ওই দগ্ধ কাঠ আর পোড়া মাংসের হদিস পাব– আমার ওয়াগন এবং ড্রুসিলাকেও আবিষ্কার করব সেখানে।

তিন

ঘন কাঁটা ঝোপ। আমার শরীরের এখন যে-দশা, প্রায় অর্ধ উলঙ্গ, তাতে যাওয়া সম্ভব নয় ওর ভেতর দিয়ে। ঘুরে যেতে হবে, এবং তাই করলাম আমি। অবশেষে যখন দগ্ধ কাঠের কাছে এসে উপস্থিত হলাম, ধীর লয়ে হাতুড়ির ঘা পড়তে শুরু করল আমার বুকে।

ওয়াগন, খচ্চর সবই খুঁজে পেয়েছি। কেবল ড্রুসিলার ছায়ামাত্র নেই কোথাও।

ভেতরের রসদসহ ওয়াগনটা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। প্রতিটা খচ্চরকে, সবিস্ময়ে লক্ষ করলাম, মাথায় গুলি করেছে প্রথমে, তারপর এক-এক করে ঠেলে ফেলে দিয়েছে পাহাড় থেকে। পরে, কেউ একজন নেমে এসে ওগুলোর ওপর ডালপালা চাপিয়ে চিতা ধরিয়েছিল। অমন সুন্দর খচ্চরগুলো হত্যা করায় আগুন হয়ে গেল আমার মাথা... ওগুলো ছিল মিসৌরির সেরা জিনিস, সহজে মেলে না।

পুড়ে মিহি ধূসর ছাইয়ে পরিণত হয়েছে মরুঝোপ। একটা জিনিসও পড়ে নেই মাটিতে। ওয়াগন আছড়ে পড়ার সময়ে যদি কিছু ছিটকে পড়ে গিয়েও থাকে, সযত্নে সেগুলো তুলে নিক্ষেপ করা হয়েছে চিতায়।

কাজটা যারই হোক, কুকীর্তির নিশানা মুছে ফেলতে চেয়েছিল সে। ঠিক

যেভাবে মেসার মাথায় সব ট্র্যাক মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। সহসা উপলব্ধি করলাম অপরাধী তার অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে আবার ফিরে আসবে। তখন যদি এখানে দেখতে পায় আমাকে, নির্দ্বিধায় খুন করবে। আমার এখন প্রতিরোধের শক্তি নেই, জুতসই কোনও অস্ত্রও নেই হাতে।

পরবর্তী কয়েকটা মিনিট ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম স্থাণুর মত। গোটা দৃশ্যপট চেয়ে চেয়ে দেখছি। পোড়া কাঠের স্তূপ আর ঝলসানো খচ্চরগুলো জরিপ করলাম। এমন নিষ্ঠুর কাজ কার হতে পারে কিছুতেই বোধগম্য হলো না, চোখ ফেটে জল আসছে।

লোকটার তাড়াহুড়ো ছিল। ধ্বংসযজ্ঞ শেষ করে যায়নি। ভেতরের দু-একটা জিনিস অক্ষত রয়ে গেছে।

সাবধানে আগুনের ও-পাশে গেলাম আমি। লক্ষ রাখছি কোনও জিনিস যেন অহেতুক স্থানচ্যুত না হয়, তা হলে আমার উপস্থিতি টের পেয়ে যাবে শত্রুপক্ষ। লাকড়ি যত শুকনোই হোক, পুরু ওক কাঠের ওয়াগন সহজে পোড়ার নয়। চাকার কেন্দ্রীয় অংশ বা হাবগুলো নিরেট, ওয়াগনের বিছানাটাও মজবুত... চকিতে চোর কুঠুরির কথা মনে পড়ল আমার।

ওয়াগনের পাটাতনের নীচে একটা ছয়-বাই-ছয় বাক্স। আমাদের কিছু টুকিটাকি অথচ অতিপ্রয়োজনীয় জিনিস আর ছয়টা স্বর্ণমুদ্রা রেখেছিলাম বাক্সে। ওয়াগনের ভেতরে মালপত্রের তোরণ। তোরণের তলার দিকে একটা কাঠের পেরেক তুলে নিলে পাটাতনের অংশবিশেষ উঠে আসে। ওটাই চোরকুঠুরির দরজা।

ত্রিপলের ছাত, কড়িবর্গা সব শেষ; চাকাগুলো কালো হয়ে গেছে আগুনের আঁচে, তবে হাবগুলো অক্ষত রয়েছে। ওয়াগনের কাঠামোটাও আছে এখনও। খুঁজে-পেতে আলগোছে বাক্সটা বের করে আনলাম আমি। সব জিনিস ছাই হয়ে গেছে পুড়ে, কেবল সোনালি ঈগল ছয়টা পাওয়া গেল।

আরও কিছু পাওয়ার আশায় এ-বার তাকালাম চারপাশে। বেশ খানিকটা দূরে, পাথরের ভিড়ে একটা দোমড়ানো মটরশুঁটির কৌটো আর একখণ্ড আধপোড়া বেকন দেখতে পেলাম। ভেবেছিলাম ছুরি বা ওই জাতীয় কোনও অস্ত্র পাব কিন্তু তেমন কিছু মিলল না।

যে-কোনও মুহূর্তে এই কুকীর্তির হোতা এসে পড়তে পারে। আমার নামনিশানা মুছে ফেলার জন্যে আদাজল খেয়ে লেগেছে লোকটা। অসমাপ্ত কাজ সারতে ওই লোক ফিরে আসবে আমি নিশ্চিত। খেয়াল রেখেছি আমার কোনও ট্র্যাক যেন না থাকে, এখন শেষবারের মত নজর বোলালাম চারদিকে।

অদূরের ওই চিতায় কেবল আমার মালপত্র নয়, আমাদের আশাও ছাই হয়ে পড়ে আছে। আমরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে পরিকল্পনা করেছিলাম টনটো বেসিনে গিয়ে বাথান চালু করব। আমার সঞ্চয়ের প্রায় পুরোটাই খরচ হয়ে গেছে সরঞ্জাম আর গরু কিনতে।

যেভাবে সব জিনিস পালা করা হয়েছে তাতে পরিষ্কার বোঝা যায়, একজন

কেউ হাজির ছিল এখানে। প্রতিটা জিনিস খুঁটিয়ে মাটি থেকে তুলে আগুনে গুঁজে দিয়েছে। গোটা ব্যাপারটাই কেমন যেন ধোঁয়াটে বলে মনে হচ্ছে। এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে কবে কী ঘটেছিল তা কেউ জানবে কীভাবে? অতীতে বহু লোক খুন হয়েছে এখানে, এবং তারা সকলেই শকুনের খোরাক হয়েছে। অর্থাৎ, ওদেরকে মেরে ফেলে রেখে চলে গেছে খুনীরা। জানা কথা, শবের গন্ধ পেলে শকুন আসবেই। এর চেয়ে বেশি এ-ব্যাপারে গরজ দেখায়নি কেউ। না, ওদের মতলব আরও গভীরে। কেবল আমাকে খুন করেই নিশ্চিন্ত হতে পারছে না, সব প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায় যাতে সামান্যতম সূত্রও রয়ে না যায়।

কেন? কী হয়েছে ড্রুসিলার?

আমার চেতনায় ও সর্বদাই আছে। কিন্তু ওর চিন্তা ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখছি। একটা অস্ত্র আর ঘোড়া না পাওয়া অবধি ড্রুসিলার কোনও উপকারেই আসব না আমি। এমনকী খোঁজাও সম্ভব হবে না। এ-মুহূর্তে ওর কথা ভাবলে আতঙ্কই বাড়বে শুধু, দুশ্চিন্তা করে নিজের মূল্যবান সময় অপচয় করব– অথচ ততক্ষণ অন্য কিছু করলে হয়তো অনেক বেশি লাভবান হতে পারব। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় একটা শিক্ষা আমার হয়েছে: অহেতুক শোক করে সময় নষ্ট করা বোকামি। যদি কিছু করার থাকে, ভাল– সেটা করা উচিত। আর যদি তা না পারি, তবে যা করলে সেটা সম্ভব হবে তাই করা দরকার।

বেলা পড়ে এল। প্রতিপদে কষ্ট বাড়ছে আমার। অসম্ভব ধীর গতিতে চলাফেরা করছি। ভেবেছিলাম চুনাপাথরের সেতুর নীচে গুহায় ফিরব, কিন্তু গজ দশেক যাওয়ার আগেই অনুভব করলাম এই কাহিল শরীরে পৌঁছুতে পারব না ওখানে। অনিচ্ছায় হলেও কাছাকাছি কোথাও আশ্রয় নিতে হবে আমাকে এবং আগুন জ্বালাতে পারব না।

শক্ত মাটি, একটা পিচ্ছিল পাথরে পা হড়কে পড়ে গেলাম আমি। প্রবল ঝাঁকুনিতে কেঁপে উঠল সারা শরীর। মিনিট দুয়েক লাগল ফের উঠে দাঁড়াতে। ঠাণ্ডার প্রকোপ বেড়েছে, অনুভব করলাম। গুলি খেয়ে যে-নদীতে আমি পড়ে গিয়েছিলাম সেটা নির্ঘাত জমে গেছে এতক্ষণে।

দগ্ধ ওয়াগন থেকে প্রায় একশো গজ চলে আসার পর আশ্রয়ের সন্ধান পেলাম। মেসার কিনার থেকে পাথরচাঁই খসে পড়ে ঢালের ওপর একটা নিচু গুহা মত তৈরি হয়েছে। বড়জোর পাঁচ ফুট গভীর, কোনওমতে গুটিয়ে ভেতরে থাকতে পারব। গুহার কাছেই মরা হলুদ ঘাস, মেঝেতে বিছানোর জন্যে একগুচ্ছ ছিঁড়ে নিয়ে ঢুকলাম ভেতরে এবং পরক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

রাতে জেগে উঠে প্রথমেই মনে পড়ল আমার শত্রুদের মধ্যে দুজনের নাম আমি জানি। যে-লোকটা গুলি করেছিল তার নাম মেকন, এবং অন্যজন ড্যান্স বা ড্যান্সার। নদীর ধারে ওরা যখন নিজেদের মধ্যে আলাপ করছিল তখন নামদুটো আমার কানে আসে।

শীতে কাঁপছিলাম, হঠাৎ খুট্ করে একটা শব্দ হতেই থেমে গেল কাঁপুনি। নিঃসাড়ে পড়ে রইলাম আমি। একজন অশ্বারোহী, প্রায় আমার নাকের ডগা

দিয়ে হেঁটে চলে গেল... জিনের মৃদু খসখস, স্পারের ঝুনঝুন শুনতে পেলাম স্পষ্ট।

ঠাণ্ডায় আমার হাত-পা জমে গেছে, তায় মারাত্মকভাবে আহত, এই অবস্থায় কিছুই করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আঁধারে লোকটার ঘোরাফেরার আওয়াজ পাচ্ছি, একবার অশ্রাব্য গাল বকল কাউকে। তারপর ক্ষীণ আভা ফুটল, মনে হলো লাকড়ি পোড়ার পট্‌পট্‌ শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি। এভাবেই কাটল কিছুক্ষণ, তারপর একসময় গভীর নিদ্রার কোলে আত্মসমর্পণ করলাম।

সকাল। পুবের আকাশ অনেকখানি পেরিয়ে এসেছে সূর্য। রাতের কুয়াশা কেটে গেছে। কেবল যে-সব জায়গায় রোদ পৌঁছয় না সেখানকার মাটি এখনও শিশিরসিক্ত। ঘুম ভেঙে প্রথমে আমার মনে পড়ল না আমি কোথায় আছি। হামাগুড়ি দিয়ে গোপন ডেরা থেকে বেরিয়ে এলাম, এবং উঠে দাঁড়ালাম ছড়িতে ভর রেখে। সহসা বিদ্যুৎচমকের মত মনে পড়ে গেল সব কিছু।

আবছা ট্রেইল বেয়ে নেমে যেতেই মধ্যরাতের অশ্বারোহীর ট্র্যাক দেখতে পেলাম। ভেজা মাটিতে অক্ষত নতুন নালের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করে ওই ট্র্যাকের ছবি ভালভাবে নিজের মনের পর্দায় গেঁথে নিলাম আমি, তারপর ফিরে গেলাম ওয়াগনের কাছে।

আরও ডালপালা চাপিয়ে আবার চিতা ধরানো হয়েছিল। এখন কেবল চাকার হাবগুলো ক্ষীণ আভাস দিচ্ছে কোনও এককালে একটা ওয়াগনের অংশ ছিল ওরা। তখনও জ্বলছিল আগুন, ওখানে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে তাপ পোয়ালাম।

নিজের সঙ্কট ভালই উপলব্ধি করছি আমি। যেভাবেই হোক এখান থেকে পালাতে হবে আমাকে। এমন কোথাও, যেখানে গেলে চিকিৎসা ছাড়াও একটা ঘোড়া আর আগ্নেয়াস্ত্র পাব। ক্যাম্প ভার্দে সম্পর্কে কী শুনেছিলাম চকিতে মনে পড়ল আমার।

আকাশ পথে ওই ক্যাম্পের দূরত্ব তিরিশ মাইলের বেশি হবে না। আকাশ-পথে শব্দটা মাথায় আসতে এই চরম বিপদের মুখে হাসি পেল। আমার কি ঈগলের মত দুখানা ডানা আছে যে উড়ব?

বস্তুত কোনও মানুষেরই নেই– অন্তত আমার এই তিরিশের যৌবনেও অমনটা দেখিনি কখনও।

তবে একটি সত্য আমি জানি। এখানে বসে থেকে স্রেফ ভাবলেই ক্যাম্প ভার্দেয় পৌঁছুতে পারব না। চেষ্টা করতে হবে, এবং সে-জন্যে প্রস্তুতি দরকার। ওয়াগনের চিতায় মটরশুঁটির কৌটো গরম করে কুঠার দিয়ে ভাঙলাম ওটা। তারপর একটু তফাতে বসে খেতে শুরু করলাম গোগ্রাসে। অল্পক্ষণের ভেতর পুরো কৌটো সাবাড় করে ফেললাম। তারপর রওনা হলাম।

জ্বর-জ্বর লাগছে। প্রচুর রক্ত হারিয়েছি আমি। তার ওপর শীত আর অনাহার– তবু দমলাম না। এ আমার বাবার শিক্ষা। আমাদেরকে কখনও

কোনও ব্যাপারে ভেঙে পড়তে দেননি তিনি। 'থামলে চলবে না। এগিয়ে যাও, চেষ্টা করো।' দুঃসময়ে বাবার উপদেশ আমার মাঝে প্রাণের সঞ্চার করল। হ্যাঁ, এখন ঠিক তাই করব। প্রতিকূল প্রকৃতির সাথে লড়াই করে টিকে থাকব, যে করেই হোক ক্যাম্প ভার্দেয় পৌঁছুতেই হবে আমাকে। পথের নির্দেশ জানা আছে, নাক বরাবর এগিয়ে চললাম। পাথর, কাঁটা ঝোপের ঘষায় ফের রক্ত পড়ছে ক্ষত থেকে, সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই–, একজন অসহায় মানুষের অত বাছবিচার করলে চলে না।

বাকহেড ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে নিজের জন্যে আর একজোড়া বাকলের মোকাসিন তৈরি করলাম আমি– ইতিমধ্যে আগের দুজোড়া ছেঁড়া সারা– তারপর খাঁজের মাথায় উঠলাম।

অদূরে একটা আবছা ট্রেইল, শুয়োরের পিঠের মত বাঁকা হয়ে বাকহেড মেসার উত্তরপশ্চিমে চলে গেছে। ওইদিকেই আমার গন্তব্য। খাঁজের মাথা থেকে পাইন ক্যানিয়নের তলদেশ কমপক্ষে হাজার ফুট নীচে। প্রায় পুরো পথটাই নেমে এলাম গড়িয়ে।

যখন ক্যানিয়নের নীচে পৌঁছুলাম তখন সূর্য মধ্যগগনে। হাঁফ ধরে গিয়েছিল, একটু জিরিয়ে নিয়ে বুকে হেঁটে অপর খাঁজের মাথায় চড়ে সেই ট্রেইলটা ধরলাম।

মাথা ঝিমঝিম করছে। মনে হচ্ছে সমস্ত ঘিলু যেন সরে এসেছে একদিকে, অন্যপাশটা খালি-খালি লাগছে। কিন্তু আমি এগিয়ে চললাম, এখানে পড়ে থেকে মৃত্যুবরণ করার মাঝে কোনও অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না বলে।

একটা ইন্ডিয়ান ট্রেইলে হাঁটছি আমি। এটা অ্যাপাচি এলাকা। ওদের ব্যাপারে আমার জ্ঞান হয়তো ও'নীলের মত নয়; তবে এটুকু জানি যে অ্যাপাচিদের হাতে পড়লে আর নিস্তার নেই।

অ্যাপাচিরা যোদ্ধার জাত। এ-জন্যে গর্ব বোধ করে ওরা। শ্বেতাঙ্গরা প্রায় কোনও দিনই ইন্ডিয়ানদের স্বভাব, ধ্যান-ধারণা বোঝার চেষ্টা করেনি, ফলে তাদেরকে এর মাশুলও গুনতে হয়েছে অনেক। ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার পথে সব চাইতে বড় বাধা, তাকেও নিজের মূল্যবোধে বিশ্বাসী বলে মনে করা। শ্বেতাঙ্গ সমাজে ক্ষমা একটি মহৎ গুণ হিসেবে স্বীকৃত। অথচ অ্যাপাচিদের এ-সবের বালাই নেই। যুদ্ধ তার কাছে আনন্দের ব্যাপার। ঘোড়া চুরি, শিকার এগুলো তার সম্মান বৃদ্ধির একমাত্র উপায়। ক্ষমাকে ওরা দুর্বলতা বলে মনে করে। যে-লোক সাহসী, বীর একমাত্র তাকেই শ্রদ্ধা করে অ্যাপাচি, কারণ তার নিজের মধ্যেও এই গুণগুলো আছে।

ইন্ডিয়ানদের শ্রদ্ধা করি আমি। আমার জীবনের অনেকগুলো দিন কেটেছে ওদের মাঝে। এক সঙ্গে ঘোড়া ধরেছি, লড়াই করেছি ওদের সাথে, আবার ছেলেবেলায়, যখন পাহাড়ে থাকতাম, প্রায় সমবয়সী চেরোকীদের সাথে শিকারে যেতাম আমরা। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি কোনও ইন্ডিয়ানের মুখোমুখি হতে চাই না।

মেসায় উঠে ক্লোভার স্প্রিংয়ে পেট পুরে পানি খেয়ে আবার যাত্রা শুরু করলাম। বারবার হোঁচট খেয়ে পড়ছি, প্রতিবারেই আগের চেয়ে দুঃসাধ্য হচ্ছে ওঠা, তবু অসম্ভব মনের জোরে উঠে দাঁড়াচ্ছি। ক্যাম্প ভার্দে, আমি জানি, উত্তর-পশ্চিমের কোথাও হবে– ভার্দে নদীর কাছাকাছি। এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য ঈস্ট ভার্দে রিভারে পৌছুনো– যুদ্ধের সময়ে ওই নদীই একবার আমার প্রাণ রক্ষা করেছিল– তারপর ওটা অনুসরণ করে ভার্দেয় গিয়ে উত্তরা পথ ধরব।

সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি আমি। প্রলাপ বকছি, হেঁড়ে গলায় গান গাইছি মাঝে মাঝে। পা চলছে না ঠিকমত, অনবরত পড়ে যাচ্ছি ভারসাম্য হারিয়ে, ধুঁকছি।

সহসা একসময় খেয়াল করলাম আমি আর একা নই। দুদিকে দুজন অ্যাপাচি ঘোড়সওয়ার।

ওরা পাশ কাটিয়ে গেলে আরও দুজন এল। মন্থর করে হাঁটার পর্যায়ে নামিয়ে আনল ঘোড়ার গতি। ঋজু ভঙ্গিতে বসে আছে স্যাডলে। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পেটা শরীর। উন্নত কপাল। গভীর কালো চোখ। খাড়া নাক। চওড়া চোয়াল। দীর্ঘ পথযাত্রায় ধূলিমলিন শরীর। ওদের কারও কারও হাতে শোভা পাচ্ছে তাজা করোটি-ছাল। সবাই নীরব, কেউ এগোচ্ছে না আমার দিকে, কেবল চোখের কোণে জরিপ করছে। আমি পড়ছি, উঠছি– তবু ওদের কোনও ভাবান্তর নেই, দৃষ্টিতে অপার কৌতূহল। শুধু একবার একজন অ্যাপাচি আমার দুরবস্থায় আমোদ পেয়ে হেসে উঠল।

বিড়ম্বিত একটা মাইল পেছনে ফেলে এলাম আমরা। ওই এক মাইলে কতবার যে পড়েছি তার ইয়ত্তা নেই, তা নয়-দশবার হবে, কিন্তু প্রতিবারেই আমাকে উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ দিচ্ছিল অ্যাপাচিরা। অবশেষে ট্রেইলটা মেসা ছেড়ে ঈস্ট ভার্দের পথ ধরল। কিন্তু ইন্ডিয়ানরা নাছোড়বান্দা, আঠারো মত লেগে রইল পেছনে।

পোলস মেসার শেষ-মাথায় পৌছে ট্রেইলে ঘুরে দাঁড়াল ওরা। একজন অশ্বারোহী আমার সামনে চলে এল। আমি পাশ কাটানোর চেষ্টা করলে বাধা দিল অ্যাপাচি। আমি তখন অর্ধঘোরের মাঝে, তবু বুঝতে অসুবিধে হলো না বন্দী হয়েছি। একজন বর্শা উঁচিয়ে দিক্ নির্দেশ করতে উত্তরে গিরিখাতের পানে ঘুরলাম।

প্রায় মাইল খানেক যাওয়ার পর একটা বস্তিতে এসে হাজির হলাম আমরা। ইন্ডিয়ানদের সাময়িক আস্তানা এটা। অ্যাপাচি মহিলা আর শিশুরা সকলেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল, সবিস্ময়ে দেখছে আমাকে। আমিও দেখলাম ওদের, ঝাপসা হয়ে আসছে চোখ; এগিয়ে গেলাম এক কদম, তারপর ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু, মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়লাম মাটিতে।

কে যেন পরিষ্কার গলায় চেঁচিয়ে উঠল আমার অন্তরে, 'ওরিন, তোমার আয়ু শেষ। ওরা মেরে ফেলবে তোমাকে।'

তারপর তলিয়ে গেলাম এক অনন্ত অন্ধকার সুখের অতলে।

চার

বহুক্ষণ হলো জেগেছি আমি। মনে করতে পারছি না কী আমার পরিচয়, কোথায় আছি। তারপর ফিরতে শুরু করল সাড়া। খেয়াল হলো একটু আগেই ড্রুসিলার সাথে কোনও এক জায়গায় দেখা হয়েছিল আমার। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম কাছে যাওয়ার– পারিনি। এর পরপরই ঘুমটা ভেঙে যায়। আমি স্বপ্ন দেখছিলাম।

প্রায়-অন্ধকার ছোট একটা কুটিরে শুয়ে আছি আমি। মাথার ওপর ছনের ছাউনি, চারদিক ফাঁকা, দেয়াল নেই। দুটো হরিণের চামড়া দিয়ে আমার পুরো শরীর ঢাকা।

পাশ ফিরলাম সাবধানে। অদূরবর্তী ঢালের প্রতি দৃষ্টি গেল। একটা ক্ষুদ্রকায় আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে আছে ছয়-সাতজন লোক। মেয়েছেলেও আছে, সংখ্যায় পুরুষদের দ্বিগুণ হবে। খেতে খেতে গল্প করছে ওরা।

এ-বার একে একে ছবির মত সব কিছু ভেসে উঠল আমার চোখে। অ্যাপাচিরা আমার দুপাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, বারবার হোঁচট খেয়ে পড়ছিলাম আমি। কতটা পথ আমাকে অনুসরণ করেছে ওরা আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম।

একজন অ্যাপাচি মহিলা কিছু বলতে সুঠামদেহী দীর্ঘকায় এক ইন্ডিয়ান উঠে দাঁড়াল। ঢালের ওপরে আসছে সে। কপালে সাদা পট্টি, উদোম গা, কোমরে এক ফালি হরিণের চামড়া জড়ানো, পায়ে অ্যাপাচিদের অতিপছন্দের হাঁটু-সমান মোকাসিন।

জোড়াসন হয়ে পাশে বসল সে। ইশারায় আমার বিভিন্ন চোট দেখিয়ে বাঁ-হাতের মুঠি নিজের বুকের কাছে ধরল, তারপর ডান হাতের তালু দিয়ে সবেগে ঠেলে নীচে নামিয়ে দিল সেটা।

বুঝলাম অ্যাপাচি আমাকে একজন সাহসী লোক বলে গণ্য করছে। 'বন্ধু,' বলল সে, 'অ্যামিগো।'

আমার মাথায় যেখানে বুলেট লেগেছিল ইন্ডিয়ান সর্দার আঙুল ছোঁয়াল সেখানে। 'অ্যাপাচি?'

'হোয়াইট আই,' জবাব দিলাম আমি। শ্বেতাঙ্গদের এই খেতাব দিয়েছে ইন্ডিয়ানরা, আমি জানি। তারপর যোগ করলাম, 'আমি খুঁজে বের করব ওকে।'

ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল অ্যাপাচি, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'খিদে পেয়েছে?'

'হ্যাঁ,' বললাম। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জানতে চাইলাম, 'আমি কতক্ষণ হলো এখানে?'

তিনটে আঙুল তুলল ইন্ডিয়ান। 'আমরা চলে যাচ্ছি,' বলল সে।

'ক্যাম্প ভার্দে?'

ক্ষণিকের জন্যে আমার মনে হলো অ্যাপাচি দলপতি বোধ হয় হেসে উঠবে। মাথা নাড়ানোর সময়ে একধরনের নিষ্ঠুর কৌতুক খেলা করছিল ওর চোখে। 'না।' হাতের ইশারায় মগলোন পর্বতমালা দেখাল। ভুরু কোঁচকাল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাপল আমাকে, তারপর বলল, 'ক্যাম্প... আর্মি।'

অ্যাপাচি চুপ করল। আমি ভেবে পাচ্ছি না এরপর আমার কী দশা হবে। ধরে নিয়ে যাবে? নাকি ছেড়ে দেবে?

'আমার একটা ঘোড়া দরকার,' বললাম, 'অস্ত্র লাগবে। ক্যাম্প ভার্দেয় গেলে পেয়ে যাব।'

'তোমার অবস্থা খুব খারাপ ছিল,' বলল অ্যাপাচি। 'এখন কেমন– ভাল?'

কঠিন প্রশ্ন। ভীষণ দুর্বল বোধ করছি আমি, কিন্তু ঠিক করলাম সত্য গোপন করব। সায় দিলাম ওর কথায়। আচমকা উঠে পড়ল ইন্ডিয়ান সর্দার, আমার কোলের কাছে একটা বাকস্কিনের থলে ফেলে দিয়ে চলে গেল ওখান থেকে।

নড়ার শক্তি নেই আমার। জানি না কপালে আর কী দুর্ভোগ লেখা আছে। এত কাহিল বোধ করছি যে ইচ্ছেও হচ্ছে না জানতে। বস্তুত এখন কোনও কষ্টই আর কষ্ট মনে হয় না আমার কাছে, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি মৃত্যুর পদধ্বনি।

চোখ বুজলাম আমি। উফ্, কী আরাম! গাঢ় প্রশান্তিতে দুচোখের পাতা ভারি হয়ে এল।

রাতে জ্ঞান ফিরল। হিমেল হাওয়া বইছে। নিস্তব্ধ চরাচর। কোথাও কোনও আলো নেই– কেবল বাতাসে পাইনের সুরভি।

বাকস্কিনের শয্যায় শুয়েছিলাম আমি, মাথা জাগিয়ে তাকালাম চারপাশে। আমি একা।

আমার শুশ্রূষা করেছে ওরা, তারপর ফেলে রেখে চলে গেছে নিজেদের কাজে। মনে পড়ল ক্যাপ সয়্যারের কথা: ইন্ডিয়ানদের বিশ্বাস নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমার মত এ-রকম কোনও অসহায় শ্বেতাঙ্গকে পেলে বিনা দ্বিধায় খুন করবে ওরা– তবে সময় থাকলে নির্যাতন চালাবে আগে। ওরা বহুদূর থেকে আমার ট্রেইল অনুসরণ করেছিল, ওদের মনে কৌতূহল জাগিয়েছিলাম আমি। এবং এটাই আমার জীবন রক্ষা করেছে। সাহস আর কষ্টসহিষ্ণুতাকে একজন ইন্ডিয়ানে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করে। আমার ট্রেইলে সে-সবের চিহ্ন দেখতে পেয়েছিল ওরা।

চকিতে থলেটার কথা খেয়াল হতে ওটা খুলে হাত ঢোকালাম ভেতরে। নেড়েচেড়ে, স্বাদে যখন বুঝলাম পাইন ফল, আর এক মুঠো মুখে দিয়ে ঝরনা থেকে পানি খেয়ে এলাম আমি, তারপর শুয়ে পড়লাম ছনের কুটিরে ফিরে গিয়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠে বেশ ঝরঝরে বোধ করলাম– রওনা হতে পারব।

অ্যাপাচিদের সাময়িক পল্লী ছেড়ে আসার চতুর্থ দিনের মাথায় দেখা পেলাম ক্যাম্প ভার্দের।

তখন প্রায় সন্ধ্যে। গোধূলিরাগে পশ্চিম দিগন্ত লাল। একতিল মেঘ নেই। অস্তোন্মুখ সূর্যের লক্ষ লক্ষ তীর ছড়িয়ে পড়েছে সারা আকাশে। নদীর পাড় থেকে মেসায় অবস্থিত ক্যাম্পটা চোখে পড়ল আমার। উপত্যকার প্রায় তিন বর্গমাইল এলাকা জুড়ে উঁচু কাঁটাতারের বেড়া। বিরাট সবজি বাগান। জায়গাটা আমার পছন্দ হলো।

এক কোম্পানি অশ্বারোহী সেনা এবং এইটথ্ ইনফ্যানট্রির দুটো কোম্পানিসহ চল্লিশজন ইন্ডিয়ান স্কাউট রয়েছে ক্যাম্পে। স্কাউটদের নেতার নাম অ্যাল সেইব্যর। শক্ত-সমর্থ লোক, চিন্তাভাবনায় শ্বেতাঙ্গ বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইন্ডিয়ান ধূর্ততা।

আমার হাল বিধ্বস্ত হলেও সটান এগিয়ে গেলাম ক্যাম্প ফটকের দিকে। এটা লজ্জা করার সময় নয়, তা ছাড়া এক অর্থে ওরা আমার প্রাক্তন সহকর্মী— গৃহযুদ্ধ চলাকালে আমি নিজেও ইউনিয়ন আর্মিতে ছিলাম।

আমাকে দেখে তাঁবু, দোকানপাট থেকে লোকজন বেরিয়ে এল। সবার চোখে বিস্ময়, যেন কোনও ভিনগ্রহের মানুষ দেখছে। পাইন পাতার শতচ্ছিন্ন কোটখানা ফেলে দিয়েছিলাম আগেই, গায়ে দুটো হরিণের চামড়া জড়ানো, প্যান্টের যে-দশা তাতে একটা দশ বছরের বালকেরও লজ্জা ঢাকবে না।

ক্যাম্প ফটকের কাছেই স্টোর। ভেতর থেকে দুজন লোক বেরিয়ে এল। একজনের কাঁধে ক্যাপটেনের তক্‌মা আঁটা। অপরজন বৃষস্কন্ধ। গায়ে বাকস্কিনের শার্ট। আমাকে দেখে দুজনেই থমকে দাঁড়াল।

'ক্যাপটেন,' মুখ খুললাম আমি, 'আমি—'

'মি. সেইব্যর,' আমাকে থামিয়ে দিয়ে সঙ্গীর দিকে ফিরল ক্যাপটেন, 'এই লোককে কিছু খাইয়ে তারপর আমার কোয়ার্টারে নিয়ে আসবে।' আমার আপাদমস্তকে আর একনজর বুলিয়ে যোগ করল, 'হ্যাঁ, আর একজোড়া শার্ট আর প্যান্টও দিও।'

আচমকা অনুভব করলাম আমি পড়ে যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি হেলান দিলাম লম্বা একতলা দালানের কোণে। ঠিক ওইসময়ে স্টোর থেকে বেরিয়ে এল এক সার্জেন্ট। আমাকে দেখেই চমকে উঠল সে। 'মাই গড! ওরিন ওসমান, না!'

'হ্যালো, রাইলি,' ম্লান হেসে বললাম আমি, তারপর সোজা হয়ে অনুসরণ করলাম সেইব্যরকে।

পেছনে ক্যাপটেনের গলা শুনতে পাচ্ছি। 'সার্জেন্ট, তুমি চেনো ওকে?'

'জ্বি, স্যার। যুদ্ধের সময় সিক্স ক্যাভালরিতে ছিল। শার্পশূটার, স্যার। তুখোড় ঘোড়সওয়ার।'

আমাকে মেস রুমে নিয়ে বসাল সেইব্যর। একটা টিনের কাপে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে এগিয়ে দিল। 'খাও,' বলল সে, 'কাজে দেবে।'

কয়েক মিনিটের জন্যে আমাকে একা বসিয়ে রেখে বাইরে গেল স্কাউট নেতা, ফিরল একপ্রস্থ কাপড় আর থালাভর্তি খাবার নিয়ে। 'অ্যাপাচি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'সাদা চামড়া,' বললাম আমি, তারপর জুড়ে দিলাম, 'অ্যাপাচিরা বরং আমার শুশ্রূষাই করেছে।'

'ওরাই তোমাকে উদ্ধার করেছে?'

এ-বার খেতে খেতে সংক্ষেপে সব ঘটনা খুলে বললাম ওকে। সেইব্যর নানান প্রশ্ন করে ইন্ডিয়ানদের চেহারার বর্ণনা জেনে নিল আমার কাছ থেকে।

'তোমার কপাল ভাল,' বলল সে। 'মনে হচ্ছে ওই লোক সম্ভবত ভিকটোরিও। এই অঞ্চলে অ্যাপাচিদের ভবিষ্যৎ নেতা।'

আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল ক্যাপটেন পোর্টার। আমি ঢুকতে একটা চেয়ার দেখিয়ে ইশারায় বসতে বলল। গত কদিনের কঠোর পরিশ্রমে আমার শরীর ভেঙে আসছে। এই প্রচণ্ড দুঃখকষ্টের মাঝে একটিমাত্র সুসংবাদ আছে: দ্রুত শুকিয়ে আসছে ক্ষতগুলো। জংলী লতাগুল্মের রস ওইসব জায়গায় লাগিয়ে দিয়েছিল অ্যাপাচিরা।

যত অল্প কথায় সম্ভব, ড্রুসিলাকে নিয়ে বাকহেড মেসায় আমার আগমন এবং পরবর্তী মর্মান্তিক ইতিহাস ক্যাপটেনকে জানালাম আমি।

'এখন একটা ঘোড়া আর কিছু অস্ত্র আর গোলাবারুদ পেলেই আমি ফিরে যাব ওখানে।'

'তোমার জন্যে সেটাই স্বাভাবিক,' বলল ক্যাপটেন। 'শুনতে খারাপ শোনাবে, কিন্তু আমার ধারণা তোমার স্ত্রী বেঁচে নেই। খুন করা হয়েছে। তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি; কিন্তু তুমি যা বললে, অনেক লোক লেগেছে তোমার পেছনে, তাতে আমার তো মনে হয় না যে তুমি একা পেরে উঠবে।'

দম নিয়ে আবার শুরু করল অফিসার, 'তাই বলছিলাম কী, আমার লোক দরকার। সব ইউনিটেই লাগবে। ছজন অফিসার রাখতে পারি আমি— কিন্তু কার্যত আছে মোটে চারজন।'

'আমি অফিসার র‍্যাংকে ছিলাম না কখনও।'

'জানি, কিন্তু ইউনিট কম্যান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছ... কতদিন হবে?'

'দু-তিনবার। সব মিলিয়ে তা প্রায় মাস পাঁচেক।'

'যুদ্ধের সময়ে সিক্স ক্যাভালরি সাতান্নটা অ্যাকশনে অংশ নিয়েছিল, ঠিক? নিশ্চয়ই ওগুলোর কয়েকটায় নেতৃত্ব দিয়েছ তুমি?'

'জ্বি, সার।'

'আমি তোমাকে কাজে লাগাতে পারব, ওসমান। বলতে কী, অভিজ্ঞ লোক আমার খুব দরকার— বিশেষত যাদের ইন্ডিয়ানদের সাথে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা আছে। এবং আমার বিশ্বাস তোমার তা আছে?'

'আছে, সার। কিন্তু আমাকে টনটোতে ফিরতেই হবে। ওখানে আমার স্ত্রী রয়েছে, ক্যাপটেন।'

প্রায় ঘণ্টখানেক আলোচনা করলাম আমরা। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি আসলে আমার ওপর দিয়ে কত বড় একটা ধকল গেছে। অ্যাপাচি পল্লীতে তিন দিন ছিলাম, এই তিন দিনে অনেকটা সুস্থও হয়েছি— কিন্তু ক্যাপটেনের সাথে বসে

যুদ্ধের স্মৃতিচারণের সময় উপলব্ধি করছিলাম, এখনও আমার লড়াই করার মত অবস্থা আসেনি। অথচ আমি নিরুপায়, কোনমতেই দেরি করা চলবে না। হয়তো এখনও সাহায্যের প্রত্যাশায় পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে ড্রুসিলা।

'হালে এ-দিকে নতুন কোনও আউটফিট এসেছে?' আচমকা প্রশ্ন করলাম ক্যাপটেনকে।

তার কপালে ভাঁজ পড়ল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। মনে হলো ক্যাপটেনের মুখের পেশীতে যেন টান পড়েছে কিছুটা। 'এসেছে। তিন-চারটে হবে। সবগুলোই বড়, মাস দুয়েক হলো এসেছে টেরিটরিতে।' তারপর দম নিয়ে যোগ করল পোর্টার, 'ওদের মালিকরা কিন্তু সবাই অভিজাত লোক, ওসমান।'

'হতে পারে, ক্যাপটেন পোর্টার। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ওদেরই কেউ একজন আমাকে খুন করার চেষ্টা চালিয়েছিল, আমার মালপত্র পুড়িয়ে দিয়েছে।'

'হয়তো।'

হয়তো? আমি ছিলাম ওখানে... অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছি।'

'জানি। কিন্তু তোমার কাছে কোনও প্রমাণ আছে কারও বিরুদ্ধে? প্রমাণ চাই, মি. ওসমান, প্রমাণ চাই।' একটু ইতস্তত করে বলল, 'আদালতে–'

'ক্যাপটেন,' বাধা দিলাম আমি, 'ওই লোককে আমি খুঁজে বের করব। এবং যখন কিছু করব, সাক্ষী-সাবুদ নিয়েই করব। তবে সব কিছুই হবে আমার নিয়মে– আদালতে যাব না।' ক্যাপ্টেন মুখ খোলার আগেই আবার শুরু করলাম, ক্যাপটেন, আমি আইনকে শ্রদ্ধা করি– বাড়িতে আমরা সে-শিক্ষাই পেয়েছি। কিন্তু একজন ধনী ক্যাটলম্যানকে আইন ছুঁতে পারবে না। আপনি নিজেও তা জানেন। এমনকী, আর্মিও পারবে না।'

'সাবধান, ওসমান, নিজের হাতে আইন তুলে নিও না!'

'কেন, আপনি তা হলে কী করবেন, সার?' ভালমানুষ সাজলাম আমি।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যাপটেন। 'আমি যা বললাম তাই করো।' তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তোমার কী মনে হয়, ওরা তোমাকে খুন করতে চাইছে কেন? তোমার মালপত্র ধ্বংস করার পেছনে ওদের কী এমন স্বার্থ থাকতে পারে?'

'আমারও তো ওই একই প্রশ্ন, ক্যাপটেন। কিছুই বুঝতে পারছি না।'

জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল পোর্টার, দুহাত মুঠো করে পেছনে বাঁধা। দূরের পর্বতমালার পানে তাকিয়ে আপনমনে প্রশ্ন করল, 'ওসমান, তোমার স্ত্রী কি খুব সুন্দরী?'

বিব্রতকর অবস্থায় পড়লাম। নিজের স্ত্রীর প্রশংসা নিজের মুখে করা শোভন নয়। কিন্তু আমার মনেও এই প্রশ্ন বহু আগেই জেগেছে। কিন্তু ইচ্ছে করেই দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে রাখছিলাম। বস্তুত আমার উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠার পেছনে এটাই অন্যতম কারণ।

'হ্যাঁ, ক্যাপটেন। আমার স্ত্রী বলে বলছি না, ও সত্যিই সুন্দরী। আমার সব

ভাই-ই তাই বলবে। ও'নীল তো–'

ঝট করে ঘুরল পোর্টার। 'ও'নীল ওসমান?' ক্যাপটেনের চোখ বিস্ফারিত। 'ও'নীল ওসমান, মোরার পিস্তলবাজ তোমার ভাই?'

'জ্বি, সার।'

'তার মানে অ্যাঞ্জেল ওসমানও তোমার ভাই।'

'জ্বি।'

'অ্যাঞ্জেল ওসমান,' বলল ক্যাপটেন পোর্টার, 'হাউজে আমাদের একটা বিল উত্থাপনের ব্যাপারে সাহায্য করেছে। খুব কাজের লোক, আমার একজন ভাল বন্ধু।'

'সময়ে পিস্তলেও ওর হাত পাকা, সার– প্রায় নীলের মতই।'

ড্রুসিলার প্রসঙ্গে ফিরে এল ক্যাপটেন। 'ওসমান, কিছু মনে কোরো না, মিসেসের সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন?'

'ভাল, স্যার। আমরা পরস্পরকে ভালবাসি– ভীষণ ভাবে।' এরপর আমি কলর‍্যাডোর পাহাড়ে আমাদের প্রথম সাক্ষাতের ঘটনা কিছু কিছু জানালাম পোর্টারকে। 'আপনি বোধ হয় ভাবছেন ও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে?'

পোর্টার হাসল। 'না, ওসমান। সে-ক্ষেত্রে দামী জিনিসগুলো নষ্ট করত না। তা ছাড়া আমাকে টাকার কথা বলেছ তুমি। সেটাও নিয়ে যেত। না, আমি ভাবছি অন্য কথা।'

'তোমার স্ত্রী,' খাদে নেমে গেল ক্যাপটেনের গলা, 'সুন্দরী, এবং সে একা ছিল। এই অঞ্চলে মেয়েলোক এমনিতেই কম– তার ওপর সুন্দরী–'

'কিন্তু আপনি একটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছেন, সার, এটা পশ্চিম, এখানে মেয়েদের দিকে বদনজরে তাকায় না কেউ। এতটা বোকামি–'

'এও তো হতে পারে যে তখন তার হিতাহিত জ্ঞান ছিল না?' আমার সামনে এসে দাঁড়াল পোর্টার। 'এখন হুঁশ ফিরতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে ভয়ে। তাই সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ সাফ করে ফেলতে চাইছে।'

'কিন্তু আমাকে যারা খুঁজছে তারা তো জানে?'

'ওদেরকে পেলে তুমি হয়তো দেখবে আসলে কিছুই জানে না ওরা। উল্টোপালটা বোঝানো হয়েছে। এই চক্রান্তের মূলে, আমার বিশ্বাস, এমন একজন আছে যার কথা অন্যেরা শোনে। এবং একমাত্র সে-ই লোকই জানে সব কিছু।'

ক্যাপটেনের কথায় যুক্তি আছে, ভাবলাম আমি। এর অর্থ ড্রুসিলা মারা গেছে, নিশ্চয়ই ওর মৃত্যু নিষ্ঠুরভাবে হয়েছে। সহসা আমার সারা শরীর জ্বলে উঠল ক্রোধে। নতমুখে দাঁড়িয়ে কাঁপছি থরথর করে। শপথ করলাম এর বদলা আমি নেবই।

একটুবাদে চোখ তুলে বললাম, 'ক্যাপটেন, আমার বিশ্রাম দরকার।'

'সব ব্যবস্থা করে রেখেছে অ্যাল সেইব্যর।' খানিক চিন্তা করে পোর্টার বলল, 'ওসমান, এ-কথা আর কাউকে বলবে না। যদি কখনও ফাঁস হয় আমি

কিন্তু তখন অস্বীকার করব। কাল সকালে একটা ঘোড়া আর খচ্চর পাবে তুমি। আর্মসের ব্যাপারে সেইব্যরকে বলে রাখব।'

'আমার টাকা আছে– কিনে নেব।'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাপটেন। 'তা অবশ্য পারবে, কিন্তু তোমার দরকার সেরা জিনিস। সাটলারের দোকানে তেমন কিছু আছে বলে মনে হয় না।'

আমাকে দোরগোড়া অবধি এগিয়ে দিল পোর্টার। এখন রাত, কামরার উজ্জ্বল আলোর পটভূমিতে ছায়ামূর্তির মত দেখায় ক্যাপটেনকে। 'শোনো, আমার প্রস্তাব তা হলে বহাল রইল। আর্মিতে যোগ দেয়ার ইচ্ছে থাকলে চলে এসো এখানে। তোমার পুরোনো র‍্যাংকই ফিরে পাবে– চাই কী, একটু চেষ্টা করলে, কমিশনের ব্যবস্থাও করতে পারব।'

অন্ধকারে একাকী দাঁড়িয়ে আছি আমি। মরু-আকাশে তারার হাট। উদাস চোখে ধ্রুবতারার দিকে চেয়ে রয়েছি। শীত করছে আমার। ড্রুসিলা নেই কথাটা ভাবতেই কেমন যেন লাগছে।

হঠাৎ ধক্ করে উঠল বুক। ক্যাপটেন পোর্টার এতক্ষণ যা যা বলেছে সবই সত্যি। ওর লাশ হয়তো ওয়াগনের কাছেপিঠেই কোথাও মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে।

ঠিক করলাম ফিরে গিয়ে ড্রুসিলাকে ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী কবর দেব। তারপর শিখার করব সে-ই জল্লাদকে।

ওদিকে আমি বিদায় নেওয়ার পর ক্যাপটেন পোর্টারের ঘরে শুরু হয় নাটকের অন্য এক অঙ্ক।

অস্থির বোধ করছিল পোর্টার। একসময় নিজের ডেস্কে বসে লেখার কাগজ আর কলম টেনে নিল। কাগজের মাথায়, ডান কোণে, ঠিকানা আর তারিখ বসাল, তারপর তার পরিচিত এক বন্ধুর কাছে লিখল একটা দীর্ঘ চিঠি। পরে জেনেছিলাম, পরদিন সকালে আমি ক্যাম্প ছাড়ার আগেই ওটা রওনা হয়ে যায় ডাকে।

ওই চিঠিই ঘুরিয়ে দেয় আমার জীবনের মোড়। অশ্বারোহী বাহিনীর ক্যাপটেন সে-দিন ক্যাম্প ভার্দের নিজের কোয়ার্টারে বসে আমার জীবন নির্ধারণ করেছিল। তবে সে-সবই আর এক কাহিনি।

পাঁচ

শত্রু এলাকায় চলাফেরার সময়ে এক ট্রেইল দুবার ব্যবহার করতে নেই... বিপদের আশঙ্কা থাকে, শৈশবেই বাবা আমাদের এ-শিক্ষা দিয়েছিলেন।

অ্যাল সেইব্যর আমাকে ফসিল ক্রীকের ভাটিতে একটা ইন্ডিয়ান ট্রেইলের

হদিস দিয়েছিল, সেটা ধরেই হার্ডক্র্যাবল মেসা পেরিয়ে ওক স্প্রিংয়ে ক্যাম্প করলাম আমি। আমার হাতের ঘা সবে খানিকটা শুকিয়েছে। রাইফেল ব্যবহার করতে পারব, তবে সিক্স-শূটার বের করার মত আস্থা ফিরে পাইনি। দুহপ্তা আগে আহত হয়েছিলাম আমি, এখনও সেরে উঠিনি পুরোপুরি, কিন্তু আর অপেক্ষা করতে মন মানছে না। বাকহেড মেসা এবং যে-ক্যানিয়নে আমার ওয়াগনের ধ্বংসাবশেষ পড়েছিল, এ-মুহূর্তে সেখান থেকে দুমাইল দূরে রয়েছি আমি।

আমার বর্তমান ক্যাম্প থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে, উত্তরে মরমন বসতি। ঠিক শহর নয়, ইউটা থেকে কয়েক ঘর লোক এসে বাস করছে ওখানে।

ওদেরকে আমি ধর্মপ্রাণ লোক বলেই জানি। সিদ্ধান্ত নিলাম রসদপত্রের প্রয়োজন হলে মরমন বসতিতেই যাব। তা ছাড়া ওখানে জরুরি তথ্যও মিলতে পারে। তবে আপাতত আমার বিশ্রাম দরকার। অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছি, অথচ হাতে রয়েছে কঠিন কাজ।

গা ঢাকা দেওয়ার জন্যে ওক স্প্রিং চমৎকার জায়গা। একটা ক্যানিয়নের ভেতর দিকে অবস্থিত। এখানে আসার পথে ইন্ডিয়ানদের কোনও ট্র্যাক দেখতে পাইনি। ইন্ডিয়ানদের মধ্যে অ্যাপাচিরাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। আমার কপাল নেহাত ভাল, তাই সে-বার মধুর ব্যবহার পেয়েছিলাম। কিন্তু টনটোর অ্যাপাচিরা নিষ্ঠুরতায় সবাইকে ছাপিয়ে যায়। ওদের হাতে পড়লে আর রক্ষা পাব না।

ছোট করে আগুন জ্বালিয়ে বেকনের সুপ আর কফি তৈরি করলাম। স্নায়ুর চাপে খিদে মরে গেছে, তবু খেতে বসলাম কারণ জানি এইবেলা পেট পুরে না খেলে, সামনে যে কঠিন দিন আসছে তাতে একবেলাও ভালমত খাওয়া জুটবে কি না সন্দেহ।

চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হাওয়া নেই। আকাশে তারা নেই। চাঁদ নেই। কাছাকছি কোথাও একটা পেঁচা ডাকছে। দূর থেকে ভেসে আসে কয়োটের কাতর ফরিয়াদ। ঘুম আসছে না আমার, খালি ছটফট করছি বিছানায় শুয়ে। শ্রান্ত বোধ করছি। অবসাদে নেতিয়ে পড়েছি। অথচ চোখের পাতা বুজলেই বারবার একটা মুখই ভেসে উঠছে: সে-মুখ ড্রুসিলার। এ-জীবনে নিজের বলে কিছুই পাইনি আমি। কিন্তু সব সময় উপলব্ধি করেছি আমার একজন জীবনসঙ্গিনী দরকার। ড্রুসিলাকে দেখেই বুঝেছিলাম আমার যা দরকার এই মেয়ে তা দিতে পারবে... জীবনসঙ্গিনী আর নীড় ছাড়া কোনও পুরুষই পূর্ণতা পায় না। আর যা কিছু, সব মূল্যহীন নিছক খেলা।

আমার স্বপ্ন তা হলে স্বপ্নই রয়ে গেল... অনুভব করলাম আমার চোখের কোল ভিজে উঠেছে। যেভাবেই হোক, এই রহস্যের মীমাংসা আমি করব। শাস্তি দেব দোষীকে-- চরম শাস্তি।

বেলা করে ঘুম থেকে উঠলাম আমি। ঝরনার পানিতে মুখ-হাত ধুয়ে নাস্তা সেরে স্যাডলে চাপলাম। তারপর মেসা পেরিয়ে পাইন ক্রীক হয়ে ফিরে এলাম বাকহেড মেসায়।

অসংখ্য ট্র্যাক মাটিতে। অধিকাংশই খুব বেশি হলে হপ্তাখানেক আগের। যে-কোনও ধনী গরু ব্যবসায়ীর যেমন থাকে, ট্র্যাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে পালটা খুব নাদুসনুদুস ছিল। এমন কিছু দেখতে পেলাম না যা থেকে বোঝা যায়, ওখানে কোনও একদিন একটা ওয়াগনও এসে দাঁড়িয়েছিল।

ওয়াগনটা যেখানে পোড়ানো হয় সেখানে গিয়ে আরও বোকা বনলাম আমি। সমস্ত আলামত নিপুণভাবে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বোঝাই যায় না কখনও আগুন লেগেছিল এই ক্যানিয়নে। শুধু কয়েকটা কালচে ডালপালা পড়ে আছে এদিকে সেদিকে। এমনকী আধপোড়া হাবগুলো পর্যন্ত নেই। অনুমান করলাম আশপাশেই কোথাও পুঁতে ফেলা হয়েছে নিশ্চয়ই।

হতাশ মনে আগের জায়গায় ফিরে গেলাম আমি। রাইফেল স্যাডলের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা, চোখ সতর্ক। শত্রু এলাকায় একা এসেছি, বিপক্ষে কতজন রয়েছে জানি না তবে ওদের কাছে আমার প্রাণের যে ফুটোকড়ি দাম নেই এটুকু বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না।

ক্যাম্প ফায়ারের ধারে বসে আছি আমি। ভীষণ একলাটি লাগছে। ড্রুসিলার মুখখানা মনে পড়লেই চিনচিনে ব্যথা অনুভব করছি বুকের বাঁ-পাশে। ক্ষণিকের জন্যে হলেও আমার নিঃসঙ্গতাকে ভরিয়ে তুলেছিল ওই মেয়ে। অমন লক্ষ্মী বউ মানুষের ভাগ্যে বড় একটা জোটে না।

স্মোকি মাউন্টিনের ওসমান আমরা। ভাইদের মধ্যে আমিই সবার বড়। ফলে বিপদ মোকাবেলায় বাড়ি ছেড়েছি সবচেয়ে আগে। টেনেসির লোক হয়েও দাসপ্রথাকে আমরা কখনও সমর্থন করিনি। তাই যুদ্ধে আব্রাহাম লিংকনের পক্ষে যোগ দিয়েছিলাম। নিজের জন্মস্থানকে আমি ভালবাসি আমার প্রাণের মত। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলাম সাদা-কালো, মানুষে মানুষে এই ভেদাভেদ, ঈশ্বরের সৃষ্টি হতে পারে না। স্রষ্টা কখনও একচোখা নন; পিতা তাঁর বহু সন্তানের মধ্যে একজনকে একটু বেশি ভালবাসেন বলেই কি একেবারে বঞ্চিত করেন অন্যদের? অন্তত আমার অভিজ্ঞতা তা বলে না। এক অর্থে ঈশ্বরও তো বিশ্বমানবের পিতা– তাঁর ইচ্ছায়ই তো সব কিছুর সৃষ্টি।

আমার পূর্বপুরুষদের রক্তে-ঘামে গড়ে উঠেছে এই দেশ। আমেরিকায় আমার বংশের আদিপুরুষ, আমার প্রপিতামহ, অ্যালান ওসমান, এক বৃহত্তর ঐক্যবোধের সন্ধানেই বাস্তুভিটে ছেড়ে সুদূর ইংল্যান্ড থেকে কালাপানি পাড়ি দিয়েছিলেন। অ্যালান ওসমানের স্বপ্ন ছিল এমন একটি দেশ, যেখানে মানুষে মানুষে কোনও প্রভেদ থাকবে না– যোগ্যতাই হবে উন্নতির একমাত্র মাপকাঠি। সে-ই বংশের ছেলে হয়ে আমি তাঁর স্বপ্নকে চুরমার হতে দেই কীভাবে? তা ছাড়া লড়াইয়ের প্রতি টান আমাদের রক্তে: গন্ধ পেলেই ছুটে যাই।

ওহাইওতে ইউনিয়ন আর্মির সিক্স ক্যাভালরিতে যোগ দিয়েছিলাম আমি।

দ্রষ্টব: জলদস্যু, নীলগিরি

তারপর যুদ্ধ মিটলে বেরিয়ে পড়লাম ভাগ্যের সন্ধানে।

যুদ্ধ থামার পরপরই আমার ছোট দুই ভাই, অ্যাঞ্জেল আর ও'নীল, পশ্চিমে চলে আসে। সেখানে মায়ের জন্যে বাড়ি বানিয়েছে ও'নীল। মা তাঁর ছোট দুই ছেলে, জো আর ববকে নিয়ে ওখানেই আছেন। ও'নীল মোরার শেরিফ। একজন সৎ লোক হিসেবে ওখানে সে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। অ্যাঞ্জেল রাজনীতি করে, রাজ্য বিধানসভার একজন সদস্য।

আমার সে-রকম কিছু নেই। কলর্যাডোর পাহাড়ে ড্রুসিলা আর আমার একটা ছোট্ট সোনার খনি অবশ্যি আছে। কিন্তু সোনা বয়ে আনা অনেক ঝকমারি। প্রায় সারা বছরই বরফ থাকে ওই পাহাড়ে। মাস দুয়েকের মত সময় পেয়েছিলাম, ওর মধ্যেই যতটুকু সম্ভব নিয়ে এসেছি আমরা। কিন্তু আমার আন্তরিক ইচ্ছা, একটা বাথান করব। তাই জিনিসপত্র কিনে ড্রুসিলাকে নিয়ে টনটো বেসিনেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু এখন ড্রুসিলা নেই, সম্ভবত নিহত হয়েছে, আমার রসদও সব গেছে... শত্রুরা খুঁজে ফিরছে আমাকে। অথচ আমি একা– সহায় বলতে একটা কোল্ট আর উইনচেস্টার রাইফেল।

পশ্চিমে আমাদের আত্মীয়স্বজন অনেকেই আছে। আশপাশেই রয়েছে ক্রিস, শ্যন, ও'নীল আর অ্যাঞ্জেল। খবর পেলেই ছুটে আসবে সবাই। কিন্তু আমি এমন এক গহীন জায়গায় আছি যেখান থেকে খবর পাঠানো সম্ভব নয়। সে-ক্ষেত্রে আমাকে লোকালয়ে যেতে হবে– অথচ এই মুহূর্তে সেটা পারছি না।

আগুন নিভিয়ে একটা গাছের তলায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম আমি। আজ আর ঘুমের ব্যাঘাত হলো না। একটা স্থিরসংকল্পে মনকে বেঁধেছি– শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে যখন বিছানা ছাড়লাম তখন উজ্জ্বল রোদে হাসছে প্রকৃতি। ঘোড়াকে পানি খাওয়াতে ঝরনায় নিয়ে গেলাম, নিজেও মুখ-হাত ধুলাম ভাল করে, তারপর অ্যাপালুসাকে ঘেসো জমিতে ছেড়ে দিয়ে নাস্তার জোগাড়ে বসলাম। একটা বিরক্তিকর অস্বস্তি ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করছে আমাকে। বুঝতে পারছি কেন এ-রকম বোধ হচ্ছে। আমার রাগ দমন করতে পারি আমি, কিন্তু একটা বিশেষ স্তর অবধি– তারপর প্রলয় ঘটতে বাধ্য। এই সঙ্গে আরও একটা জিনিস বুঝতে পারছি, এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে– একমাত্র তা হলেই সফল হবে আমার উদ্দেশ্য।

ওই সকালেই আমি ড্রুসিলাকে আবিষ্কার করলাম।

ওয়াগনটা যেখানে রেখে গিয়েছিলাম সেখান থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে পেলাম ওকে। সূত্রের আশায় ঘোরাঘুরি করছিলাম আমি, হঠাৎ পাহাড়ের ঢালে একটা ফাটল চোখে পড়ল। মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে রইলাম স্থাণুর মত, মনে ভয় জেগে উঠেছে। মাত্র এক সেকেন্ড আগেও বাস্তবকে অস্বীকার করার প্রয়াস পাচ্ছিলাম; ভাবতে ভাল লাগছিল ড্রুসিলা এখনও বেঁচে আছে– ঠিকই নিজের পথ করে কোথাও পালিয়ে গেছে ও।

পাহাড়ী ফাটলগুলো যেমন হয়, এটাও তেমনি মেসার প্রান্তে। দীর্ঘ একটা

মিনিট পর ফাটলের কাছে হেঁটে গেলাম আমি। মাটি ফেলে ফাটলের মুখ বোজানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু অতিরিক্ত তাড়াহুড়োর ফলে শেষ-রক্ষা হয়নি, ঠিকই বোঝা যাচ্ছে ওটা। গর্তের মাটি সরাতেই ড্রুসিলার লাশ বেরিয়ে পড়ল।

শ্বাস রোধ করে মারা হয়েছে। তবে মৃত্যুর আগে বাধা দিয়েছিল, ওর আঙুলের নখে শুকনো রক্তের দাগ আর ছেঁড়া মাংসকণাই সাক্ষ্য দিচ্ছে আপ্রাণ লড়েছিল ও, ঘাতকের শরীর থেকে মাংস খুবলে নিয়েছে।

ঠাণ্ডায় বিকৃত হয়নি লাশ, তবু ওর মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না আমি। অনেকক্ষণ বজ্রাহত মানুষের মত বসে রইলাম লাশের কাছে, যখন সম্বিৎ ফিরল নিজের কম্বলটা নিয়ে এসে ঢেকে দিলাম ওকে। তারপর নেমে গেলাম ক্যানিয়নে। ওখানে একটা ঝোপের ভেতর আমার বেলচাটা পড়ে আছে। খুনী আগুনে জ্বালানি চাপানোর কাজে ব্যবহার করেছিল ওটা, পরে মনের ভুলে ফেলে গেছে।

মেসার মাথায় একটা গভীর গর্ত খুঁড়ে সেখানে শোয়ালাম ড্রুসিলাকে, মাটি দিয়ে ভরাট করে পাথর ছড়িয়ে দিলাম কবরের ওপর। আমার নতুন বউই নাইফ দিয়ে গাছের ডাল কেটে একটা ক্রুশ তৈরি করলাম, তারপর ছুরির ফলা আগুনে তাতিয়ে লিখলাম ক্রুশের গায়ে:

ড্রুসিলা ওসমান
এখানে হত্যা করা হয় ওকে
এপ্রিল ২৫, ১৮৭৭

ইচ্ছে করেই কাজটা করলাম আমি। এর ফলে খুনী টের পেয়ে যাবে আমি বেঁচে আছি, এবং ফিরে এসেছি; কিন্তু অন্যদিকে আমার বিরাট লাভও হবে একটা। যারা আমাকে খুন করার জন্যে খুঁজছে, অথচ সত্যিকার ঘটনা জানে না, তারাও এ-বার জানবে সেটা।

রাইফেলটা ঠিকমত কাজ করছে কিনা পরখ করলাম আর একবার, তারপর ঘোড়ায় চেপে চলে এলাম মেসা ছেড়ে।

তাস বাটা হয়ে গেছে, এখন শুরু হবে খেলা। ওরা খুঁজবে আমাকে, আর আমিও পাল্টা ধাওয়া করব। এতটুকু দয়া দেখাব না কাউকে। রক্তপিপাসা জেগেছে আমার হৃদয়ে।

গ্লোব। পাইন্যাল ক্রীকের ধারে ছোট্ট শহর। গুটিকতক রোদে-পোড়া ইটের দালান, কাঠের কেবিন আর ছড়ানো, ছিটানো তাঁবু। এবং তিনটে স্যালুন। শহরে ঢোকার মুখে যেটা আগে পড়ে, সেখানেই ঘোড়া থেকে নামলাম আমি। লক্ষ করলাম লোকজন কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে আমাকে।

স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশি লম্বা বলে হরহামেশাই আমি মানুষের নজর কাড়ি, তাই ব্যাপারটা গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি আলাদা– সাবধান হয়ে গেলাম।

জনা আটেক খদ্দের রয়েছে স্যালুনে। ওদেরকে একনজর দেখে নিয়ে বারটেন্ডারকে বললাম, 'এক পেগ করে হুইস্কি দাও সবাইকে– দাম আমি দেব।'

দু-একজন ইতস্তত করল একটু, তবে বেশিক্ষণের জন্যে নয়। দীর্ঘকায় চৌকো চোয়াল-বিশিষ্ট এক লোক মাপল আমাকে, তারপর নিজের গ্লাস উঁচু করে ধরে বলল, 'হঠাৎ এই বদান্যতা, বন্ধু?'

'আমার কিছু তথ্য চাই। আমি একটা কাউ আউটফিটকে খুঁজছি। ওদের কয়েকজন লোক দুহপ্তা আগে মগলোন এলাকায় কাজ করছিল।'

একটা শব্দও উচ্চারণ করল না কেউ। আমার পাশেই এক লোক বসেছিল, কিছুক্ষণ পর সে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার মিস্টার?'

'ওদের মধ্যে দুজনের নাম আমি জানি–মেকন আর ড্যাঙ্গার।'

'তারচেয়ে আমি বলি কী'– মুখ খুলল একজন। মোটা, দশাসই ধড়ের ওপর গোল-আলু সাইজের মাথা, গায়ের রঙ শ্যামলা– 'তোমার ওই ঘোড়াটা নিয়ে কেটে পড়ো এখান থেকে।'

'আমি কারও উপদেশ চাইনি।'

গোল-আলু ভেংচি কাটল আমাকে। 'গর্দভ! মেকনের মত ঘাঘু পিস্তলবাজ এই তল্লাটে আর একটাও নেই।'

'তুমি গর্দভ বললে আমাকে!'

হাতের গ্লাস নামিয়ে রাখল গোল-আলু। 'তো?'

গোল-আলু ভেবেছিল আমি পিস্তলের দিকে হাত বাড়াব; কিন্তু আমার ঘা সারেনি, দ্রুত ড্র করতে পারব কিনা সন্দেহ, তাই ঘুসি মারলাম।

লোকটা প্রায় আমার সমান লম্বা, কিন্তু ওজনে ভারি– বিশ পাউন্ডের মত। অপত্যাশিত আঘাতে হকচকিয়ে গেল সে। আমার লেফট জ্যাবে ওর সামনের পার্টির দুটো দাঁত ভেঙে গেল। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎবেগে ছোবল মারল ডান হাত। কানের ওপর আধমনী ঘুসি খেয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল মোটুকু, রক্ত বেরোচ্ছে কান থেকে। সর্ষেফুল দেখছে চোখে, অন্ধের মত হাত বাড়াল হোলস্টারের দিকে।

চট করে ওর কোমরের বেল্ট চেপে ধরলাম আমি, হ্যাঁচকা টানে নিয়ে এলাম সামনে, পরক্ষণে ধাক্কা দিয়ে পেছনে ঠেলে দিলাম। সজোরে দেয়ালের সাথে বাড়ি খেলো লোকটা, ডানে বাঁয়ে প্রবলবেগে মাথা ঝাঁকাল দু-তিনবার, তারপর সামলে নিয়ে তেড়ে এল।

দ্রুত এক পা এগিয়ে গেলাম আমি, ভাঙা দাঁতের ওপর স্ট্রেট কাট ঝাড়লাম একটা, পায় ওর গায়ের সঙ্গে সেঁটে গিয়ে তলপেটে পিস্টনের মত একনাগাড়ে কয়েকটা ঘুসি মারলাম দুহাতে।

হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল গোল-আলুর, নিতম্ব দিয়ে ধপাস করে পড়ে গেল মেঝেতে, লাথি মেরে ওর পিস্তলটা দূরে পাঠিয়ে দিলাম।

'এরপর যখন কথা বলবে আমার সাথে,' বললাম আমি, 'হুঁশ থাকে যেন– মিস্টার বলে ডাকবে।'

বারে ফিরে গিয়ে নিজের গ্লাস তুলে নিলাম আমি।

'ওদের,' জিজ্ঞেস করল চৌকো-চোয়াল, 'তুমি খুঁজছ কেন?'

গোল-আলু ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে দেখে পিস্তল বের করলাম। এখনও ক্ষিপ্রতা ফিরে পাইনি, তবে ট্রিগার টিপতে পারব। আলুর দিকে পিস্তলটা তাক করে বললাম, 'তুমি বোধ হয় মেকনের বন্ধু। ওকে বলবে প্রথমবার আমাকে মারতে পারেনি সে। বলবে, এরপর সামনাসামনি মোকাবেলা হবে।'

ঠাণ্ডা চোখে আমার দিকে তাকাল চৌকো-চোয়াল। 'তার মানে তুমি বলছ সনোরা মেকন তোমার পিঠে গুলি করেছিল?'

বাঁ-হাতে মাথা থেকে হ্যাট সরালাম আমি। বুলেটের দাগটা ওরা সবাই দেখতে পেলে স্পষ্ট। দগদগে হয়ে আছে, চারপাশের চুল কামিয়ে দিয়েছিল আর্মি সার্জন, যেন বাতাস পেয়ে ঘা তাড়াতাড়ি শুকোয়। 'ওকে দেখলে চিনতে পারব না, তবে আমার পেছনটা ও ঠিকই চেনে। বাকহেড মেসায় একটা পাহাড়ের ওপর আমাকে গুলি করেছিল।'

'বিশ্বাস হয় না।'

'বিশ্বাস করা না করা তোমাদের মর্জি।' গ্লাসের অবশিষ্ট পানীয়টুকু গলায় ঢেলে বার থেকে পিছিয়ে এলাম আমি। 'দেখা হলে বোলো, আমি খুঁজছি ওদের।'

'আহত, নিরস্ত্র একটা মানুষকে তাড়া করেছিল ওরা। কিন্তু এ-বার আমি তাড়া করব। বলো, ওরা যদি গর্তেও গিয়ে লুকোয়, ঠিকই খুঁজে বের করব।'

'তোমার, দেখছি, খুব বড় গলা, স্ট্রেঞ্জার।'

'কারও মনে যদি সন্দেহ থাকে,' বললাম আমি, 'সামনে এসো– হয়ে যাক এক হাত।'

'চল্লিশজন লোক আছে ওই দলে। সবাই কঠিন– এবং ভাল।'

'ভাল? মিস্টার, ওদেরই কেউ একজন আমার স্ত্রীকে খুন করেছে। গুলি করে মেরেছে আমার ছটা খচ্চরকে, ওয়াগন পুড়িয়ে দিয়েছে।'

'তোমার বউকে মেরেছে?'

মুহূর্তে নীরবতা নামল ঘরে। থমথমে পরিবেশ। আমার কথায় যেন নিশ্বাস পর্যন্ত নিতে ভুলে গেছে সবাই, বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

'ওয়াগনে আমার স্ত্রীকে রেখে বাকহেড থেকে বেরোনোর রাস্তা খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর, বা সামান্য কিছু বেশি হবে, কেউ একজন গুলি করে আমাকে। তারপর আমার লাশ খুঁজতে থাকে। ওদের কথা শুনতে পেয়েছিলাম, ওইসময়েই মেকন আর ড্যাঙ্গারের নাম কানে আসে।

'খুব ভাল মেয়ে ছিল আমার স্ত্রী। গলা টিপে মারা হয়েছে ওকে। মিস্টার, এটা যার কাজ তার শরীরে ওর খামচির দাগ আছে। আমার স্ত্রীর নখে রক্ত, ছোঁড়া মাংসের কণা লেগেছিল।

'তারপর খচ্চরগুলোকে হত্যা করে সে, এবং ওয়াগনের সাথে ওদেরও পুড়িয়ে ফেলে। গত মাসের পঁচিশ তারিখে আমার স্ত্রী খুন হয়েছে। ওইসময়,

স্যার, এই এলাকায় খুব বেশি লোক ছিল না। কাজেই আমি ঠিকই খুঁজে বের করব।'

একটা চাপা অথচ ক্রুদ্ধ গুঞ্জন উঠল ঘরে। মড়ার মত ফ্যাকাসে আর শক্ত হয়ে গেল চৌকো-চোয়ালের মুখ, তবে বলল না কিছু। শুধু বারটেন্ডারকে ডেকে ফ্যাসফ্যাসে গলায় ফরমাশ দিল, 'আর এক গ্লাস।'

বারের রেলিং শক্ত মুঠিতে চেপে ধরল বারটেন্ডার। 'একজন মহিলাকে যে খুন করতে পারে সে মোটেও ভাল নয়,' বলল ও, 'নীচ চরিত্রের লোক। ফাঁসির দড়ি লটকানোর সময়ে আমাকেও ডেকো, মিস্টার।'

একজন খদ্দের জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী, মিস্টার? আমরা চিনি না তোমাকে।'

'ওসমান,' বললাম আমি, 'উইলিয়ম ওরিন ওসমান।'

'মোরার গানফাইটার তোমার কেউ হয়?'

'ছোট ভাই।'

এক ঢোকে নিজের গ্লাস খালি করল চৌকো-চোয়াল, তারপর ঘুরে বেরিয়ে গেল স্যালুন থেকে।

'লোকটা কে?' জানতে চাইল একজন।

'গরু ব্যবসায়ী হবে, বোধ হয়,' বলল আর একজন। 'চিনি না।'

গুমট পরিবেশ বারে। চুপচাপ ড্রিংক করছে সবাই। একসময় বারটেন্ডার আমাকে বলল, 'রাতে কিছু খাবে না, মিস্টার? টেবিলে গিয়ে বসো, আমি নিয়ে আসছি।'

সহসা রাজ্যের ক্লান্তি ভর করল আমার ওপর। আমার শক্তি ফিরে আসতে শুরু করেছে, কিন্তু ভারি কাজ করার মত অবস্থা আসেনি। একটু আগের ওই সামান্য লড়াইতেই হাঁফ ধরে গেছে। পিস্তলটা হোলস্টারে রেখে, টেবিলে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়লাম একটা চেয়ারে।

এক থালা খাবার আর কফিপট দিয়ে গেল বারটেন্ডার। ধন্যবাদ জানিয়ে নীরবে খেতে শুরু করলাম আমি। কিন্তু আমার মন আচ্ছন্ন করে রইল ড্রুসিলা। অনুভব করছি একটা শীতল আগুনে আমার অন্তর জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে আমাকে গ্রাস করল ওই আগুন...সব স্বপ্ন, সমস্ত চিন্তা ধুয়ে-মুছে গিয়ে একটা ইচ্ছাই জেগে রইল কেবল– একজন লোককে আমার চা-ই, খুন করব।

একজন? চকিতে উপলব্ধি করলাম হ্যাঁ, একজনই: হত্যাকাণ্ডের সাথে এর বেশি লোক জড়িত নেই– সে-ক্ষেত্রে পাপ ধামাচাপা দিতে পারত না।

ছয়

আহারপর্ব সেরে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। দামাল হাওয়া বইছে। আনত কালো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে। ম্লান জ্যোৎস্নায় থমথম করছে মৌন রাত। একলা বোধ করছি আমি, অন্তরে নিঃসীম শূন্যতার হাহাকার।

ড্রুসিলা!...নিষ্ঠুর মৃত্যুবরণ করেছে ড্রুসিলা। আমার পথ চেয়ে একাকিনী বসেছিল ও, এবং তখনই আক্রান্ত হয়েছিল। জীবনের মিষ্টি স্বাদ পেল না মেয়েটা, তার আগেই পাশবিক কামনার আগুনে পুড়ে বিদায় নিতে হলো পৃথিবী থেকে।

কারও কষ্ট সইতে পারত না ড্রুসিলা। ওর মন ছিল পেঁজা তুলোর মত নরম। সারাক্ষণ আমার মঙ্গল চিন্তায় বিভোর থাকত, কীভাবে আমাকে আর একটু সুখী করবে তা নিয়ে ওর ভাবনার অন্ত ছিল না। আমার জীবনে যে-সব ক্ষণিক ভাললাগার স্মৃতি রয়েছে সে-বই ড্রুসিলার অবদান।

এখন ও নেই এ-যন্ত্রণাই কুরে কুরে খাচ্ছে আমাকে। ড্রুসিলা মা হতে চেয়েছিল, মনে পড়ল। নারীমাত্রই মাতৃত্বের স্বাদ চায়; ওখানেই তাদের নারিত্বের সার্থকতা, পূর্ণতা। মা হওয়ার অধিকার প্রতিটা মেয়েরই জন্মগত। অথচ ওর সেই অধিকার অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো।

আমার মনে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। বুকের ভেতর জমা করে রেখেছি ওই আগুন– জানি, আমারও সময় আসবে একদিন। অ্যাপালুসা মাথা হেলিয়ে করুণ চোখে তাকাল আমার দিকে। হিম বাতাসে শীত করছে অবলা জীবটির, রাতও অনেক হয়েছে। বুঝলাম ও বিশ্রাম চায়। এগিয়ে গিয়ে উইনচেস্টারখানা বের করলাম স্ক্যাবার্ড থেকে, তারপর স্যাডলে উঠে ঝরা পাতা আর ধুলো মাড়িয়ে ফাঁকা রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম সামনে।

লিভারি স্ট্যাবল নেই এই শহরে, শুধু একটা ভাঙাচোরা কোরাল রয়েছে। স্টলে গোটা কয়েক ঘোড়া বাঁধা, দরজার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে। কোরালের অদূরে অসংখ্য পাথরচাঁই ছড়ানো ছিটানো, তার ও-পাশে পাহাড়। ফলে ঠাণ্ডার প্রকোপ এখানে কিছুটা হলেও কম। পাহাড় আর পাথরচাঁইয়ের বাধা পাচ্ছে বাতাস। জিন খসিয়ে এককোণে একটা খড়ের গাদার ওপর রেখে দিলাম আমি, তারপর ঘাস দিয়ে অ্যাপালুসার সারা গা মালিশ করে বেঁধে রাখলাম স্টলে। থলেতে ভুট্টা ছিল, খানিকটা ধরলাম ওর মুখের সামনে। থলেটা ছোট, তবে একটা ঘোড়া পেট পুরে খাওয়ার মত মজুদ ওতে আছে।

কোরাল থেকে বেরিয়ে আবাসিক এলাকার পানে চোখ ফিরালাম। নিশুতি রাত, এখানকার লোকেরা ভোরে ওঠে, অধিকাংশ বাসার বাতি নেভানো। কেবল দু-তিনটে জানালায় তখনও আলো দেখা যাচ্ছে, ওই বাতিগুলো দেখে হঠাৎ হু-হু

করে উঠল আমার বুক।

একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় এসেছি আমি। পরক্ষণে ভাবলাম, আচ্ছা, আজ পর্যন্ত আমি এ-রকম কতগুলো শহরে গিয়েছি? একজন নিঃসঙ্গ ঘোড়সওয়ারের জন্যে বলতে গেলে প্রায় সব জায়গাই অপরিচিত অচেনা পরিবেশ– মুসাফির হিসেবেই গণ্য করা হয় তাকে। ড্রুসিলার সাথে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত আমার জীবন ওইরকম ছন্নছাড়া ছিল, আবার নাহয় তা-ই হয়েছে।

কোরালের অনতিদূরে একটা গভীর নালা। শহরের যাবতীয় ময়লা ওই পথে নিষ্কাশিত হয়ে নদীতে গিয়ে পড়ে। নিজের দুঃখ-বেদনায় ডুবে হাঁটছিলাম আনমনে, হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম নালায়– এবং ওটাই শাপে বর হলো আমার জন্যে।

মাটিতে পড়ার সাথে সাথে গুলির শব্দে তালা লাগল কানে, তারপর আবার সব কিছু নীরব। অনড় হয়ে নালার ভেতর শুয়ে রইলাম আমি, কান খাড়া। গুলিটা যে-ই করে থাকুক, নির্ঘাত ধরে নিয়েছে মারা গিয়েছি আমি– তাই কাছে এসে একবার দেখার প্রয়োজন বোধ করছে না। যখন কয়েক মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পরেও আর কোনও শব্দ এল না, সন্তর্পণে উঠে হামাগুড়ি দিয়ে কোরালের এককোণে গিয়ে বসলাম: সাধ করে গুপ্তঘাতকের নিশানা হতে চাই না।

আরও কিছুক্ষণ পর নিশ্চিত হলাম, আমার অদৃশ্য আততায়ী নিঃশব্দে সটকে পড়েছে। কিন্তু আমি জানি সাবধানের মার নেই। কোনও ঝুঁকি নিলাম না, ঘোড়ায় চেপে পিছিয়ে জঙ্গলে ঢুকলাম, ঘুরপথে ফিরে গেলাম স্যালুনে। শহরের মাত্র ওই একটা জায়গাতেই আলো জ্বলছে এখনও।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম আমি। তিনজন খদ্দের রয়েছে, দুজন বসে আছে একটা টেবিলে।

বারটেন্ডার পলকে পলক তুলে দেখল আমাকে এবং তারপর যেন মনে হলো বারের শেষ-প্রান্তে-দাঁড়ানো লোকটার ওপর সরে গেল ওর দৃষ্টি। এটা কি কোনও হুঁশিয়ারি? নাকি এমনি তাকাল ওর দিকে– হয়তো-বা সবশেষে এসেছে বলেই?

ছিপছিপে একহারা গড়ন লোকটার। হাড্ডিসার মুখ, খাড়া নাকের দুপাশে কোটরগত চোখ।

ডান হাতে রাইফেলটা নিয়ে বারে গিয়ে দাঁড়ালাম। 'রাই,' বলে ঝুঁকে পড়লাম বারের ওপর। তারপর সবার অলক্ষ্যে আলতোভাবে রাইফেলের নলটা একটু উঁচু করে কোণের সে-ই দীর্ঘকায় লোকটার হৃদপিণ্ড বরাবর তাক করলাম।

বারটেন্ডার এক গ্লাস রাই সার্ভ করল। বাঁ-হাতে গ্লাসটা নিয়ে দীর্ঘদেহীর পানে তাকালাম আমি। 'কোরালের সামনে আমাকে মারার চেষ্টা করেছিল কেউ।'

আমার স্বরে যদিও সুস্পষ্ট কোনও ইঙ্গিত ছিল না, অনেকটা স্বগতোক্তির

ঢঙে বলছিলাম, কিন্তু একটা জিনিস নজর এড়ায়নি। দীর্ঘদেহীর বুটের গোড়ালিতে কাদা লেগে রয়েছে। কাছেপিঠে এক জায়গাতেই কাদা চোখে পড়েছে আমার– কোরালে ওঅটর ট্রাফের পাশে।

ভালমানুষের মত মুখ করে তাকাল দীর্ঘদেহী। 'আমি না,' বলল, 'আমার মিস হয় না।'

'আমার কিন্তু তোমাকেই সন্দেহ,' বললাম আমি। 'তোমার গোড়ালিতে কাদা লেগে আছে।'

বারের রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল লোকটা, আচমকা পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল। আস্তে করে রাইফেলের ট্রিগার বাঁকা করলাম আমি।

বুকে .৪৪ বুলেটের ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড় করে পিছিয়ে গেল দীর্ঘদেহী, আধপাক ঘুরে গেছে একদিকে। লেভার টনে চেম্বারে আর একটা বুলেট পাঠিয়ে ধাওয়া করলাম ওকে।

দেয়ালের দিকে টলতে টলতে এগোচ্ছিল লোকটা, একদৌড়ে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার স্ত্রীকে কে মেরেছে– তুমি?'

হকচকিয়ে গেল ও, ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। 'তোমার স্ত্রী? না। আ...আ...তুমি বসকে খুন করার চেষ্টা করেছিলে। ম্...মগলোনসের কাছে।' ক্ষীণ হয়ে আসছে ওর গলা, ঘোলাটে দৃষ্টি।

'মিথ্যে কথা। খামোকা মরলে তুমি। নাম কী তোমার বসের?'

অপলক চোখে চেয়ে রইল লোকটা; সকল সন্দেহ, ঝগড়া-বিবাদের উর্ধ্বে চলে গেছে।

এ-বার আমি অন্যদের উদ্দেশে ঘুরলাম। স্যালুন মালিকের দুটো হাতই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বারের ওপর। বাকি দুজন খদ্দেরও অনুসরণ করেছে ওর দৃষ্টান্ত।

'অন্যায়ভাবে সুযোগ নিয়েছ তুমি,' অনুযোগ করল একজন।

'মিস্টার,' জবাব দিলাম, 'গলা টিপে আমার স্ত্রীকে খুন করেছে ওরা। আমাকেও মারার চেষ্টা করেছিল– পারেনি। যেভাবে ওরা শুরু করেছে, এখন আমিও সেভাবেই খেলব ওদের সাথে।'

ভুরু কোঁচকাল লোকটা। 'ও-সব বোলচাল অনেক শুনেছি।'

পাত্তা দিলাম না ওকে। নিহত লোকটাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ও কোন আউটফিটে কাজ করত?'

ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকাল ওরা। প্রাণের মায়া প্রত্যেকেরই আছে, অন্যের ঝামেলায় জড়াতে চায় না। সবই বুঝতে পারলাম। ওদের দোষ নেই; বাড়িতে বউ-ছেলেমেয়ে আছে, শহুরে লোক– সেখানে আমি একজন নিছক ভবঘুরে বৈ কিছুই নই। দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল থেকে হুট্ করে এসেছি, হুট্ করেই চলে যাব একদিন। এমন লোকের কথায় আবার কান দেয় কেউ!

'বাইরে গিয়ে ওর ঘোড়াটা দেখলেই পারো,' পরামর্শ দিল বারটেন্ডার। 'দুটো ঘোড়াই কেবল আছে ওখানে– তোমার আর ওর।'

লোকটার কথা আমার পছন্দ হলো। সিদ্ধান্ত নিলাম ওই ঘোড়াটা একনজর দেখে, পাহাড়ে কোথাও গিয়ে রাত কাটাব। উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি, এ-রকম অরক্ষিত জায়গায় থাকা ঠিক নয়। পাল্লা খুলে বাইরে গিয়েই চমকে উঠলাম আমি, হিচ রেইলে শুধু আমার ঘোড়াটাই বাঁধা আছে। মুহূর্তে সজাগ হয়ে গেল আমার সমস্ত পেশী।

ঝটিতি সরে গেলাম কপাটের একপাশে, প্রায় একই সময়ে একটা রাইফেলের ভোঁতা গর্জনে রাতের নৈঃশব্দ্য ভেঙে পড়ল। স্যালুনের ব্যাটউইং-ডোরে আঘাত হানল বুলেট। ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়লাম আমি, গড়িয়ে সরে গেলাম গাঢ় অন্ধকারে। দ্বিতীয় বুলেটটা চলটা তুলে নিল ফুটপাতের।

উঠে বসলাম এক হাঁটুতে ভর রেখে, রাইফেল বাগিয়ে ধরেছি। কিন্তু অস্বাভাবিক কোনও নড়াচড়া চোখে পড়ল না। রাস্তার উল্টো দিকে পাশাপাশি দুটো দালান, আর একটু তফাতে একটা তাঁবু। আঁধারে ভৌতিক আবহ সৃষ্টি করেছে ওগলোর কালো কাঠামো। আশপাশে বেশ কিছু ঝোঁপ এবং আর একটা কোরাল রয়েছে।

নিশ্চয়ই স্যালুনে ঢোকার সময়ে শত্রুপক্ষের কারও নজরে পড়ে গিয়েছিলাম আমি। বাইরে ওত পেতেছিল ওই লোক। জানত ভেতরে ওদের এক সঙ্গী আছে। ও ব্যর্থ হলেও সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না, আমি বাইরে পা রাখামাত্র ওর রাইফেলের নিশানা হব। সম্ভবত ওই লোকই আগেভাগে সরিয়ে নিয়েছে ঘোড়াটা।

বস্তুত ঘোড়াটা সরানোর ফলেই এ-যাত্রা আমি বেঁচে গিয়েছি। ওটা জায়গামত দেখতে না পেয়ে সতর্কঘণ্টি বেজে উঠেছিল মাথায়।

স্যালুনে ফিরে গেলাম আমি। একজন খদ্দেরও নেই, বোধ হয় খিড়কি পথে চলে গেছে। স্যালুন মালিক একটা সাদা ন্যাকড়া দিয়ে সাফ করছে বার। অনেক সময় নিচ্ছে সে নিজের কাজ সারতে।

চুলোয় কফিপট চড়ানোই ছিল, বারের পেছনের তাক থেকে কাপ নামিয়ে কফি ঢাললাম। তারপর দরজা-জানালো থেকে দূরে একটা নিরাপদ জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

'তোমার মতলবটা ঠিক বুঝতে পারছি না,' বারটেন্ডারকে বললাম আমি।

সোজা হলো লোকটা, ভুরু কোঁচকাল। 'কেন, আমি আবার কী করলাম?'

'ওর ঘোড়াটা দেখতে বলেছিলে। আর একটু হলেই আমি মারা পড়তাম।'

'তুমি যদি ভেবে থাকো আমি তোমাকে বিপদের মুখে–' শুরু করল বারটেন্ডার।

'সেটাই এখন যাচাই করে দেখব। আগে বুঝতে হবে তোমার কী স্বার্থ এতে।'

আমার সামনে এসে দাঁড়াল বারটেন্ডার। 'মিস্টার, আমার নাম বব ও'ল্যারি। ডজ থেকে ডেডউড, টোমবস্টোন থেকে স্যান অ্যানতোনিও বহু জায়গায় বার চালিয়েছি। যে-কোনও লোককে জিজ্ঞেস করলেই জানবে, আমি

এক কথার মানুষ। একদম সাধু তা বলছি না, তবে খুন-খারাপিতে নেই। আগেও বলেছি তুমি খুঁজে বের করো ওদের– আমি আছি তোমার পাশে।'

'বেশ, এখনকার মত তোমার কথাই মেনে নিলাম, মি. বব ও'ল্যারি। শুধু একটা কথা বলব, ভালই কায়দা বের করেছ তুমি।'

'ভুল, মি. ওসমান। একটু চিন্তা করলেই বুঝবে, তোমাকে মারার জন্যে ছলচাতুরীর দরকার হয় না– এই মুহূর্তে তুমি কারও ডেথ-লিস্টের পয়লা নম্বরে আছ।

'ওর জায়গায় নিজেকে কল্পনা করো। ধরো, এমন কেউ তোমার বউকে খুন করেছে, যার লোকবল আছে। তা হলে এখন সে কী করবে? না-না, আমিই বলছি। ভীষণ ভয় পেয়েছে সে...মৃত্যু ভয়। কেবল তোমাকেই নয়, তার নিজের লোকেরা কী ভাববে সে-ব্যাপারেও ওর দুশ্চিন্তা আছে।

'ওদেরকে একটা বানোয়াট কাহিনি বলেছে সে। তখন তুমি যাকে মারলে, ওই পাঞ্চারের কথা থেকেই বোঝা যায় সেটা– তুমি খুন করার চেষ্টা করেছিলে ওর বসকে। ওরাও বিশ্বাস করেছে সেটা। তাই এখন তোমাকে মারতে চাইছে। নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, গরুর গায়ে মার্কা লাগানোর চাইতে এ-কাজে উত্তেজনা অনেক বেশি।

'কিন্তু এখন তুমি এসে অন্যরকম বলছ। কাজেই তোমার মুখ বন্ধ করা দরকার তার।'

'তুমি বরং এভাবে দেখো ব্যাপারটা,' ব্যাখ্যা করল বারটেন্ডার, 'ওই লোক বুনো এলাকা দিয়ে একা-একা যাচ্ছিল। তোমার বউ সুন্দরী। ওকে দেখে লোভ জাগে তার, পরের ঘটনা অনুমান করা খুব সোজা।

'মি. ওসমান, তোমার শত্রু আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। সে জানে, পশ্চিমের মানুষ মেয়েদের কোন চোখে দেখে। জানে, আসল ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলে তার নিজের লোকদের অনেকেই ফাঁসির দড়ি এগিয়ে দেবে। সে কাপড় নষ্ট করে ফেলেছে ভয়ে, সে-জন্যেই তোমার ওয়াগন, খচ্চর সব ধ্বংস করে দিয়েছে।

'নিশ্চয়ই তোমার মাথার জন্যে বিরাট অঙ্কের পুরস্কারও ঘোষণা করেছে, যদিও তার কোনও দরকার নেই। কাউহ্যান্ডরা সাধারণত বিশ্বস্ত হয়– মালিকের সাথে বেঈমানী করে না।'

মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনছিলাম আমি। ও'ল্যারির অনুমান নির্ভুল বলে মনে হলো।

ল্যারি তখন বলছে, 'তোমার মালপত্র পুড়িয়ে ফেলার পেছনে আরও একটা কারণ আছে। তোমাকে চালচুলোহীন ভবঘুরে বলে প্রমাণ করতে হবে, তা হলেই ওর কথা ভালমত বিশ্বাস করবে সবাই।'

আর এক পেয়ালা কফি দিল বারটেন্ডার। 'শোনো, ওসমান, কার কাজ করে জানি না, তবে এই ড্যাঙ্গার লোকটাকে আমি চিনি। ডজে প্রায়ই আসত। চৌকশ লোক– এবং বিশ্বস্ত।'

কফিপট হাতে দাঁড়িয়ে আছে ও'ল্যারি। মোটে একটা আলো জ্বলছে ঘরে। বারের পেছনে রিফলেক্টর-লাগানো রেড়ির ল্যাম্প। আলো-আঁধারিতে ল্যারির তোবড়ানো গালে গভীর ছায়া পড়েছে।

'সনোরা মেকনও আছে ওদের সঙ্গে,' খেই ধরল বব। 'এ-তল্লাটের সবচেয়ে ক্ষিপ্র পিস্তলবাজ। মেকন যেখানে, অ্যাল য্যাব্‌রিস্কি আর র‍্যাফ রোমেরেও সেখানে থাকার কথা। ওদের কারও সামনে পড়লে তোমার নিস্তার নেই– মুখ খোলার আগেই মারা পড়বে।'

আমি উঠে হাত বাড়িয়ে রাইফেলটা তুলে নিলাম টেবিল থেকে। ও'ল্যারি বাতির কাছে গিয়ে দাঁড়াল, এক হাত চোঙের মত করে চিমনির মাথায় রেখে নিভিয়ে দিল ফুঁ দিয়ে। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ল ঘর।

'ঠিক আছে, ওসমান,' বলল সে, 'তোমার যখন সুবিধে, চলে যেও।'

দোরগোড়ায় গিয়ে মুহূর্তের জন্যে থামলাম আমি। 'ধন্যবাদ,' বলে জিজ্ঞেস করলাম ওকে, 'তোমার কী ধারণা, আমার কোনও আশা নেই– তাই না?'

'আমি ন্যায়ের পক্ষে,' বলল ল্যারি। 'কিন্তু সত্যি বলছি, অতবড় একটা দলের বিরুদ্ধে তুমি একা কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

হু-হু হাওয়া বইছে। ধুলো উড়ছে রাস্তায়। বহুক্ষণ আগেই পেরিয়ে গেছে মাঝরাত। গোটা শহর ঘুমে অচেতন। স্যাডলে চেপে বনের উদ্দেশে রওনা হলাম আমি।

নিঝুম রাতে জোরাল শোনায় আমার ঘোড়ার পদশব্দ। শহরের শেষ দালানটা পেছনে রেখে পাহাড়ী এলাকায় ঢুকলাম। ট্রেইল এড়িয়ে গাছগাছালির ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। কয়েক মাইল যাওয়ার পর একটা নিরালা জায়গা দেখে স্যাডল থেকে নামলাম সেখানে। ঘোড়াটা বেঁধে রাখলাম একটা গাছের সাথে। তারপর বিছানা পেতে, বুটজোড়া খুলে বসে ক্লান্ত পা দুটো মালিশ করতে লাগলাম। ভাবতেই অবাক লাগছে আমার, মানুষের জীবন কী বিচিত্র, কত সহজে ওলটপালট হয়ে যায় সব কিছু।

তিন হপ্তা আগে আমি ছিলাম বিবাহিত। টুকটুকে রাঙা বউ আর আনকোরা সরঞ্জাম নিয়ে যাচ্ছিলাম পশ্চিমে– ডেরা বাঁধব। আর এখন, কিছুই নেই আমার, পেছনে লোক লেগেছে– আমাকে খুন করতে চায়।

স্যাডলে মাথা রেখে চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম আমি। পাইন পাতার ফাঁক দিয়ে তারা দেখা যায় একটা-দুটো। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম সেইদিকে। বাড়ির কথা মনে পড়ছে। ও'নীল, অ্যাঞ্জেল ওরা এই দুঃসময়ে কাছে থাকলে নিশ্চিন্ত বোধ করতাম। ওদেরকে পাশে পেলে যে-কোনও শত্রুকে অনায়াসে নরক অবধি ধাওয়া করতে পারি আমি।

ভোর। গোধূলির আলো ফুটতে শুরু করেছে পুব আকাশে। আমি তখনও ঘুমিয়ে, স্বপ্ন দেখছিলাম। শৈশবের সোনালী দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছি। সমবয়সী ছেলেপুলের সঙ্গে মিলে ঢিল মারছি মৌচাকে। মাকে দেখলাম। তাঁর

সেই আদি ও অকৃত্রিম দোলনা চেয়ারটিতে বসে আছেন। ঠোঁটের কোণে দুষ্টু হাসি, চোখে শাসন। আমাদের ওপর নজর রাখছেন মা। মাঠে কাজ করছি আমরা। ওই বয়সে আমার মনে হত, মা আসলে আমাদের মাঝে বাবাকে খোঁজেন। প্রায় বিশ বছর আগে পশ্চিমে নিরুদ্দেশ হয়েছেন তিনি। কার্সন, ব্রিজার, জো মীক, ইসাক রোজ আর জন ক্যালটারের সাথে সোনার খোঁজে গিয়েছেন।

হঠাৎ পাঁজরে বুটের গুঁতো খেয়ে স্বপ্ন ভেঙে গেল। চোখ মেলেই বুঝলাম অনেক দেরি হয়ে গেছে। তিনটে রাইফেলের নল তাকিয়ে আছে আমার পানে। ওগুলোর অন্ধকার গহ্বরে দয়া-মায়ার লেশমাত্র নেই।

সাত

আমার আয়ু শেষ, উপলব্ধি করলাম। পাল্টা আক্রমণের কোনও সুযোগ নেই, ধাক্কা মেরে হয়তো একটা রাইফেল একপাশে সরাতে পারব– কিন্তু বাকি দুজন লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না। তবু সাহস হারালাম না; যে-মানুষ সব হারিয়েছে তার আবার হারানোর ভয় কী!

স্থাণুর মত শুয়ে রইলাম আমি, তাকিয়ে আছি সম্ভাব্য আততায়ীদের দিকে, পলক পড়ছে না চোখের। বেচাল হলে চলবে না, মনে মনে বললাম, বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। জানি এখন উসকানিমূলক কিছু করার অর্থ নিজের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করা। একটুবাদে দুহাতের তালু জোড়বেঁধে মাথার তলায় রাখলাম আমি।

'বুক পকেটে সিগার আছে– ধরাই,' অনুরোধ জানালাম।

'খাও।' বক্তার বয়স বছর পঁচিশ হবে। পাঞ্জার। চওড়া কাঁধ। শক্ত-সমর্থ চেহারা। 'একটা কুত্তা তার শেষ ইচ্ছা পুরণ করবে, এতে আপত্তির কী আছে।'

'তোমার হাতে যন্ত্র আছে, তাই গাল দিচ্ছ। একজন বন্দীর সাথে মশকরা করা সহজ। এ-জন্যে সাহস লাগে না।'

রাগে যুবকের চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল, জবাব দিতে গিয়েও শেষ-মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। সাবধানে সিগার বের করলাম আমি, ধরিয়ে টানতে লাগলাম আয়েস করে। দেখলেই বোঝা যায়, এরা চৌকশ লোক– এবং সম্ভবত ভাল। কীভাবে পাড়ব কথাটা তাই ভাবছিলাম।

'তোমাদের ভালমানুষ বলেই মনে হচ্ছে,' শান্ত গলায় বললাম আমি। 'আমার স্ত্রীকে নিশ্চয়ই তোমরা খুন করোনি?'

চমকে উঠল লোকগুলো, চোয়াল ঝুলে পড়েছে। 'মানে? কী বলতে চাও...এখানে মেয়েছেলে খুনের কথা উঠছে কেন? কে খুন করেছে?'

'তোমাদের দলেরই কেউ একজন হবে,' বললাম আমি। 'আমার বউকে

মেরেছে, সঙ্গে মালপত্র ছিল, সেগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে। এখন ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার জন্যে আমাকেও মেরে ফেলতে চাইছ– তা হলেই তোমাদের সব দিক রক্ষা পায়।' ওদের চোখে চোখ রাখলাম আমি। 'তবে বাকি জীবন তোমরা নিজেদের বিবেকের কাছে দোষী হয়ে থাকবে।'

আমার মাথা লক্ষ্য করে সজোরে রাইফেলের কুঁদো হাঁকাল একজন, ঝট করে মাঝপথে আর একজন বাধা দিল ওকে। আমি বুঝলাম, ঠিক জায়গাতেই ঘা দিয়েছি, ওরা এখন সবটা শুনতে চাইবে।

'ব্যাপারটা কী খুলে বলো তো একটু?'

'কেন মিছে ন্যাকা সাজছ?' মনের সবটুকু গরল এক সঙ্গে ঢেলে দিলাম আমি। 'খুব ভালই জানো তোমরা কী বলছি আমি। আমার বিশ্বাস, আশপাশে একশো মাইলের ভেতর এমন একজন লোক পাওয়া যাবে না, যে একজন নারী হত্যাকারীকে ফাঁসি দিতে না চায়। একমাত্র তোমরাই হয়তো বাদ থাকবে।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ওরা। বুঝলাম প্রায় মুঠোয় এনে ফেলেছি ওদের। একদম অজানা এক তথ্য জানছে ওরা, তবে হাবভাবে মনে হলো সম্ভবত ওদের মনেও সন্দেহ জেগেছিল কিছু। আমার কথায় নিজেদের প্রশ্নের জবাব পাচ্ছে।

'আমার নাম ওরিন ওসমান,' বললাম। 'পশ্চিমের অনেক জায়গায় এই নামের একটা গুরুত্ব আছে। একটা খচ্চরটানা ওয়াগনে করে এখানে এসেছিলাম। সঙ্গে আমার স্ত্রী ছিল।

'মাত্র কয়েক মাস আগে বিয়ে হয়েছিল আমাদের। বলতে পারো, হানিমুনে বেরিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল এই অবসরে একটা বাথানের জায়গাও ক্লেইম করব। কিছু গরুও এনেছিলাম। বাকহেড মেসার মাথায় ওকে ওয়াগনে রেখে টনটো বেসিনে যাওয়ার পথ খুঁজতে বেরোই আমি।

'ব্ল্যাক মেসার ওপরে পেছন থেকে এক লোক গুলি করে আমাকে, আমি নদীতে পড়ে যাই।'

'দেখ, কোথায় লেগেছিল বুলেট।' আঙুল দিয়ে ক্ষতটা দেখালাম আমি। 'আয়ু ছিল, তাই বেঁচে গেছি। পরে ফিরে এসে দেখলাম আমার স্ত্রী, জিনিসপত্র সব হাওয়া। এমনকী ট্র্যাকগুলো পর্যন্ত মুছে ফেলা হয়েছে।'

শুয়ে শুয়ে ধূমপান করছি আমি, আবেগে ভেতরের সব জ্বালা বাঁধ-ভাঙা স্রোতের মত বেরিয়ে আসছে হুড়হুড় করে। ড্রুসিলা মারা যাওয়ার পর থেকে এই প্রথম মন খুলে কথা বলছি কারও সাথে। কীভাবে ওয়াগন আর খচ্চরগুলো আবিষ্কার করলাম, তারপর ড্রুসিলার লাশ– একটু-একটু করে সব জানালাম ওদের। ড্রুসিলার অবস্থা বলার সময়ে কষ্ট হচ্ছিল, তবু থামলাম না।

'আমাকে মারার জন্যে তোমাদেরকে যে নিয়োগ করেছে, সেই লোকই আমার স্ত্রীকে হত্যা করেছে। ওর খামচির দাগ আছে তার শরীরে...এখন নিশ্চয় ভয়ে মরে যাচ্ছে ওই লোক। আমাকে খতম না করে তার উপায় নেই, পাপ ফাঁস হয়ে যাবে।

'ও বোধ হয় কল্পনাও করেনি,' খোঁচা দিলাম আমি, 'আমার সাথে তোমাদের আদৌ কোনও কথা হবে। বাজি ধরে বলতে পারি, দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ ছিল।'

এইবার আমি ঠিক করলাম একটা ঝুঁকি নেব। ওদেরকে ভাবনায় ফেলে দিয়েছি, অজানা খবর জেনেছে ওরা, নিজেদের মনে যে-সব প্রশ্ন উঁকি দিয়েছিল সেগুলোর সাথে আমার বক্তব্য মেলাচ্ছে। উঠে বসলাম আমি, মাথায় হ্যাট চাপিয়ে হাত বাড়ালাম গান বেল্টের দিকে।

'হাত সরাও!' ফের মুখ খুলল সেই তাগড়া পাঞ্চার। কিন্তু আমি উপেক্ষা করলাম।

'মারো,' বললাম ওকে। 'তোমাদের বসের মতই হবে তোমরা এ আর বিচিত্র কী– ও একটা অমানুষ, মেয়েছেলে খুন করতেও বাধে না।'

খেপে উঠল পাঞ্চার, মুখ সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু শেষ অবধি আমার অনুমানই ঠিক বলে প্রমাণিত হলো। লোক চিনতে ভুল করিনি: এই ধরনের লোকজনের সাথে জীবনের বহু সময় কাটিয়েছি আমি। তাই জানি, এরা সবাই কঠিন লোক, শক্ত কাজ করতে করতে মনটাও রুক্ষ হয়ে গেছে– কিন্তু পচে যায়নি। স্নেহ-মমতা, মানবতাবোধ আজও অবশিষ্ট আছে সেখানে। গুলি করল না যুবক, গান বেল্ট নিয়ে কোমরে বাঁধলাম আমি, তারপর উঠে দাঁড়ালাম। হাতে একটা অস্ত্র পেয়ে আমার মনোবল শতগুণ বেড়ে গেল।

'মিথ্যে কথা বলে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে তোমাদের। অ্যাদ্দিন কিছু বলিনি, কারণ তোমরা আসল ঘটনা জানতে না। এ-বার জেনেছ, এরপরেও যদি লাগতে আসো– আমিও পাল্টা আঘাত করব।'

আমার কথা কানে ঢুকছিল না ওদের, ঝট করে ঘুরল একজন। 'তোমার স্ত্রী সম্পর্কে যা বললে তা কি সত্যি?'

'ওর কবরে স্মৃতিফলক লাগিয়েছি আমি। ভালমত খুঁজলে হয়তো ওয়াগনের ধ্বংসাবশেষও পেয়ে যাবে। তা ছাড়া আমার সঙ্গে গ্লোবে গেলেই জানতে পারবে সব কিছু– ওখানে অনেকেই দেখেছে আমাদের।'

'তুমি গ্লোবে ছিলে?'

'আমার স্ত্রী আর আমি, দুরাত ছিলাম ওখানে– আসছে রোববারে তিন হপ্তা পুরবে।'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকাল ওরা। আন্দাজ করলাম আমার কথায় লোকগুলো একটা কিছুর আঁচ পেয়েছে, তবে সেটা কী নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলাম না। তরুণ পাঞ্চার হঠাৎ তার রাইফেলটা মাটিতে দাঁড় করিয়ে হাত ঢোকাল পকেটে, সিগারেটের মসলা বের করল। 'তোমাদের কথা জানি না,' সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল সে, 'তবে আমি সম্ভবত টেক্সাসেই ফিরে যাব।'

চকিতে আর একটা চিন্তা আমার মাথায় এল। 'আচ্ছা, তোমরাও কি ওইসময়ে গ্লোবে ছিলে?'

'হ্যাঁ... পুরো দলটাই। দিন চারেক ছিলাম। বলতে কী, আরও কিছুদিন থাকার কথা ছিল– কিন্তু সোমবার সকালে হুট্ করে নির্দেশ এল রওনা হতে হবে– এক্ষুণি।'

চমকে উঠলাম। সে-দিন ভোরেই গ্লোব ত্যাগ করেছিলাম আমরা। হঠাৎ মনে পড়ল তিনজন অশ্বারোহীকে আমাদের ওয়্যাগনের পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখেছিলাম, ওদের একজন পেছন ফিরে তাকিয়েছিল ড্রুসিলার দিকে।

আমরা যখন রসদ কিনছিলাম, ওই লোকও তখন ছিল দোকানে। বহু চেষ্টা করেও ওর চেহারা মনে করতে পারলাম না আমি– কেবল এইটুকু খেয়াল আছে লোকটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট।

আমার পেটে ছুঁচো ডাকছিল। পশ্চিমে কোনও লোকই খালি পেটে বেশি দূর যায় না। অবশ্যি এমন নয় যে আমি কখনও অনাহারে থাকিনি, কিন্তু এ-মুহূর্তে রান্নার মাল-মসলা সাথে আছে, আর খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড। আগুনে কফির পানি চড়িয়ে বললাম, 'ইচ্ছে করলে তোমরাও বসতে পারো।'

আগুনের পাশে জোড়াসন হয়ে বসল ওরা। থলে হাতড়ে খানিকটা বেকন আর পাউরুটি বের করলাম আমি। তারপর নেহাত গোবেচারাটির মত মুখ করে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের দলের নাম কী?'

চট করে আড়চোখে একবার তাকিয়েই মুখ নিচু করল ওরা। আপনমনে হাসলাম আমি। এরা ঘটনাটাকে অনুমোদন করতে পারেনি, কিন্তু তাই বলে মালিকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তবে না বললেও কোনও ক্ষতি নেই, এবং আমার যেন মনে হলো ওরাও বুঝেছে সেটা। ঘোড়াগুলোর দিকে তাকালেই আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাব আমি– ওদের গায়ে বড় হরফে ইংরেজির 'এ' লেখা... লেযি এ।

নামটা পরিচিত ঠেকল। এ-পর্যন্ত বেশ কয়েক জায়গায় লেযি এ বাথানের গরু দেখেছি আমি। বিশেষ করে ক্যাম্প ভার্দে পরিত্যাগ করে যে-দিন প্রথম গ্লোবে এলাম, স্যালুনের হিচ রেইলে ওই মার্কার একটা ঘোড়া বাঁধা ছিল।

পশ্চিমের গরু ব্যবসায়ী মাত্রই চলার পথে কোনও গবাদি পশু চোখে পড়লে মার্কা দেখে। কারণ ব্যবসার চিন্তা তার মাথায় সর্বদা ঘোরাফেরা করে এবং মার্কা দেখা তার কাজের অন্যতম দায়িত্ব।

কফিতে চুমুক দিয়ে পাঞ্চারদের একজন আচমকা মুখ খুলল, 'তোমার কথা বিশ্বাস করার মত কোনও কারণ নেই আমাদের, শুধু কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে ব্যাপারটা। তোমাকে দেখে মন হয় না, তুমি কাউকে খুন করতে পারো। আমার মন বলছে, সত্যি কথাই বলছ তুমি।'

'আমার কেবল একটা আর্জি,' বললাম, 'আমার পথ আটকে দাঁড়িও না।'

'কেউ কেউ কিন্তু দাঁড়াবে।'

ওর কথায় মনে হলো গ্লোবের ঘটনা ওরা জানে না। কাজেই সেটা জানাব বলে ঠিক করলাম। 'একজন,' বললাম আমি, 'কাল রাতে গ্লোবে সে-চেষ্টা করেছিল।'

এরপর সংক্ষেপে ঘটনাটা খুলে বললাম ওদের। স্যালুনের বাইরে অন্ধকারে একজন ওত পেতেছিল, সে-কথাও উল্লেখ করলাম। সব শুনে একটুক্ষণ গুম মেরে বসে রইল ওরা, তারপর একজন বলল, 'বোধ হয় গ্যালি।'

'অ্যান্ডার্সন,' বলল সেই যুবক পাঞ্চার, 'কার্লি অ্যান্ডার্সন।'

'কদমছাঁট চুল, ন্যাড়া মাথাই বলা যায়।'

'জানি। সে-জন্যেই আমরা ওর নাম দিয়েছি কার্লি। হ্যাঁ, ও-ই হবে বোধ হয়—একটু উদ্ধত। ভ্রূতে হারিয়েছ?'

'মিস্টার,' বললাম আমি, 'যে যেমন, আমি তার সাথে ঠিক সে-রকম ব্যবহার করি। কার্লি অ্যানডার্সন আমাকে অ্যামবুশ করেছিল, কাজেই আমি ওর কায়দাতেই লড়েছি।'

হাত বাড়িয়ে পট তুলে নিলাম আমি, প্রথমে নিজে নিয়ে তারপর অন্যদের কাপও ভরে দিলাম আবার।

'অবশ্যি ও বোধ হয় ভেবেছিল নিয়মটা আমিই ঠিক করেছি। বলছিল আমি নাকি ওর বসকে মগলোনে অ্যামবুশ করার পাঁয়তারা করেছিলাম। যাক গে, যা হওয়ার তাতো হয়েই গেছে— আগুন নিয়ে খেললে হাত পুড়বে জানা কথা।'

যখন নাস্তাপর্ব চুকল, আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদায় নিল ওরা। একটুবাদে আমিও যাত্রা করলাম স্যাডলে চেপে। বেশিক্ষণ এক জায়গায় থাকা চলবে না, চোখ রাঙালাম নিজেকে। বিশেষত শত্রুপক্ষ যখন আমার উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে।

ড্রুসিলার কথা ভাবতে পারছি না আর। ওর চেহারাটা মনে পড়লেই ভয়াবহ শূন্যতা অনুভব করছি। এমন অনুভূতি আগে কোনও দিন হয়নি আমার।

তিন দিন পর। একটা পাহাড়ী চাতালে একাকী বসে আছি আমি। সিবে কিউ ক্রীক আর ক্যারিযো ক্রীকের মাঝে আড়াল তুলেছে এই পাহাড়। এখন প্রায় সন্ধ্যে, সকাল থেকেই ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে আবহাওয়া। ঘন ঘন বিজলী চমকাচ্ছে আকাশে। মেঘ ডাকছে গুরুগুরু। ঝড়ের পূর্বলক্ষণ, ঘোর কালো বনানী। ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হলো। উদাস মনে এই কদিনে আমার কাজের খতিয়ান নিচ্ছিলাম। নিঃসঙ্গ বিরহকাতর নেকড়ের মত গোটা এলাকা তোলপাড় করছি আমি। আশা আছে, এভাবেই লেগ্রি এ দলের ট্র্যাক পেয়ে যাব একদিন। এবং সেগুলো অনুসরণ করে পৌঁছে যাব ওদের আস্তানায়।

আমার মন ভাঙা, এখানকার দুরন্ত সুন্দর প্রকৃতিকে উপভোগ করতে পারছি না পুরোপুরি। ভয়াল সব পাহাড় দাঁত বের করে আছে এখানে সেখানে। বরফ জমেছে ইতিমধ্যে। ঝালরের মত জমাট তুষারকণা ঝোলে পাইন শাখায়। আসন্ন ঝড়বাদল আরও তুষারপাতের অশনি সঙ্কেত দিচ্ছে।

একটু-একটু করে হৃতশক্তি ফিরে পাচ্ছি আমি। ঘোড়ার যত্ন নিচ্ছি পাশাপাশি। প্রতিরাতে শোয়ার আগে মালিশ করি ওর গা, তারপর ঘেসো জমিতে ছেড়ে দেই। বেশিক্ষণ কোথাও থাকি না। এক জায়গায় আগুন ধরিয়ে

রান্না করে খাই, তারপর মাইল দুই-তিন দূরে গিয়ে কোনও ঝোপের ভেতর ক্যাম্প করি। ভেবেচিন্তে জায়গা বাছাই করছি আমি যেন কেউ আমার অবস্থান টের না পায়। আমার ট্র্যাক ঢাকার ব্যাপারে আমি সদাসচেতন। রোজ কৌশল বদলাচ্ছি, ফলে সহজে কেউ চিনতে পারবে না।

গত তিন দিনে বহু হর্স-ট্র্যাক চোখে পড়েছে আমার। এগোনোর সাথে সাথে ক্রমশ বাড়ছে ট্র্যাক। উপলব্ধি করছি প্রতিপক্ষের আস্তানা থেকে আমি খুব একটা দূরে নেই। লোকবল আছে আমার শত্রুর, প্রচুর বাড়তি ঘোড়াও আছে– কিন্তু আমি একা, ঘোড়াও মোটে একটা।

তবু আশা ছাড়িনি। রক্তে না হলেও, স্বভাবে আমি ইন্ডিয়ান: মাটি কামড়ে খুঁজছি শত্রুকে। সর্বদা তৈরি থাকে আমার অস্ত্র। লোকসংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলছি।

আর একটা দিন, তারপর ড্রুসিলার মৃত্যুর এক মাস পুরবে।

সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালাম চারপাশে। ঝড়ের মুখে এই চাতালে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু জায়গাটা অনেক উঁচুতে বলে বিশেষ মনঃপূত হয়নি।

দুর্গম এলাকায় যাদের নিয়মিত চলাফেরা, তারা সুযোগ পেলেই ক্যাম্পের জন্যে সম্ভাব্য জায়গা খোঁজে। ঠিক সেই মুহূর্তে ব্যবহার না করলেও পরে কখনও হয়তো-বা কাজে আসতে পারে। লোকালয় ছেড়ে মানুষ যখন বাইরে যায় নিজের অজ্ঞাতসারেই এই সন্ধান চালায় সে।

আমি এখন যেখানে বসে তার মাথায় একটা বিরাট পাথর হেলে পড়ে ছাত দিয়েছে। চাতালের সামনে ঘন জংলা ঝোপ। আরও দুটো চাঁই বসিয়ে জায়গাটাকে রীতিমত দুর্গ বানিয়ে ফেলেছি আমি। ঘোড়াটা আঁটেনি এখানে, একটা ঝোপের ভেতর বাঁধা আছে। হঠাৎ করে কারও চোখে পড়বে না।

পাহাড়ের নীচে এবড়োখেবড়ো প্রান্তর, ক্যারিযো ক্যানিয়নের মাঝে হারিয়ে গেছে। ওইদিকে তাকালাম। আচমকা একটা আবছা মূর্তি চোখে পড়ল। ঘোড়ার রাশ টেনে বসে আছে স্যাডলে, সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক– যেন পথ হারিয়ে ফেলেছে।

নিমেষে ব্যাপার বুঝে ফেললাম আমি। সিবে কিউ ভেবে এই ক্যানিয়নে ঢুকে পড়েছে লোকটা। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। দুটো ক্যানিয়নই দেখতে প্রায় এক রকম। ঢোকার রাস্তাও কাছাকাছি– মাত্র মাইল দুয়েকের ব্যবধান। সিবে কিউর একটা শাখা আবার ক্যারিযোর দুশো গজের ভেতর শুরু হয়েছে। ফলে একজন বাইরের লোক একটুতেই তালগোল হারিয়ে ফেলা অস্বাভাবিক নয়।

শঙ্কিত বোধ করলাম। লোকটা বিপদে পড়তে যাচ্ছে। কিছু দূর পাশাপাশি যাওয়ার পর ক্যানিয়ন দুটো নানান গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে দুদিকে বেঁকে গেছে। সুতরাং, ওই অশ্বারোহী... না, আরোহিণী– এখন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ঘোড়সওয়ারটি আসলে মহিলা, পুরুষ নয়– যত এগোবে, ততই সরে যাবে নিজের গন্তব্য থেকে।

সহসা বিজলি চমকাল, বাজ পড়ল বিকট গর্জনে, ভয় পেয়ে পেছনের দুই পায়ে সোজা হলো ঘোড়াটা। তারপর শুরু হলো বৃষ্টি, মুষলধারে। পাহাড়ের নীচে হারিয়ে গেল ঘোড়সওয়ার, উর্ধ্বশ্বাসে লেজ গুটিয়ে ছুটছে ওর ঘোড়া। প্রমাদ গুনলাম আমি; এই ভাঙাচোরা প্রান্তরে যেখানে হাঁটাই দায়, ঘোড়ার পাগলামিতে যে-কোনও মুহূর্তে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

বৃষ্টির ঘন পর্দায় চারদিক আচ্ছন্ন সাদা উজ্জ্বল ইস্পাতের মত চকচক করছে। পাহাড়ের ঢাল, পাইন বনের অন্ধকার সব ঢাকা পড়েছে ওই পর্দার আড়ালে। চাতালের ছাতের ওপর অবিশ্রাম বৃষ্টিপাতের শব্দ।

মেয়েটার অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার মন কেঁদে উঠল। খটখটে শুকনো জায়গায় দিব্যি আরামে বসে আছি আমি। আর মেয়েমানুষ হয়েও নীচের ওই ঘোড়সওয়ার প্রতিকূল প্রকৃতির সাথে লড়ছে। শুধু শক্তভাবে স্যাডলে বসে থাকলেই হবে না, ঘোড়াটাও অক্ষত থাকা চাই– তবেই হয়তো এ-যাত্রা পার পেয়ে যাবে ও।

অধৈর্য হয়ে উঠলাম আমি। অনেকক্ষণ হলো ওর দেখা নেই। এই হারে বৃষ্টি হলে আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘোড়ার পেটসমান পানি দাঁড়িয়ে যাবে ক্যানিয়নে। সজ্ঞানে তখন কেউ ওখানে থাকলে হয়তো বাঁচতে পারবে; কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায়...

কথাটা ভাবতেই শিউরে উঠলাম আমি, মেয়েটাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে গেলাম। একই সাথে গাল দিচ্ছি নিজেকে, শত্রু এলাকায় এ ধরনের ঝুঁকি নেয়া বোকামি হচ্ছে।

জিন চাপালাম ঘোড়ার পিঠে। আহত দৃষ্টিতে তাকাল অ্যাপালুসা। পরিশ্রান্ত শরীরে বিপদের মুখে যেতে চাইছে না। ক্লান্ত আমি নিজেও। আমার ইচ্ছা ছিল আরও দুদিন কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠব। এতে করে দুভাবে লাভবান হতাম আমি: লড়াই করার শক্তি ফিরে আসত, তেমনি আমার হদিস না পেয়ে বাড়ত শত্রুর উদ্বেগ।

মেয়েটাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করলাম। ক্যানিয়নের ভেতর দিকে খানিকটা যেতেই চোখে পড়ল কতগুলো পাথরের মাঝখানে পড়ে আছে ও। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ, দীর্ঘ কালো চুল বালিতে লুটাচ্ছে, শরীর ঠাণ্ডা।

ওর ঘোড়াটা পঞ্চাশ গজ দূরে তিন ঠ্যাঙে দাঁড়িয়েছিল, পেটের কাছে ঝুলছে স্যাডল। প্রথমে ওর কাছে গেলাম আমি। একটা পা অকেজো হয়ে গেছে। ভাঙেনি তবে চোট পেয়েছে, অন্তত বেশ কিছুদিনের জন্যে দূরের যাত্রায় অংশ নিতে পারবে না।

ঘোড়াটাকে তার মনিবের কাছে নিয়ে এলাম আমি, তারপর মেয়েটাকে পাঁজাকোলা করে আমার নিজের ঘোড়ায় চাপিয়ে ফিরে এলাম চাতালে।

আগুন তখনও জ্বলছিল, আরও কিছু ডালপালা গুঁজে দিলাম তাতে। তারপর ওকে আগুনের পাশে শুইয়ে দিলাম। একজোড়া গভীর কালো চোখ মেলে আমার

দিকে তাকাল মেয়েটা। বলল, 'ধন্যবাদ, মি. ওসমান। আমার ভয় হচ্ছিল, তোমার দেখা বুঝি আর পেলাম না।'

আট

থ হয়ে গেলাম। মেয়েদের সঙ্গে চলতে আমি অভ্যস্ত নই। বলা যায়, আনাড়ি। আমাদের টেনেসির পাহাড়ে সবাই যখন নাচের আসরে যোগ দিত, আমি তখন বসে থাকতাম কতক্ষণে শিকার কিংবা লড়াই শুরু হবে সেই আশায়। এ-ব্যাপারে বরং অ্যাঞ্জেলই পটু। নাচে, গানে, কথায় মাতিয়ে রাখতে পারে সবাইকে।

'বুঝলাম না, ম্যাম? আমাকে চিনলে কীভাবে?'

আগুনের পাশে চিত হয়ে শুয়েছিল ও, হাই তুলে দুহাত মাথার ওপর উঠিয়ে আড়মোড়া ভাঙল। রেখায়িত হয়ে উঠল ওর দেহযৌবনের প্রতিটি বাঁক, পুরুষ্টু দুই স্তন স্কার্ট ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। চোখ সরিয়ে নিলাম আমি, ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠছি, আপনমনে মিনতি করলাম এখনই যেন উঠে বসে ও। কিন্তু সে-রকম কোনও লক্ষণ দেখা গেল না যুবতীর মাঝে।

'কী লম্বা তুমি!' বলল মেয়েটা। 'গায়ে কত শক্তি! আমাকে এমনভাবে তুললে যেন আমি একটা দুধের শিশু!' খিলখিল করে হেসে খুন হলো ও।

আমার কপালে ভাঁজ পড়ল। ওর হাবভাব কিছুই বুঝতে পারছি না। 'দেখ,' বললাম আমি, 'আমার পক্ষে কোনও মেয়ের ভার নেয়া সম্ভব নয়। আমি একা মানুষ, কোথায় কখন থাকি তার নেই ঠিক– ঝড় থামলেই তুমি তোমার মায়ের কাছে চলে যেও।'

'নেই।' ডাগর কালো চোখজোড়া আরও ডাগর হলো। 'তুমি যেভাবে এগোচ্ছ তাতে বাবাও থাকবে না,' বলে চোখ টিপল।

মুহূর্তে সতর্ক হয়ে গেলাম আমি। আগুন নিয়ে খেলছি। মেয়েটার ঘোড়ার গায়ে কোনও মার্কা না থাকায় এতক্ষণ বুঝতে পারিনি ওর পরিচয়।

'আমার খোঁজ পেলে কী করে?'

উঠে বসল সুন্দরী, একটু ঝুঁকে মুখখানা রাখল এক হাঁটুর ওপর। লো-কাট স্কার্ট, উন্মুক্ত বুকের অনেকটা বেরিয়ে পড়ল। দুই পাহাড়ের মাঝে গভীর গিরিখাত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। 'এমনি, জাস্ট ঘুরতে ঘুরতে।'

ওর কথা একবর্ণ বিশ্বাস হলো না আমার, উঠে খাওয়ার জোগাড়ে গেলাম। বৃষ্টিতে ধোঁয়ার গন্ধ পাবে না কেউ, তা ছাড়া এখনও বোধ হয় কারও আসার সময় হয়নি। তবু একটা চোখ খোলা রাখলাম আমি, এই দুর্যোগে মেয়েটা একা বেরিয়েছে মেনে নিতে বাধছে আমার। তবে ঝড়বাদলে সব ট্র্যাক ধুয়ে যাবে, আমি আবার চলতে শুরু না করা পর্যন্ত আমার নাগাল পাবে না শত্রুপক্ষ। কিংবা

মেয়েটার হাঁকডাকের অপেক্ষায় থাকতে হবে ওদের।

রান্নায় ব্যস্ত আমি, কিন্তু ভাবছি রহস্যময়ীর কথা। এখন আমি যেখানে রয়েছি, মগলোন পর্বতমালার এই অঞ্চলটা ভয়ানক দুর্গম। চারদিকে রুক্ষ প্রান্তর আর পাথরচাঁই। এমন জায়গায় এ-মেয়ে বেমানান। ওর শরীর তুলতুলে, গা-হাতের চামড়া নরম। এতটুকু পরিশ্রমের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। ঘোড়ায় চড়তে পারে, কিন্তু দেখে মনে হয় না যে পশ্চিমের মেয়ে। কিংবা হলেও, বহুদিন ছিল না এ-দিকে। এমন একটা মেয়ে এই অসময়ে এ-রকম জায়গায় আসার অর্থ টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ওকে। এ-মুহূর্তে কাকে ধরতে চাইছে সবাই? হ্যাঁ, আমাকে।

অতএব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপদ বিদায় করতে হবে। কিন্তু ঝড়বৃষ্টির মধ্যে তাড়িয়ে দিই কী করে? যতই ভাবছি অস্বস্তি বাড়ছে আমার। মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাচ্ছি ওর দিকে। অচেনা একজন লোকের সাথে নির্জন এলাকায় রয়েছে, অথচ একটুও বিকার নেই। যুবতী মেয়ে, বড়জোর সতেরো-আঠারো বছর বয়স, চোখদুটো বুদ্ধিদীপ্ত। হঠাৎ কাঁটা দিয়ে উঠল আমার গায়ে। আমাকে খুন করার জন্যে লোক লাগিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি ওরা– এখন ফাঁসিতে ঝোলানোর ব্যবস্থা করছে।

অল্পক্ষণের ভেতর কফি তৈরি আর দুটো ভেনিসন স্টীক ঝলসানো হয়ে গেল। খেতে খেতে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করলাম।

রাত নামছে। ভুল হয়ে থাকতে পারে আমার অনুমানে, কিন্তু ঝুঁকি নেওয়া চলবে না। মালপত্র গুছিয়ে তুলে নিলাম আমি। সোজা হয়ে বসল মেয়েটা। চোখে নিখাদ বিস্ময়।

'কী করছ?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আমার ঘোড়ার কাছে রেখে আসব,' বললাম। 'না হলে সকালে কাজের প্রচুর ক্ষতি হয়– দেরি হয়ে যায়। তাই আমি মালপত্র সব সময় গুছিয়ে রাখি।'

গাছতলায় গিয়ে পেছন ফিরলাম মেয়েটার দিকে। অন্ধকার থাকায় ও দেখতে পেল না ওর সাধের শিকার কী করছে। ধীরে-সুস্থে স্যাডল চাপালাম ঘোড়ার পিঠে, তারপর খাবারের থলেটা বেঁধে নিজেও উঠে বসলাম।

মন্থর গতিতে চাতালের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। কাছাকাছি গিয়ে ডাকলাম, 'ম্যাম, তুমি–'

'আমার নাম লোরনা,' বিরক্তি ফুটল ওর কণ্ঠে।

'বেশ, তাই হলো, ম্যাম।' নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখছি। 'আমি চলে যাচ্ছি। যদি কিছুক্ষণের ভেতর ফিরে না আসি, তুমি ওই ক্রীক ধরে চলে যেও।' তর্জনীর ইশারায় সিবে কিউ ক্রীকটা দেখালাম ওকে। 'তা হলেই বেরোতে পারবে এখান থেকে।'

'মি. ওসমান'– মুখখানা করুণ করে আর একটু হলেই আমাকে পটিয়ে ফেলেছিল লোরনা– 'আমার ভয় করছে। তুমি থাকো না!'

পা নাচালাম স্যাডলে বসে। 'ম্যাম,' বললাম, 'মাঝরাতে যদি ভয় পাও, সাহায্যের জন্যে চিৎকার করো তা হলেই তোমার বন্ধুরা ছুটে আসবে। আমি নিশ্চিত, এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে ওরা।'

মুচকি হাসলাম। 'মিস লোরনা, চিৎকার করো কিন্তু। বাজি ধরতে পারি, ওরা এসে তোমাকে একা দেখে অবাক হয়ে যাবে।'

কথা শেষ করেই অ্যাপালুসার পেটে স্পারের গুঁতো মারলাম আমি। সাবধানে ট্রেইল বেয়ে নেমে গেলাম সিবে কিউতে। তারপর পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছে, তুফান বেগে ছুটে চললাম আরও বন্ধুর এলাকার পানে।

ভোরের সামান্য আগে পছন্দসই একটা জায়গায় ক্যাম্প করলাম আমি। অদূরে একটা ঝরনা। আশপাশে অজস্র ছড়ানো ছিটানো পাথর, গাছ। পেছনে প্রায় একহাজার ফুট উঁচু টনটো রিম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে জরিপ করে আশ্বস্ত হলাম, বহুকাল এখানে কখনও মানুষের পা পড়েনি।

ওদের মতলব পরিষ্কার বুঝতে পারছি। লোরনা হয়তো বাস্তবিক পড়ে গিয়েছিল, তবে ওরাও চাইছিল মেয়েটা যেন আমার সাথেই থাকে। রাতে 'রেপ-রেপ' বলে তারস্বরে চিৎকার জুড়ত লোরনা, এবং ওরা এসে আমাদের দুজনকে এক সঙ্গে আবিষ্কার করত। বিন্দুমাত্র ওজর-আপত্তি টিকত না আমার, ঘটনাস্থলেই ফাঁসিতে লটকে দিত। তারপর নানান কুৎসা রটিয়ে খণ্ডন করার চেষ্টা করতে আমার অভিযোগ। অথবা ওরাই হয়তো উলটো অভিযোগ করত যে, আমি নিজেই আমার স্ত্রীকে হত্যা করে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছি। বস্তুত এ-জন্যেই আমার উদ্দেশ্য আগাম টের পেতে দেইনি, স্যাডলে উঠে তারপর বলেছি সব কিছু। লোরনা তখন চেঁচালেও ফায়দা হত না– ঘোড়ার পিঠে বসে ওকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছিলাম আমি, এই দাবি টিকত না ধোপে।

ঠিক করলাম আগামী তিনটে দিন ওখানেই কাটাব। এখন থেকে ভেবেচিন্তে, রয়ে-সয়ে এগোতে হবে আমাকে, সুতরাং কোথাও একটু বসে পরিস্থিতি বিচার করা দরকার।

শত্রুপক্ষের চোখে ধুলো দিতে পেরেছি এটাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম আমি, অথচ বাস্তবে তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। ওরা ঠিকই জানত আমি কোথায় আছি, এবং সেভাবেই টোপ ফেলেছিল মেয়েটার সাহায্যে। এখন কেবল আমাকে খুন করাই যথেষ্ট নয়– ড্রুসিলা হত্যা সম্পর্কে যে-কাহিনি লোকজনকে আমি বলেছি সেটাও মুছে ফেলতে হবে ওদের।

কিন্তু আমার হদিস পেল কেমন করে?

নিশ্চয়ই প্রতিটা ট্রেইলের ওপর নজর রাখছে ওরা। ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী যেমন হেলিওগ্রাফ ব্যবহার করত, সম্ভবত ওই ধরনের কোনও সঙ্কেত আদানপ্রদানের ব্যবস্থাও আছে। ফলে আমি যেখানেই যাচ্ছি ওদের চোখ এড়াতে পারছি না।

হঠাৎ চমকে উঠলাম আমি। তার মানে এখানকার অবস্থানও জানে

শত্রুপক্ষ... হয়তো এই মুহূর্তে এগিয়ে আসছে চারদিক থেকে– ঘেরাও করবে আমাকে।

কথাটা মনে হতেই আমার ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল। রাইফেল আর বাড়তি কার্তুজের থলেটা নিয়ে হাঁটা দিলাম অ্যাপালুসার উদ্দেশে। ঘেসো জমিতে পৌঁছে আর এক দফা বিষম খেলাম। ঘোড়া নেই!

দ্রুত ঝরনার কাছে ফিরে এলাম আমি। কম্বল পাতাই ছিল। বইতে পারব এই পরিমাণ কফি আর খাবার জড়ো করলাম কম্বলটার ওপর, পনচো দিয়ে ঢেকে পোঁটলা বেঁধে ঝুলিয়ে নিলাম পিঠে, তারপর ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলাম।

ওদের মতলব কী? আমার ঘোড়া বেদখল করেছে, তবু অপেক্ষা করছে কেন? সম্ভবত ওদের বসের জন্যে, ভাবলাম আমি, নিজের চোখে আমার মৃত্যু দেখতে চায় সে।

একটা গাছের সাথে সেঁটে জরিপ করলাম চারদিক। পেছনে ক্যানিয়ন: ঝোপঝাড়ে ভর্তি, খাড়া উঠে গেছে পাহাড়ের মাথায়। সামনে, এবং আশপাশে, বিক্ষিপ্ত গাছপালা: নীরব নিথর। এমন জায়গায় পাখির কলকাকলি নেই, ব্যাপারটা কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকল।

সমস্ত সত্তা দিয়ে বুঝতে পারছি ধারেকাছেই লুকিয়ে আছে ওরা। জানে আমি কোণঠাসা হয়ে পড়েছি। এইবার জাল গুটিয়ে আনবে ধীরে ধীরে যাতে আর পালাতে না পারি। সামনে এগোলে সোজা বিপক্ষের খপ্পরে গিয়ে পড়ব: কিন্তু যদি পেছনে যাই, আগাছাপূর্ণ ক্যানিয়নের ওপরে?

পরক্ষণেই উপলব্ধি করলাম আসলে আমাকে নিয়ে কৌতুক করছে ওরা। আর এক দল অপেক্ষা করছে ওখানে।

ভয়ে গা শিরশির করে উঠল। এই মুহূর্তে মরতে চাই না আমি... অন্তত ড্রুসিলার খুনীকে শাস্তি না দেয়া পর্যন্ত নয়।

অথচ দুটোর একটা পথ বেছে নিতে হবে। ঢাল বেয়ে জঙ্গলে নেমে যাওয়ার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু; ওপরে গেলেও হয়তো তাই ঘটবে। একটুক্ষণ ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম ওপরেই যাব।

ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ভূতের মত নিঃসাড়ে রওনা হলাম আমি। এখন কেউ দেখতে পাবে না আমাকে, জঙ্গলে আমি ইন্ডিয়ানদের মতই স্বচ্ছন্দ।

ক্যানিয়নের মুখ থেকে চড়াইয়ের শুরু। আসলে এটা একটা শাখা ক্যানিয়ন। এককালে মগলোন রিম থেকে ঝরনাধারা নেমে আসত এই পথে। এখন সে-খাত মরে গেছে, কিন্তু দীর্ঘদিন একনাগাড়ে প্রবল বেগে পানি পড়ার ফলে পাহাড়ের মাটি সরে গিয়ে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে ক্যানিয়ন। প্রায় দুহাজার ফুট দীর্ঘ।

দুপাশের দেয়ালে পাইনের সারি, ওগুলোর ফাঁকে-ফোকরে জংলা ঝোপ আর ঝড়ে উপড়ে-পড়া গাছ। রীতিমত হিমশিম খাচ্ছি এগোতে, মাঝে মাঝে হামাগুড়ি দিতে হচ্ছে। নীচে থেকে একটা হাঁক ভেসে এল, বোধ হয় সঙ্কেত

জানাল ওপরের কাউকে। একটুবাদে আমার ডানে আর একটা ডাক শুনতে পেলাম। তবে এটাও নীচে থেকে এসেছে।

আচমকা মনে হলো ওপরে না গেলেও চলে– ইচ্ছে করলে ক্যানিয়ন ধরেই এগোতে পারি। গাছপালা ছাড়াও ইতস্তত ছড়ানো পাথর রয়েছে ওখানে। হিংস্র জীবজন্তু বসবাসের উপযোগী, মানুষ থাকতে পারবে না।

হঠাৎ কাঁটা ঝোপে বেধে আমার শার্ট ছিঁড়ে গেল। দাঁড়িয়ে পড়লাম, ঘামছি, কান খাড়া। নীরব নিথর পরিবেশ, কিন্তু ঠিকই অনুভব করছি কাছেই কোথাও আছে ওরা। দিক্ বদল করে বাঁয়ে রওনা হলাম আমি।

আমার সামনে পেছনে খাড়া ঢাল। প্রতিটা কদম সাবধানে ফেলতে হবে, এবং প্রতিপদেই রয়েছে ভয়ঙ্কর বাধা-বিপত্তি। মনে হচ্ছে ওরা আমাকে ধরেই ফেলবে শেষ-পর্যন্ত। হয়তো দু-চারজনকে খতম করতে পারব, কিন্তু আমার জয়লাভের সম্ভাবনা খুব কম।

এক হাতে একটা বিশাল চাঁই ধরে ওঠার চেষ্টা করছি, হঠাৎ পায়ের নীচে মাটি সরে গেল। চট করে একটা বুনো আগাছা আঁকড়ে ধরলাম, দেহের ভারে উপড়ে আসছে গাছ, মনে হলো এ-যাত্রা আর রক্ষা পাব না, আমার ভবলীলা বুঝি শেষ হতে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি দোল খেয়ে এগিয়ে গেলাম সামনে– নতুন করে আঁকড়ে ধরলাম চাঁইটা।

মোটামুটি অসমান দেয়াল, আবার কোনও কোনও জায়গায় মসৃণ, খাড়া– একবার হাত ফসকালে পাঁচ-ছশো ফুট নীচে গিয়ে পড়ব। প্রায় সবখানেই ছুঁচোলো পাথর, ভাঙা গাছ রয়েছে। একবার নীচে তাকিয়েই বোঁ করে ঘুরে উঠল আমার মাথা– ওগুলোর ওপর পড়লে কী অবস্থা হবে ভাবতেই কাঁটা দিল গায়ে।

সুযোগ পেলে একটু থেমে জিরিয়ে নিচ্ছি, দম-হারা ঘোড়ার মত হাঁফাচ্ছি জিভ বের করে। ঘামে জবজব করছে শার্ট। সূর্যাস্তের সময় হয়ে আসছে, আসন্ন রাতকেই আমার ভয় বেশি। এতক্ষণে ওরা বোধ হয় আঁচ করেছে, আমি দেয়াল ধরে এগোচ্ছি, কিংবা ভাবছে ক্যানিয়নেরই কোথাও ক্যাম্প করেছি।

এখন আমার সামনে রয়েছে একফালি ন্যাড়া জমি, পাথর ধসে সমান হয়ে গেছে। ওটা পেরোনোর সময় রীতিমত কসরত করতে হবে, সব কিছু নির্ভর করবে আমার এই আহত হাতদুটোর ওপর। ঢালটা অতিক্রম করতে পারলে তবেই হয়তো বসার জায়গা মিলবে। ওই স্বল্প জায়গাটুকু পার হওয়ার সময়ে একদম খোলামেলা হয়ে যাব আমি, বিন্দুমাত্র আড়াল থাকবে না।

একটা পাতলা স্লিংয়ের সাহায্যে রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছি। কুঁদো ওপরে, ব্যারেল ডান হাতের কাছে। খুউব সাবধানে এক পা বাড়িয়ে চাপ দিলাম। মজবুত পাথর। এটা অনেকটা পাথরের ওপর দিয়ে ঝরনা পার হওয়ার মত ব্যাপার, তবে এ-ক্ষেত্রে পাথর যদি একবার সরে যায়– আমি কয়েকশো ফুট নীচে গিয়ে পড়ব।

কাঁপছি। দুবার পায়ের চাপে নড়ে উঠল পাথর, সময় থাকতেই সরে

গেলাম ওখান থেকে।

যখন প্রায় চলে এসেছি উল্টো দিকে, আচমকা আমার কাছেই বিকট শব্দে আছড়ে পড়ল একটা বুলেট। নিজের অজান্তে মাথা নিচু করলাম আমি, এবং পা পিছলে গেল।

দুহাতে ভর রেখে পতন রোধ করছি নিজের। দেখলাম, প্রায় তিনশো গজ নীচে আমার দিকে রাইফেল তাক করছে এক লোক। এমনিতে এত অল্প দূরত্বে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না; তবে আশার কথা, আলো কমে এসেছে- নিশানা করা সহজ হবে না ওর জন্যে।

একটা পা পেছনে গুটিয়ে কোমরের কাছে নিয়ে এলাম, অন্য পায়ের গোড়ালিটা রাখলাম একটা ফাটলের ওপর, তারপর বাঁ হাতে রাইফেলের নল ধরে উঁচু করলাম একটু, ডান হাত চলে গেল ট্রিগারে।

ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। পূর্ণ আলোয়। আগুনের ঝলক দেখলাম ওর মাযলে, প্রায় একই সাথে মৃদু ঝাঁকুনি খেল আমার রাইফেলটা। হঠাৎ দুই হাত শূন্যে তুলে খাবি খেলো ও, রাইফেল খসে পড়ল হাত থেকে। তারপর ধরাশায়ী হলো। আমাদের দুটো গুলির আওয়াজ মিলিয়ে গেল পাহাড়ে পাহাড়ে গুমগুম প্রতিধ্বনি তুলে। তারপর আবার শান্ত হয়ে এল পরিবেশ।

নড়ছে না ও। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। আমি অনড় হয়ে দেখছি ওকে। আমার পয়লা শিকার। এ-বার ওরা টের পাবে এটা নিছক খেলা নয়।

হাতিয়ার হিসেবে চট করে আগ্নেয়াস্ত্র বেছে নেওয়া বোকামি। জানা কথা, একপক্ষ আহত হবে- এমনকী মারাও যেতে পারে। মজার ব্যাপার, সকলেই ভাবে ওই দুর্ভাগ্য অন্য কারও কপালে জটবে- অথচ আমরা সকলেই মরণশীল। কারও রেহাই নেই এর কবল থেকে। আগুন নিয়ে খেললে তার সাজা ভোগ করতেই হয়, এবং অনেক সময় এর পরিণাম হয় বড় ভয়ঙ্কর, চরম।

ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে এসেছি আমি। এখনও কেউ আসেনি ওর কাছে- তবে আসবে। ওদের অনেকেই ওর মাঝে নিজেদের পরিণতি দেখতে পাবে স্পষ্ট।

ঠিক সন্ধ্যের মুখে একটা পশু চলাচলের ট্রেইল চোখে পড়ল। বড়জোর তিন-চার ইঞ্চি চওড়া, একটা সুগভীর খাদের কিনার দিয়ে চলে গেছে। ওটা দেখে বেড়ে গেল আমার চলার গতি, এগিয়ে গেলাম সোজা, তারপর যখন নীচের দিকে বাঁক নিল, সরে গেলাম ট্রেইল থেকে।

রাতে একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে ক্যাম্প করলাম আমি। আগুন জ্বালাতে সাহস হলো না। একখণ্ড শুকনো বেকন আর একটা রুটি খেয়ে, কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লাম মাটিতে। শীত করছিল, গায়ের ওপর কম্বলটা টেনে দিলাম ভাল করে।

কাল সকালে যখন আমার ঘুম ভাঙবে, শুরু হবে নতুন খেলা।

নয়

এল প্যাসো। আংকল বেন ডয়েলের স্যালুনে পোকার খেলা চলছে। শান্ত রাত, খদ্দের বিশেষ নেই। স্টেজ এসেই চলে গেছে আবার। আড্ডাবাজ তরুণরাও নেই, শুয়ে পড়েছে। রাস্তার ওধার থেকে ভেসে আসছে হালকা পিয়ানোর সুর।

স্যালুনে উপস্থিত কেউই অচেনা আগন্তুক নয়। যে-ড্রামবাদক মাত্র ভেতরে ঢুকে তার সুটকেস নামিয়ে রাখল তাকেও অচেনা বলা যাবে না... এর আগেও এল প্যাসোতে এসেছে সে।

কোণের টেবিলে বসে যে-লোকটা পোকার খেলছে সেও নবাগত নয়। ওর গায়ের রং রোদে-পোড়া তামাটে। স্বাস্থ্যবান। নাকের নীচে মোটা গোঁফ, গালের একপাশে তিনটে কাটা দাগ আজ তিন দিন হলো এল প্যাসোতে আছে ও। এই শহরে যেভাবে লোক যাওয়া-আসা করে তাতে এই কদিনে পুরোপুরি একজন বাসিন্দা হয়ে গেছে।

লোকটি গম্ভীর প্রকৃতির, কথা বলে না বিশেষ। তাই কেউ জানে না, ও কোথেকে এসেছে বা কোথায় যাবে। খচ্চরে চেপে শহরে এসেছে সে, মানুষের কৌতূহল উদ্রেকের জন্যে ওইটুকুই যথেষ্ট। ওর একজন সঙ্গী রয়েছে। লম্বা চোয়াল, হলুদ চোখ। দুই কানে বড় বড় দুটো সোনার দুল। এই মুহূর্তে আংকল বেনের দেয়াল ঘড়িটা মেরামত করছে ও।

এতক্ষণ নীরব ছিল ঘরটা। এক গ্লাস হুইস্কি খেয়ে ড্রামবাদকই সবার আগে মুখ খুলল।

'মগলোনসে নরক ভেঙে পড়তে যাচ্ছে,' বলল সে। 'লেযি এ দলের চল্লিশজন লোক তাড়া করছে এক লোককে। পাহাড়ের নীচে কোণঠাসা করে ফেলেছে ওকে– মারা পড়ল বলে।'

'ভাল দল,' মন্তব্য করল আংকল বেন। 'চিনি আমি।'

'চেনো?' ঠোঁট বাঁকাল ড্রামবাদক। 'পুরোনো লোকেরা সবাই কাজ ছেড়ে দিয়েছে, এখন ওরা পিস্তলবাজ আর ভাড়াটে খুনীদের কাঁধে ভর করেছে। তবে ওই লোক একা হলে কী হবে, ঘোল খাইয়ে ছাড়ছে সবাইকে।'

'ব্যাপার কী? হঠাৎ এমন হলো কেন?'

'ওসমান দাবি করছে, তার বউকে লেযি এ দলের কে একজন নাকি খুন করেছে। ও কসম খেয়েছে খুনীকে বের করবে খুঁজে। ও–'

তামাটে-বরন লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল। 'কী নাম বললে– ওসমান?'

ওর দিকে চেয়ে ওপরে-নীচে মাথা ঝাঁকাল ড্রামবাদক। 'হ্যাঁ। শুনেছি ওর নাম ওরিন ওসমান, মোরার পিস্তলবাজের ভাই।'

প্রশ্নকর্তা এ-বার তার চিপগুলো টেবিলের মাঝখানে ঠেলে দিল। 'ভাঙিয়ে

দাও,' বলল সে, 'আমি চলে যাচ্ছি।'

'দেখ,' আপত্তি জানাল একজন জুয়াড়ি, 'তুমি জিতছ, এই অবস্থায় যেতে পারবে না।'

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল লোকটা। 'আমি যাচ্ছি। তোমার যদি টাকার মায়া থাকে, অ্যারিযোনায় আসতে পারো।'

টিংকার দুহাতে ঘড়িটা তুলে বারে নিয়ে গেল। 'এই যে, মি. ডওয়েল। ঘড়িটা আপাতত রেখে দাও। আমি এ-পথেই ফিরব, তখন ঠিক করে দেব।'

ওরা বিদায় নিলে নীরবতা নামল বারে। একটুবাদে একজন প্রশ্ন করল, 'মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। হঠাৎ এমন হলো কেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ড্রামবাদককে দেখাল বেন ডওয়েল। 'ও বলছিল একজন ওসমান বিপদে পড়েছে। ওই লোক ক্রিস ওসমান, অন্যজন ক্রিসের সঙ্গী, টিংকার।'

'তো?'

'লেযি এ-কে এখন আরও লোক ভাড়া করতে হবে– চল্লিশজনে কুলোবে না।'

টিলার ওপর থেমে গেল মেষপালক। ভেড়ার পালটাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। মিনিট দুয়েক নিজের কুকুরগুলোর গতিবিধি লক্ষ করল সে, তারপর পশ্চিমে তাকাল। শেষ-সূর্যের আলোয় গৈরিক পাহাড়গুলো আরও লাল হয়ে উঠেছে। দূর থেকে উদ্বাহু সাইমুমের মত এগিয়ে আসছে একটা ধূলিঝড়, ক্রমশ বড় হচ্ছে ওটা, তারপর একসময় একটা ছুটন্ত ঘোড়ায় পরিণত হলো।

রাশ টানল সওয়ারি, আচমকা থমকে দাঁড়ানোয় সামনের দুই পা শূন্যে তুলল ঘোড়াটা। 'হাউডি, মেকস্! কিছু খাবার হবে? ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

'সি, সিনর।' মেষপালক ইশারায় তার ক্যাম্পটা দেখাল। 'আছে।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে ক্যাম্পের দিকে হাঁটা দিল সওয়ারি। ঝরনার কাছে এসে ঘোড়াটা লেজ নেড়ে ওই দিকে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু লাগাম টেনে ধরল ওর মনিব। 'শান্ত হ, বেটা। জিরিয়ে নে আগে।'

ঘোড়া থেকে নেমে আগুনের কাছে গেল সে। একটা কালিপড়া কফিপট চড়ানো।

অশ্বারোহীর দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল মেক্সিক্যান। বিশাল বপু, মেষপালকের চাইতে অনেক লম্বা। পেটা শরীর। নাকের বাঁশি কয়েক জায়গায় ভাঙা, বহু হাতাহাতির সাক্ষ্য। চেহারায় একধরনের বন্য উগ্রতা ফুটে আছে, যেন দুনিয়ার কাউকে পরোয়া করে না।

ঘন কালো চুল, কানের লতি ছুঁয়েছে। হ্যাটের চুড়োয় একটা বুলেটের গর্ত। দুকোমরে দুটো পিস্তল, পেশাদারদের ঢঙে হোলস্টার উরুর সাথে বাঁধা। ঘামে ধুলোয় চিটচিট করছে ওর বাকস্কিনের শার্ট। পায়ে গোড়ালি ভাঙা বুট, তবে দুটো বিরাট স্পার রয়েছে, ক্যালিফোর্নিয়ার তৈরি।

আড়চোখে ভেড়ার খোঁয়াড় আর কোরালের দিকে তাকাল সে। দশ-বারোটা ঘোড়া বাঁধা স্টলে। 'তোমার?' জিজ্ঞেস করল আগন্তুক।

'না, সিনর। মালিকের।'

'কে? নাম কী?'

'ডন ম্যানুয়েল ওশোয়া। মালিক স্যান্তা ফেতে রয়েছেন, সিনর।'

'তাঁকে বলো নোয়েল ওসমানের একটা ঘোড়া দরকার ছিল। সোরেলটা নিয়ে যাচ্ছি আমি।'

মেষপালক নিষ্ঠুরদর্শন অশ্বারোহী আর তার পিস্তলদুটো আর একনজর দেখল। 'সি, সিনর। বলব আমি।'

নোয়েল ওসমান সোরেলটার কাছে গেলে, মটরশুঁটির পাত্রের দিকে তাকাল মেষপালক। খালি। কফি টর্টিলা সব শেষ হয়ে গেছে।

সোরেলকে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এল নোয়েল। স্যাডল বদল করে, নিজের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা রুপোর চাকতি বের করল। আধুলিটা আপনমনে একবার দেখল সে।

'মেক্স,' একটুবাদে বলল নোয়েল, 'এ-ই আছে আমার কাছে। তোমার খাবারের দামটা বাকি থাকল, পরে কখনও সুযোগ পেলে শোধ করে দেব। সুস্বাদু, খেয়ে তৃপ্তি পেয়েছি।'

'দাম লাগবে না, সিনর। তোমার ভাল লেগেছে এতেই আমার আনন্দ।' একটু ইতস্তত করল মেক্সিক্যান, তারপর বলল, 'তুমি বোধ হয় সিনর ও'নীলের ভাই?'

'চাচাতো।' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মেষপালকের দিকে তাকাল নোয়েল। 'তুমি চেনো ও'নীলকে?'

'না, সিনর। তবে সবাই তাকে ভালমানুষ বলেই জানে– মেক্সিক্যানদের বন্ধু।' দম নিতে থামল মেষপালক। 'সিনর, আধ-ডলারে কিছু হবে না।' আবার দোনোমনো করল সে। 'সিনর কি... ধার হিসেবেই দিচ্ছি।' একটা স্বর্ণ ঈগল বাড়িয়ে ধরল ও।

নোয়েল ওসমান সহজে বিস্মিত হওয়ার পাত্র নয়, কিন্তু এখন হলো– বিস্মিত এবং অভিভূত। মেক্সিক্যান বুড়োর দিকে তাকাল সে। 'তুমি আমাকে চেনো না, ওল্ড ম্যান। আর কখনও আমি এইদিকে নাও আসতে পারি।'

কাঁধ ঝাঁকাল বুড়ো।

'তোমার সরলতার সুযোগ আমি নিতে পারব না, ওল্ড ম্যান। আমি ক্লিঞ্চ মাউন্টিনের ওসমান, খারাপ লোক বলে আমাদের দুর্নাম আছে। টাকার গায়ে নাম লেখা থাকে না, পেলে ছাড়ি না– কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে ধার দেয়নি। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

জিনের দড়িটা শক্ত করে বেঁধে ঘোড়ায় চাপল সে। 'থ্যাংকস, ওল্ড ম্যান। সম্ভব হলে কাউকে দিয়ে মোরায় একটা খবর পাঠিও । ও'নীলকে গিয়ে বলবে, একজন ওসমান মগলোনসে বিপদে পড়েছে।'

নিঝুম পাহাড়ে জোরাল শোনায় খুরের আওয়াজ। একদৃষ্টে অপসৃয়মাণ অশ্বারোহীর গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল মেক্সিক্যান, তারপর ও হারিয়ে যাওয়ার বেশ পরে বিড়বিড় করে বলল, 'ভায়া কন দাইওস! যাত্রা শুভ হোক।'

মোরা ক্রীক। ও'নীল ওসমানের র‍্যাঞ্চ হাউস। ডাইনিং টেবিলে দশজনের খাবার সাজানো হয়েছে। মেক্সিক্যান পরিচারিকারা ছোটাছুটি করছে নীরবে. ডিনারের আগে শেষবারের মত জরিপ করছে কোনও ক্রটি রয়ে গেল কি না। ওদের স্কার্টের মৃদু খসখস শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওয়াশিংটন ডি. সি. থেকে ফিরে এসেছে অ্যাঞ্জেল ওসমান। তাই এত আয়োজন।

ও'নীল ওসমানের গায়ে কালো বনাতের সুট। চামড়ায় মোড়া পিঠ-উঁচু চেয়ারে বসে অ্যাঞ্জেলের কথা শুনছে ও।

লিভিং রুমটা দোতলা সমান উঁচু। বিশাল। তিন দিকে ব্যালকনি। চমৎকার গালিচা-পাতা কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। দামী আসবাবে সুন্দর করে সাজানো ঘর। ঠাণ্ডা।

'ক্যাপ এখুনি চলে আসবে, অ্যাঞ্জেল। আজ সকালে ও দক্ষিণের রেঞ্জটা দেখতে গেছে।'

'কেমন আছে ক্যাপ?'

'জানিসই তো ওর স্বভাব। সারাজীবন মাংস, বীন আর বারুদ ঘেঁটে কাটিয়েছে। আমার তো মনে হয় কেউ যদি ওকে মেরে না ফেলে, ও চিরকালই অমন থাকবে।'

'ওরিনের খবর পেলি কিছু?'

'নাহ্, অ্যারিযোনায় রওনা হওয়ার পর থেকে আর কোনও যোগাযোগ নেই। আমার বাথানেই আছে ওর গরুগুলো। ওরিন কেমন মানুষ তুই জানিস... একদম চিঠিপত্র লেখার অভ্যেস নেই।'

'দ্যাখ, নীল, আজকের এই সভাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিল ক্যানাভান আসছে। ওর সাথে আরও কিছু লোক থাকবে। ওরা আমাকে সিনেট নির্বাচনে দাঁড় করাতে চায়। এটা একটা বিরাট ব্যাপার, আমারও ইচ্ছে চেষ্টা করে দেখব।'

'তা আমার কাছে কী চায় ওরা?'

'নীল, মেক্সিক্যানদের ভোট পেলে আমি জিতব। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অ্যাংলোদের বিশ্বাস করে না ওরা। তোর আর আমার কথাই যা একটু শোনে।

'বিশেষ করে তোর— ওরা বিশ্বাস করে তোকে, ভালবাসে। আমার পেছনে যে-সব লোক আছে, তারা তোর গ্যারান্টি চায় যে নির্বাচনে তুই আমাকে সমর্থন করবি। ওদের ইচ্ছে, তোর মেক্সিক্যান বন্ধুদেরও তুই বলবি এ-ব্যাপারে।'

মন খুলে হাসল ও'নীল। 'তোর আজ কী হয়েছে বল তো, অ্যাঞ্জেল? তোকে ছাড়া আর আবার কাকে সমর্থন করব? তুই আমার ভাই, তা ছাড়া একজন খাঁটি লোক। নিশ্চয়ই, আমি বলব ওদের, তবে এর কোনও দরকার ছিল না। তোর

কথা ওদের মনে আছে, তোকেও ভালবাসে ওরা। বিশ্বাস কর, তোর বন্ধুরা কিন্তু মেক্সিক্যানদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার মূল্য না দিয়ে ভুল করছে। ওদের বুদ্ধি আছে– সহজে ভুল করে না।'

'তোর সাহায্য আমার দরকার, নীল। একজন গানফাইটার সিনেট– বা আর কোনও সরকারি পদে নির্বাচিত হোক এটা অনেকেই চায় না।'

'তার মানে তুই বলছিস ওরা অ্যান্ডি জ্যাকসনের কথা ভুলে গেছে?' বলল ও'নীল। 'টমাস হার্ট বেন্টন, ক্যাসিয়াস ক্লে– রাশিয়াতে আমাদের অ্যামবাস্যাডর– ওরাও তো একসময় বন্দুকবাজ ছিল।'

পায়ের ওপর পা তুলে বসল নীল। 'তা ছাড়া, অ্যাঞ্জেল, গোলমালে তুই জড়াসনি। টমের সাথে লড়াই হয়েছিল আমার।'

হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল দরজা। নীলের স্ত্রী, রোসাবেলাকে দেখা গেল দোরগোড়ায়, অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানিতে উদ্বেগের ছায়া। 'নীল, ক্যাপ এসেছে। দুঃসংবাদ আছে।'

ওকে পাশ কাটিয়ে ঝড়ের বেগে ক্যাপ সয়্যার ভেতরে ঢুকল। 'নীল, এইমাত্র একটা মেক্সিক্যান ছেলে খবর এনেছে। বিপদে পড়েছে ওরিন। লেযি এ দলের সবাই মিলে মগলোন রিমের কাছে ঘেরাও করেছে ওকে। ওরিনকে ওরা ফাঁসি দেবে, নীল!'

ও'নীল ওসমান আঙুলের টোকায় তার স্প্যানিশ সিগারের ছাই ঝাড়ল, তারপর আলতোভাবে ওটা রেখে দিল অ্যাশট্রেতে। 'ক্যাপ, ওদেরকে বলো আমার জন্যে একটা ঘোড়া রেডি করতে।'

অ্যাঞ্জেলের দিকে ঘুরল সে। 'দুঃখিত, জেল। আমার হয়ে তুই ওদের বলে দিস, আমি আছি তোর সাথে... ফিরে এসে যা হয় করব।'

'বেলা জানিয়ে দেবে। আমিও আসছি।'

'নীল,' মুখ খুলল ক্যাপ, 'তুমি যা ভাবছ ব্যাপারটা কিন্তু তার চেয়ে মারাত্মক। ড্রুসিলা খুন হয়েছে, ওদের সব পুরোনো কর্মচারী কাজ ছেড়ে দিয়েছে। লেযি এ-তে এখন আছে শুধু ভাড়াটে খুনীরা।'

'আমরাও তিনজন,' অ্যাঞ্জেল বলল তার ভাইকে, 'তুই, আমি, আর ওরিন।'

'চার,' বলল ক্যাপ। 'আমি কবে ওসমানদের পাশে দাঁড়াইনি, বলো?'

মাঝরাত পেরিয়ে গেছে বহুক্ষণ আগে। নাইট র‍্যাঞ্চের সামনে একটা স্টেজ এসে থামল। হাতেগোনা কয়েকজন যাত্রী নামল কোচ থেকে। দীর্ঘকায় সুদর্শন সুবেশধারী এক ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে তার সুন্দরী স্ত্রীকে সাহায্য করল নামতে। ভদ্রলোক বা তার স্ত্রীর চেহারার কোথাও পথশ্রমের চিহ্নমাত্র নেই।

'সাথে খাবার নিয়ে যান,' যাত্রীদের পরামর্শ দিল চালক। 'গ্লোবের এ-দিকটায়

দ্রষ্টব্য: বসতি

ভাল কিছু পাওয়া যায় না।'

রোদে-পোড়া ইটের তৈরি র‍্যাঞ্চ হাউস। পুরু দেয়াল। একই সাথে স্যালুন এবং স্টেজ স্টেশন। স্ত্রীর হাত ধরে দীর্ঘদেহী লোকটা এগিয়ে গেল দরজার দিকে। বাইরের তুলনায় ভেতরে অনেক গরম। নতুন করে টেবিল সাজানো হয়েছে। সাদা কাভার, ন্যাপকিন পাতা। পশ্চিমের স্টেজ স্টেশনগুলোতে এ-দৃশ্য বিরল।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকার সময়ে পেছনে, কঠিন মাটিতে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। কৌতূহলী চোখে ঘাড় ফেরাল লোকটা। দুজন অশ্বারোহী, ওদের চেহারার বৈশিষ্ট্য ওর মনোযোগ আকর্ষণ করল।

'লিন্ডা, তুমি না তখন জানতে চেয়েছিলে পাহাড়ের লোকেরা দেখতে কেমন।'

স্বামীর পাশে এসে দাঁড়াল লিন্ডা। অবাক চোখে দেখছে দুই নবাগত ঘোড়সওয়ারকে। দুজনেই লম্বা, ছয় ফুটের ওপরে, সারা শরীরে ধুলো-বালি। হিচ রেইলে নিজেদের টাট্টু দুটো বাঁধছে ওরা। কারোরই বয়স বিশের বেশি নয়। চেহারায় অদ্ভুত মিল। ছিপছিপে, চওড়া হাড়। প্রত্যেকের বাঁহাতে রাইফেল। এমনভাবে বইছে যেন ওটা তার শরীরেরই একটা অংশ। পরনে ঘরে-বোনা কাপড়। 'দেখ, লিন্ডা, সদ্য পাহাড় থেকে আসছে এরা।'

'শ্যান, ওদের মুখটা দেখ!'

'দেখেছি, হতে পারে।'

নবাগত দুজন ভেতরে ঢুকতে শ্যান তাকাল ওদের পানে। 'জেন্টেলমেন? আমার সাথে ড্রিংক করতে আপত্তি আছে?'

থমকে দাঁড়াল ওরা, শ্যানকে মাপছে, দৃষ্টিতে নির্ভেজাল কৌতূহল। একটুবাদে অপেক্ষাকৃত বয়স্কজন বলল, 'বেশ, চলো।'

স্ত্রীর দিকে ঘুরল শ্যান। 'লিন্ডা, প্লিজ তুমি একটু বসো– আমরা আসছি।'

বারের উদ্দেশে রওনা হলো তিনজন, পেছন থেকে ওদের দেখছে লিন্ডা ওসমান, ঠোঁটের কোণে স্মিত হাসি।

বারে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ওরা। তিনজনই লম্বা, একহারা। রান্নাঘর থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে এসে ওদের সামনে বোতল আর গ্লাস রাখল।

'জেন্টেলমেন,' গ্লাসে পানীয় ঢেলে শ্যান বলল, 'ইওর হেলথ্!'

ওরা যখন বারে নিজেদের খালি গ্লাস নামিয়ে রাখল, তখন মন্তব্য করল শ্যান, 'চমৎকার গন্ধ– তবে মধুর স্বাদ নেই।'

সঙ্গী দুজন আড়চোখে দৃষ্টি বিনিময় করল। 'দেখেই বুঝেছিলাম, তোমরা ওসমান না হয়েই যাও না। বাড়ি কোথায় তোমাদের?'

'ও, হ্যাঁ,' বলল শ্যান, 'আমি শ্যান ওসমান, নর্থ ক্যারোলাইনায় থাকি।'

অপেক্ষাকৃত লম্বা লোকটি, যার থুতনিতে কাটা দাগ রয়েছে একটা, বলল, 'আমি পিটার ওসমান। আর এ আমার ভাই, মিলটন। আমরা সবে পাহাড় থেকে আসছি, হঠাৎ কাল রাতে একটা গুজব শুনলাম পথে।'

'গুজব?'

'মগলোনে কে এক ওসমান বিপদে পড়েছে। আমরাও ওসমান– তাই যাচ্ছি

ওখানে।'

'কই, আমি কিছু শুনিনি তো!'

'সত্যি; অনেক কথাই শোনা যাচ্ছে। ওর বউকে নাকি কোন একটা লোক খুন করেছে। ও খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে। কেবল এক সমস্যা আছে, ও একা– বিপক্ষে চল্লিশজন।'

'আমাদের তা হলে তাড়াতাড়ি যেতে হয়,' বলল শ্যন।

'তুমিও আসছ, মিস্টার?' জিজ্ঞেস করল পিটার ওসমান।

'নিশ্চয়ই। দেরিই হয়ে গেল কিনা কে জানে।'

'ও বোধ হয় এতটা কৃপণ হবে না।'

'কৃপণ?'

'হ্যাঁ, আমাদের জন্যেও রাখবে কিছু– একাই হজম করে ফেলবে না চল্লিশটাকে।'

হাতের গ্লাস নামিয়ে রাখল পিটার, করুণ চোখে একবার তাকাল বোতলটার দিকে, তারপর বার থেকে সরে এল দ্রুত।

দশ

প্রচণ্ড খিদে নিয়ে আমার ঘুম ভাঙল সকালে। কফির তেষ্টা পেয়েছে খুব, এবং সেই সাথে নীচের ওই লোকগুলোকে শায়েস্তা করার জন্যে জ্বলছে ভেতরটা। তবে আপাতত এই পাহাড় থেকে বেরোনোর একটা রাস্তা বের করতে হবে, ওরা আমাকে ফাঁদে ফেলেছে।

ড্রুসিলার খুনী এবং তার অনুচরদের বিরুদ্ধে আক্রোশ জমা হয়েছে আমার মনে। ইচ্ছে হচ্ছে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে কুকুর দিয়ে খাওয়াই ওদের। এইবার একটা এসপার-ওস্পার হবে, পাল্লা ওদের দিকেই ভারি। এই এলাকা আমার চেয়ে ভাল চেনে ওরা, সংখ্যায়ও বেশি। তবু ওদেরকে এর মাশুল গুনতে হবে। আমার ব্যাপারে নাক গলিয়েছে, আমি সেটা ভোঁতা করে দেব।

রাইফেলটা ঝুলিয়ে নিলাম কাঁধে, হাতদুটো মুক্ত থাকবে, তারপর রওনা হলাম পাহাড়ের গা বেয়ে। ক্রমশ খাড়া হচ্ছে চড়াই। মাঝে-মধ্যে কেবল হাতের দশ আঙুলে ঝুলছি, একবার প্রাণপণে একটা ফাটল চেপে ধরে পতন রোধ করলাম।

উঠছি, কিন্তু ওরা আমাকে ধরে ফেলবে এই ভয়ে সারাক্ষণ কুঁকড়ে রয়েছি নিজের ভেতরে। এই মুহূর্তে আশপাশে দেখছি না কাউকে– তবে অনুভব করছি, ওরা আছে।

হঠাৎ একটা কারনিস চোখে পড়ল, প্রায় আট ফুট নীচে, বেশি হলে দুফুট চওড়া, তারপর অতল খাদ। এখন আমি যেখানে রয়েছি তার চাইতে ওটা অনেক

নিরাপদ, তাই লাফ দিলাম।

আলত পায়ে, আঙুলের ওপর ভর রেখে নামলাম কারনিসের কিনারে, অনুভব করলাম পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে পাথর, টলছি আমি, কোনমতে শক্ত মুঠিতে চেপে ধরলাম একটা লতাগুল্ম, তারপর একটু-একটু করে সরে এলাম মজবুত জায়গায়। মূলত বেলেপাথরের কারনিস, সঙ্গে চুনাপাথরের মিশেল: বহু ঝড়বাদলে শুকিয়ে জমাট বেঁধেছে।

হামা দিয়ে ছোট্ট একটা বাঁকের মুখে গিয়েই আমার চুল দাঁড়িয়ে গেল। একটা কুগার এগিয়ে আসছিল এইদিকে, আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে। মাঝের ব্যবধান দশ ফুটও হবে কিনা সন্দেহ। স্থির চোখে পরস্পরের দিকে চেয়ে আছি আমরা, পলক পড়ছে না।

কান খাড়া করল সিংহ, নাক ঝাড়ল ঘোঁৎ করে। কুগার এমনিতে খুব ভিতু, কিন্তু আহত হলে খুন চেপে যায় মাথায়। বুঝলাম, কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে আমাকে, নইলে এখানেই ভবলীলা সাঙ্গ হবে।

জায়গায় অনড় দাঁড়িয়ে আছি আমরা, দেখছি একে অন্যকে, আমাদের চোখ জ্বলছে ধক্‌ধক্ করে— সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হচ্ছে। আমার রাইফেল কাঁধে, কুঁদো কোল্টের মাথায় চেপে বসেছে। প্রয়োজনের সময় বউই নাইফটা বের করতে পারব। ধারাল ছুরি, মওকা পেলে বিল্লির ধড় মাথা আলাদা করা যাবে।

'সরে যা, বিল্লি,' বললাম আমি, 'তোর সাথে আমার ঝগড়া নেই।'

ঘাড় বেঁকিয়ে গর্‌গর্ করে উঠল ও, চোখ সরিয়ে নিয়েছে অন্যদিকে। ঠিক করলাম, অপেক্ষা করব। সিংহের পক্ষে ফেরা সম্ভব, কিন্তু আমার পিঠ দেয়ালে— ফিরতে পারব না। অবশেষে একসময় ধৈর্যের খেলায় হার মানল পশুরাজ, ঘুরে যে-পথে এসেছিল, চলে গেল সেইদিকে। কিন্তু আমি তক্ষুণি নড়লাম না— আপদ বিদায় হোক আগে।

এতক্ষণ উত্তেজনায় দম প্রায় বন্ধ করেছিলাম, হঠাৎ জোরে শ্বাস টানতে নাক জ্বালা করে উঠল। পানি এসে গেল চোখে।

ধোঁয়া...

কারনিসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম আমি, সামান্য ঝুঁকে উঁকি দিলাম। সামনে প্রায় কয়েক মাইল দূরে একটা পাহাড় চুড়ো। অনুমান করলাম, টনটো ট্রেইল ওই চুড়ো এবং এই পাহাড়ের মাঝামাঝি কোথাও হবে। নীচে, পাইন বনে একটা ক্যাম্প ফায়ার— মগডালের মাথায় সুতোর মত এক চিলতে ধোঁয়ার রেখা।

এখন আমি যেখানে রয়েছি, পাহাড়ের গা তার চেয়ে কম খাড়া। একজন কর্মঠ মানুষ ওঠানামা করতে পারবে, যথেষ্ট আড়ালও আছে। একটু খোঁচা দেয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না আমি।

উইনচেস্টার নামালাম কাঁধ থেকে, একদৃষ্টে জরিপ করলাম ধোঁয়া। লোকজন হয়তো জড়ো হয়েছে এর চারপাশে, সম্ভবত ওরাই ধাওয়া করছে আমাকে। অবশ্যি এ-সবই নিছক অনুমান, অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার শামিল।

একটু ভাবতেই উপলব্ধি করলাম, এই মুহূর্তে কিছু খাবার এবং একটা ঘোড়া আমার সবচেয়ে বেশি দরকার। সম্ভব হলে আমার নিজের ঘোড়াটা। পোঁটলায় খাবার ছিল, উঠে বসে হাভাতের মত খেলাম সেগুলো। তেষ্টা পেয়েছে, এক ঢোক পানি খেতে পারলে খাবারগুলোও নামত গলা দিয়ে। কাছাকাছি একটা জায়গাই আছে, যেখানে গেলে পানি পাব– ওই ক্যাম্প ফায়ারে। হাতের উল্টো পিঠে মুখ মুছে, ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে সাবধানে রওনা হলাম নীচে।

যখন পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছুলাম, ক্যাম্প থেকে মাত্র একশো গজ দূরে রয়েছি আমি। ভোরের ঠাণ্ডা কাটেনি পুরোপুরি। ঘাসের ওপর চিকচিক করছে শিশিরবিন্দু, নিচু গাছপালার পাতা ভেজা। পাখিরা কিচিরমিচির করছে, এক জায়গায় একটা বিরাট কূগারের ট্র্যাক চোখে পড়ল... বোধ হয় এই সিংহটাই গিয়েছিল ওপরের ট্রেইলে। ইন্ডিয়ানদের মত নিঃসাড়ে আধপাক চক্কর মেরে আমি দেখলাম আগে, ক্যাম্পের কোথায় কী আছে।

প্রথমেই বের করলাম ঘোড়াগুলো, আমারটাও আছে ওই পালে। তারপর ব্যবধান কমাতে লাগলাম ধীরে ধীরে, সর্বদা হুঁশিয়ার– বেগতিক দেখলে কীভাবে পালাব তাও ভেবে রেখেছি।

বেশির ভাগ লোক আগুনের চারপাশে জড়ো হয়েছে। ওদের বৃত্তের পঞ্চাশ গজের ভেতর চলে এসেছি আমি, এমন সময়ে কাপ-হাতে উঠে দাঁড়াল একজন। আগুনের এ-পাশে চোখ পড়তেই আমাকে দেখে ফেলল সে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল হাবার মত, তারপর কাপটা ফেলে দিয়ে হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে। আমার উইনচেস্টারের বুলেট ওর হাত গুঁড়িয়ে দিল।

হাতটাই আমার লক্ষ্য ছিল, তা বলছি না। আসলে বেল্ট বাকলের ঠিক ওপরে, শার্টের বোতাম সই করেছিলাম, কিন্তু আচমকা ঘুরে যাওয়ার ফলে হাতটা হারাতে হলো ওকে। এই আকস্মিক ঘটনায় বোকা হয়ে গেল অন্যরা।

'কেউ নড়বে না,' কথোপকথনের ভঙ্গিতে বললাম, 'আমার রাইফেলের কিন্তু বাছবিচার নেই।'

ওরা নজন, তার মধ্যে একটার হাত ভাঙা, লড়াইয়ের শখ নিশ্চয়ই এখন মিটে গেছে ওর।

'তোমাদের ধোঁয়া দেখে ভাবলাম যাই নাস্তাটা সেরেই আসি,' বললাম আমি। 'শোনো, তোমরা বরং এক কাজ করো, নিজেদের গান বেল্টগুলো খুলে ফেলো। এরপর কিন্তু আর কোনও ওয়ার্নিং দেব না আমি।'

ওদের হাত কাঁপছে বলির পাঁঠার মত। এত সাবধানে বেল্ট খুলছে যে মনে হয় একটা-একটা করে লোম তুলছে মরুবিড়ালের লেজ থেকে।

'তুমি'– উইনচেস্টারের নল দিয়ে খোঁচা মারলাম একজনকে– 'ওইপাশে যাও।'

লক্ষ্মী ছেলের মত হুকুম তামিল করল সে। একটা কাপ ধুয়ে আমার জন্যে কফি ঢালতে বললাম ওকে। তারপর নাস্তায় বসলাম আমি। বড় এক চাকা

বেকন আর আধ-গ্যালন কফি খেলাম।

ইতিমধ্যে মেপে ফেলেছি সবাইকে। কেউই সাধারণ কাউহ্যান্ড নয়। ঘোড়া, স্যাডল সব কিছুই দামী। অস্ত্রগুলোও ভাল। জীবনে বহু ঘাটের পানি খেয়েছি আমি– বুঝলাম ওরা ভাড়াটে সেনা।

'ভুল জায়গায় হাত দিয়েছ,' বললাম আমি। 'নিজেদের ভাল চাও তো কেটে পড়ো। এখানে সুবিধে হবে না।'

'এই বেলা যা পারো ফুর্তি করে নাও, দোস্ত,' বলল একজন, 'আর বেশি দিন বাঁচবে না তুমি।'

'আমরা কেউই বাঁচব না। সবাই জানে এ-কথা– তবে তোমরা যেচে নিজেদের মৃত্যু ডেকে আনছ।'

'এতদিন পালিয়েছিলাম, কিন্তু এখন থেকে পাল্টা আঘাত করব। যেখানেই সুযোগ পাব, তোমাদের দেখামাত্র গুলি করব। অ্যান্ড দিস ইজ মাই লাস্ট ওয়ার্নিং।'

দুকদম পিছিয়ে গেলাম আমি, ওদের একজনকে সবকটা গান বেল্ট আর রাইফেল এক জায়গায় জড়ো করতে বললাম। জানা কথা দু-একজনের কাপড়ের তলায় পিস্তল লুকোনো আছে, তবে আপাতত এ-ব্যাপারে অতটা চিন্তিত নই আমি। যখন সব কাজ মিটল, আর একজনকে দিয়ে আমার অ্যাপালুসাটা নিয়ে এলাম কাছে।

স্যাডলে চেপে পমেলের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখলাম রাইফেল, তারপর তাকালাম ওদের দিকে। 'হিগিন্সরাই পারেনি– তোমরা আমার কচু করবে,' বুড়ো আঙুল দেখালাম আমি, 'পাহাড়ে থাকতে ওদের সাথে লড়াই হয়েছিল আমাদের। একটাও বাঁচতে পারেনি... অথচ ওদের একজনই দেশছাড়া করতে পারত তোমাদের।

'তোমরা বোধ হয় আসল ঘটনা জানো না। তোমাদের বস, বা ওই জাতীয় কেউ একজন হবে, আমার স্ত্রীকে খুন করেছে। আমি তখন ছিলাম না ঘটনাস্থলে। পরে ওর লাশ খুঁজে পেয়েছি। জানি, তোমাদের ভেতর দু-একজন ভালমানুষ যে নেই তা নয়। সেটাই দেখব এখন– কে থাকে, আর কে যায়। ও-রকম একটা নরপশুর সাথে কোনও ভাল লোক চলতে পারে না।'

'কাজটা কার?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'এখনও জানি না, তবে ঠিকই বের করব। আমার স্ত্রী বাধা দিয়েছিল ওকে, হয়তো অ্যাদ্দিনে খামচির দাগ শুকিয়ে গেছে– কিন্তু ভেতরে জ্বলুনি ঠিকই আছে। নিশ্চয়ই কাঁচা অবস্থায় কারও না কারও চোখে পড়েছে ওটা।'

'তোমার ধারণা ভুল,' বলল লোকটা। 'লেফি এ বাথানের মালিকেরা ভদ্র। প্রিটস আর ভিক্টরের চেয়ে ভাল লোক তুমি পাবে না।'

'হতে পারে...তবে ওদেরই একজন কিন্তু ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। আমাকে খতম করার জন্যে ভাড়া করেছে তোমাদের। একটু মাথা খাটালে তোমরাও বুঝতে পারবে।'

'বাজে কথা, গর্দভ! তোমার দিন ফুরিয়েছে!'

'কী জানি,' শ্রাগ করে বললাম, 'কিন্তু যাওয়ার সময়ে আমি কজনকে সাথে নিয়ে যাব সেটা ভেবে দেখেছ? ভাবো, ভাল করে ভাবো।' উইনচেস্টারের গায়ে আদর করে চড় মারলাম একটা। 'এটা দিয়ে তোমাদের পেট ফুটো করে দিতে পারি আমি।'

কথা শেষ করে চলে এলাম ওখান থেকে, কেউ বাধা দেওয়ার আগ্রহ দেখাল না।

ওরা সবাই কঠিন লোক। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত, জানে এর ক্ষমতা কত। তাই অতিউৎসাহ দেখাচ্ছে না। ওদের কারও খ্যাতির মোহ নেই, জেতার জন্যে লড়ে। এখন চুপ করে আমার কথা শোনাই ওদের জন্যে মঙ্গল, কারণ জানে তাদেরও সময় সুযোগ আসবে। তা ছাড়া অহেতুক বাহাদুরি ফলাতে গিয়ে নিজের মৃত্যু ডেকে আনার কোনও অর্থ হয় না।

ওখান থেকে বেরিয়ে বৃথা সময় অপচয় করলাম না আমি। এক নাগাড়ে ছুটে চললাম দক্ষিণে, তারপর যখন রাত নামল তখন বিয়ারহাইড ক্যানিয়নে, ঝরনার এক মাইল ওপরে ক্যাম্প করলাম।

বলতে কী, এতদিন আমি নিজের চামড়া বাঁচাতেই ব্যস্ত ছিলাম, ড্রুসিলার খুনীকে শনাক্ত করার কোনও সুযোগই পাইনি। তবে যতবার লেযি এ দলের কোনও অশ্বারোহী বা গরুর দেখা পেয়েছি, মনে হয়েছে চেরী ক্রীকের দিক্ থেকে এসেছে ওরা।

এই অনুমান ভুল হতে পারে; কিন্তু ওই পথে অগ্রসর হয়ে যখন আরও ট্র্যাক চোখে পড়ল উৎসাহ বেড়ে গেল আমার। যত এগোচ্ছি, ওই মার্কার গবাদি পশু বেশি করে নজরে পড়ছে।

রাগে তেতো হয়ে আছে মুখ। ঘৃণার আগুন জ্বলছে বুকে। আমি কখনও রাগ পুষে রাখি না, কিন্তু এখন নাচার। এমন এক এলাকায় রয়েছি যেখানে নিজের ক্ষমতাই মূল কথা, আর কোনও আইনই খাটবে না।

আমার যাত্রাপথের কোথাও বসে আছে এক লোক। ভয়ে আতঙ্কে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেছে। আমার চেয়ে আমার কথাকেই তার ভয় বেশি। নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে অনেকেই বাঁকা চোখে তাকিয়েছে তার দিকে, বিক্ষত মুখটাও দেখেছে কেউ কেউ...ওটার কী ব্যাখ্যা দেবে সে?

আমি এখন ওর কাছে একটা হুমকিস্বরূপ। সব সময়ে তটস্থ থাকবে, যে-কোনও মুহূর্তে হাজির হয়ে তার মান-সম্মান, প্রতিষ্ঠা সব ছারখার করে দিতে পারি আমি। পশ্চিমে নারী নির্যাতনকারীকে সবাই ঘৃণা করে, একটুও দ্বিধা করে না ফাঁসি দিতে। ওই লোকও জানে সেটা। প্রতিপলে সে উপলব্ধি করছে আমি ধেয়ে আসছি তার দিকে।

আমরা গ্লোব ছেড়ে চলে আসার সময় যে-লোকটা পেছন ফিরে ড্রুর দিকে তাকিয়েছিল, বারবার ওর কথা মনে পড়ছে। আমার মন বলছে ওই লোকই আমার লক্ষ্য।

পাইন বনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। ঝরা পাতার ওপর মৃদু শব্দ হচ্ছে খুরের। উঁচু পাহাড়ী ট্রেইল ধরে ছায়ার মত অগ্রসর হচ্ছি আমরা। মাথার ওপর আনত মেঘের ছাত। আশপাশে কুয়াশা, শীত শীত করছে। রাইফেলটা আড়াআড়িভাবে স্যাডলের ওপর রেখেছি, ডান হাতের তর্জনী ট্রিগারে। হত্যাকারীর রক্ত চায় আমার বুলেট।

অবশেষে, এক হিম-শীতল সকালে আমি উপস্থিত হলাম অ্যাপাচি রিজে। সামনের উপত্যকায় ধোঁয়ার রেখা দেখে, সল্ট লিক ক্যানিয়ন আর টনটো হয়ে উঠে এলাম ডায়মন্ড বাইউটে। ঢিবির মাথায় উবু হয়ে বসে উঁকি মারলাম নীচে। হাতুড়ির ঘা পড়তে শুরু করল আমার বুকে।

মাঠের একপাশে কয়েকটা ক্যানভাস আচ্ছাদিত ওয়াগন আর তাঁবু। অনেকটা সেনা ছাউনির মত। ঘেসো জমিতে চরছে একপাল ঘোড়া। দুজন লোক পাহারা দিচ্ছে।

ধোঁয়া উঠছে মৃদু, থালাবাসনের টুংটাং আওয়াজ ভেসে আসছে। সব মিলিয়ে একটা নিখুঁত কাউ ক্যাম্পের চেহারা। চারপাশে চমৎকার তৃণভূমি, একজন গরু ব্যবসায়ীর স্বর্গ। তবে এ-ক্ষেত্রে, ক্ষণিকের উত্তেজনায় নিজের জীবনটাকে নরকে পরিণত করেছে ওই লোক।

একনজরেই বোঝা যায় সচ্ছল আউটফিট। গরুগুলো নাদুসনুদুস, ভাল জাতের। যতটুকু দেখতে পাচ্ছি মালপত্র সব দামী। গোটা এলাকা, ওদের প্রতিটি নড়াচড়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলাম আমি।

মোট চারজন লোক রয়েছে বাইরে। বাবুর্চি আর তার সহকারী, র‍্যাংগলার ঘোড়ার গা মালিশ করছে, এবং চতুর্থজন সবচেয়ে বড় তাঁবুটার সামনে বসে আছে। কোলের ওপর রাইফেল, একটা ছোট তাঁবুর দিকে তাকিয়ে আছে ও। ওই ছোট্ট তাঁবুটাই আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল। বুকের ধুকপুকানি বাড়ছে, ভয়ঙ্কর সব চিন্তা উঁকি দিচ্ছে মনে।

প্রিটস এবং ভিক্টর... এই নাম দুটোই কাল ওদের একজন বলেছিল। লেযি এ বাথানের মালিক ওরা। এবং ওদেরই একজনকে খুঁজছি আমি... আমার ড্রুকে সে-লোক খুন করেছে। আমার জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা চুরমার করে দিয়েছে।

এই পশ্চিমে নিজেদের নীড় বাঁধার আশায় এসেছিলাম আমরা। ইচ্ছে ছিল সংসার পাতবো এখানে, ছেলেপুলে মানুষ করব। নিজের সংসার বলতে ড্রুর কোনও কালেই কিছু ছিল না। কৈশোরে বাড়ি ছাড়ার পর থেকে আমিও পাইনি এর স্বাদ। আপনজনদের সাথেও খুব কমই দেখা হত। ওসমানরা সারা দেশে ছড়িয়ে আছে; কিন্তু মা-ভাইদের দেখব বলে মোরায় আসার আগে পর্যন্ত আমি কারও দেখা পাইনি। আমাদের স্বপ্ন যে-লোক ধ্বংস করে দিয়েছে তাকে আমি ক্ষমা করতে পারব না।

ওকে মারার পর হয়তো আমিও বেঁচে থাকব না আর– বস্তুত বাঁচার সম্ভাবনা হাজারে মাত্র একভাগ। কিন্তু তাতে আমার মনে কোনও ক্ষোভ নেই–

অপরাধীকে নিজের হাতে শাস্তি দিতে পারলেই হলো।

প্রিটস এবং ভিক্টর...প্রিটস না ভিক্টর? আগে জানতে হবে দোষী কে, কীভাবে সেটা সম্ভব হবে বুঝতে পারছি না, কেবল অনুভব করছি ওকে দেখলে চিনতে পারব।

এই টিবির মাথায় কোনও পাহারা নেই বলে আশ্চর্য হলাম। এখান থেকে ওদের ক্যাম্প, গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখা সম্ভব। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম আমি। পাছে ব্যারেলে রোদের প্রতিফলন ধরা পড়ে, হাতের রাইফেলটা নামিয়ে রাখলাম পাশে। আমার পরনেও তেমন উজ্জ্বল কিছু নেই।

চারণভূমিতে কাউহ্যান্ডরা সাধারণত চকচকে কিছু পরে না। যাদের রুপো বা পেতলের বেল্ট বাকল আছে, শহরে কখনও নাচের আসরে যোগ দিলে ব্যবহার করে ওগুলো। কাউহ্যান্ডরা নিজেদের সাধ্যমত সেরা জিনিসটাই কেনার চেষ্টা করে। এক সময় আমার নিজেরও একপ্রস্থ বনাতের সুট ছিল।

এখন ওরা হয়তো আমার জন্যে একটা কাঠের ওভারকোট বানানোর কথা ভাবছে। তবে তেমন কিছু হওয়ার আগেই একজন লোককে খতম করব আমি।

চকিতে আর একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল আমার মাথায়। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে ড্রুসিলাই ওর প্রথম শিকার নয়– পেছনে আরও বহু মেয়ের লাশ ফেলে এসেছে সে?

এগারো

বেশ বেলায় চারজন ঘোড়সওয়ার ক্যাম্পে এসে নামল ঘোড়া থেকে। জিন খসিয়ে র‍্যাংগলারের হাতে তুলে দিল ঘোড়াগুলো, তারপর চাক ওয়াগনে ঢুকল। ওদের একজনকে আমি চিনি, মন্ট্যানায় এক কাউ আউটফিটে কাজ করত।

অ্যাল য্যাবরিসকি পিস্তলবাজ, ভাড়া খাটে। কোনও কাউ আউটফিট যখন মাস্তানদের সাথে গোলমালে জড়িয়ে পড়ে, তখন ওর সাহায্য নেয়। নিজের কাজ সে ভালই বোঝে, দক্ষ।

লম্বা। ঈষৎ কুঁজো। ভয়ালদর্শন। এমনিতে ঠাণ্ডা, ধূর্ত হিসেবী লোক; কিন্তু পেটে দুফোঁটা মদ পড়লেই খেপে ওঠে। ঝামেলা পাকানোর ফিকির খোঁজে। অন্যদের চিনি না, তবে অনুমান করলাম সব এক গোয়ালের গরুই হবে।

একটুবাদে চারটে তাজা ঘোড়াসহ ফিরে এল র‍্যাংগলার।

ঠিক ওইসময়ে ছোট্ট তাঁবুটার ঢাকনা উঠে গেল। ও'ল্যারির স্যালুনে আমি যার সাথে কথা বলেছিলাম, সেই চৌকো চোয়ালবিশিষ্ট লোকটা বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। য্যাবরিসকি বা তার সঙ্গীদের পাত্তা দিল না সে, সামনের

একফালি জমিটুকু পেরিয়ে পাহারাদারের কাছে গেল এবং কথা বলতে লাগল দুজনে।

হঠাৎ আমার বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে উঠল। লোকদুটো তাকাচ্ছে আশপাশে, পাহারাদার ইশারায় দূরের একটা পাহাড়চুড়ো দেখাল, কিন্তু ভুলেও একবার ডায়মন্ড বাইউটের দিকে তাকাচ্ছে না লক্ষ্য করে চট করে আমি সরে এলাম ওখান থেকে।

গোড়ালিতে ভর রেখে দেখছিলাম ওদের, দাঁড়ালাম না, কেবল পায়ের পাতার ওপর ঘুরে ঢুকে গেলাম পেছনের ঝোপে। অস্বস্তি বোধ করছি, কান পাতলাম, কোনও শব্দ নেই– সুমসাম পরিবেশ। ট্রেইলে নেমে এসে একরাশ পাথরচাঁইয়ের আড়ালে গা ঢাকা দিলাম আমি।

ওরা চারদিক দেখল, অথচ নাকের ডগায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটাকে উপেক্ষা করল– ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বৈকি! এই এলাকা সম্পর্কেই আলাপ করছিল ওরা, সন্দেহ নেই, টিবিটাকে যদি আমল না দিয়ে থাকে– নিশ্চয়ই তার পেছনে কারণ আছে। এ-ক্ষেত্রে একটি সমাধানই জাগে মনে: আমি ধরা পড়ে গিয়েছি ওদের চোখে, ঘেরাও করার মতলব আঁটছে।

সম্ভবত নীচের ট্রেইলে আমার ঘোড়াগুলো দেখে ফেলেছে। উপুড় হয়ে শুয়ে, একটা পাথরের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি, সাবধানে গলা বাড়িয়ে উঁকি দিলাম। সতর্ক রয়েছি, আকাশের পটভূমিতে আমার অবয়ব যেন ধরা না পড়ে।

দুটো ঘোড়াই দেখতে পেলাম পরিষ্কার। অনতিদূরের ঝোপ লক্ষ্য করে নেমে গেল একটা চড়ুই পাখি, চক্কর দিল কিছুক্ষণ, তারপর আচমকা উড়ে পালাল। এর অর্থ, ঝোপের ভেতর ঘাপটি মেরে পড়ে আছে কেউ।

আচ্ছা, তা হলে ওরা জানে আমি কোথায় আছি। মনের পর্দায় স্পষ্ট দেখতে পেলাম এরপর কী ঘটবে– ঘিরে ফেলবে টিবিটাকে। আয়তন খুব বেশি নয়, একদল লোকের পক্ষে তল্লাশি চালানো মোটেই কঠিন হবে না। অতএব, এ-বার আমি ওদের কবজায় পড়ে গিয়েছি।

তাই কী? ক্যাম্পের দিকে চলে গেলে কেমন হয়? স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না কেউ এমন কিছু করতে পারি আমি। সুতরাং জায়গাটা অরক্ষিত থাকার সম্ভাবনাই বেশি। ওখানে গেলে ঘোড়া, স্যাডল দুটোই পাব।

হামাগুড়ি দিয়ে রওনা হলাম আমি, মিনিটখানেকের জন্যে দেখলাম ক্যাম্পটা, তারপর কিনার টপকালাম। খাড়া ঢাল তবে দুরারোহ নয়, এখানে সেখানে আড়াল রয়েছে। ঝুঁকে, ছোট ছোট কদমে দ্রুত এগিয়ে চললাম আমি। সুযোগ পেলে গা ঢেকে চলছি, খালি জায়গা পেরিয়ে যাচ্ছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

ঢালের গোড়ায় একটা ঘন ঝোপের পেছনে হাঁটু ভেঙে বসলাম আমি, জরিপ করলাম সামনের প্রান্তর। অশ্বারোহী চারজন চলে গেছে। পাহারাদার রয়ে গেছে নিজের জায়গায়, র‍্যাগলার চাক ওয়াগনের সামনে দাঁড়িয়ে কফি খেতে খেতে গল্প করছে বাবুর্চির সাথে। চৌকো-চোয়াল ফিরে গেছে নিজের তাঁবুতে।

বুঝলাম, ওই লোক প্রিটস বা ভিক্টর এই দু-জনের যে-কেউ হবে।

ডানে একটা তাঁবু দৃষ্টিপথে আড়াল তুলেছে। ওটার পাশ দিয়ে ঘুরে ছোট তাঁবুটার পেছনে চলে এলাম আমি। খসখস শব্দ হচ্ছে ভেতরে। মনে হলো, কলম দিয়ে লিখছে কেউ একজন।

আমার হৃদ্‌পিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে। বিরাট ঝুঁকি নিয়েছি এখানে এসে। এ-বার বোধ হয় আমার দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হবে। গন্তব্যের এত কাছে পৌঁছে তর সইছে না আর। রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে ডান হাতে পিস্তল বের করলাম। বাঁ-হাতে রইল বউই নাইফ। চমক সৃষ্টি করতে হবে। ক্যাম্পের ভেতর আমাকে আশা করবে না চৌকো-চোয়াল এবং এই সুযোগটাই আমি নেব। ঘ্যাচ করে তাঁবুর পেছনটা কেটে ফেললাম একটানে, ভেতরে ঢুকেই পিস্তল তাক করলাম ওর দিকে। একটা চেয়ারে বসেছিল চৌকো-চোয়াল, ওখানেই জমে গেল– যেন পেরেক পুঁতে আটকে দেয়া হয়েছে ওকে।

'চেঁচাতে পারো,' বললাম আমি, 'তবে তোমাকে দেখে মনে হয় না তুমি অতটা বোকা।'

অনড় বসে রইল সে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, বার দুয়েক পলক ফেলল, তবে আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ওর।

'তোমার স্ত্রীকে আমি খুন করিনি,' বলল চৌকো-চোয়াল।

'হতে পারে,' বললাম আমি। 'তুমি খুন করে থাকলে, তোমাকে দুটুকরো করে ফেলব। তবে তার আগে আমরা এখন অন্য একটা ব্যাপারে ফয়সালা করব।

'তোমাদের কয়েকজন লোক টিবির ও-পাশে আমার দুটো ঘোড়া আটকেছে। ওখানে গিয়ে আমার পক্ষে আনা সম্ভব নয়, কাজেই আমাকে দুটো ঘোড়া আর চার দিন চলার মত খাবার দেবে তুমি।

'ওই গার্ডকে ডেকে বলো,' আমি বললাম, 'একটা স্যাডল এবং একটা প্যাক হর্স নিয়ে আসতে। তাড়াতাড়ি করতে বলবে।

'আর একটা কথা। আমি জানি ইচ্ছে করলে তুমি ওকে সাবধান করে দিতে পারো। সে-ক্ষেত্রে আমি ধরা পড়ব– কিন্তু তোমার লাশও এখানে পাবে ওরা। একটু আগেই বলেছ, তুমি আমার স্ত্রীকে খুন করোনি। তা হলে কেন মিছেমিছি অন্যের জন্যে নিজের প্রাণটা খোয়াবে?'

'ওসমান, তুমি একটা বোকা। ঘোড়া নিয়ে এখান থেকে চলে গেলেই তো পারো– তোমার কোনও চান্স নেই– জিততে পারবে না।'

'ঘোড়া আনতে বলো!'

সাবধানে চেয়ার ছেড়ে তাঁবুর দরজার কাছে গেল চৌকো-চোয়াল। 'ড্যাঙ্গার? স্যাডল চাপিয়ে দুন গেলডিংটা নিয়ে এসো। অ্যালের বাড়তি স্যাডলটা দেবে। আর একহপ্তার খাবারসহ একটা প্যাক হর্স। জলদি।'

ফিরে এসে বসল সে। 'মনে হয় না পারবে, তবু দেখ চেষ্টা করে। আমার কথা শোনো, এই তল্লাট ছেড়ে পালাও।'

'তুমি কোনও মেয়েকে খুন করতে পারো দেখে মনে হয় না।'

চকিতে ওর মুখ সাদা হয়েই আবার রঙ ফিরে এল। রেগে গেছে। 'এমন কিছু ঘটেছে বলে আমার জানা নেই।'

'ঘটেছে।' হাতের ইশারায় তাঁবুর দরজাটা দেখিয়ে বললাম, 'তোমার লোক ড্যাঙ্গার তখন খুব কাছেই ছিল।'

'তুমি দেখছি সব খবরই জানো?'

'ওদের কথা শুনতে পেয়েছিলাম। আমার খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল ওরা।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম আমরা, তবে আমার কান ব্যস্ত রয়েছে। ক্যাম্পের কোথাও কোনও সাড়া নেই। বাইরে তাকাতে পারছি না, তা হলে ওর ওপর থেকে নজর সরাতে হয়। তাই ঝুঁকি নেওয়াই সাব্যস্ত করলাম।

পিস্তলটা বাঁ-হাতে নিয়ে উইনচেস্টারটা নামালাম কাঁধ থেকে। রাইফেলের আওতায় আনলাম ওকে, তারপর পিস্তল কোমরে গুঁজলাম। বিছানায় আর একটা কোল্ট পড়েছিল, তুলে নিলাম ওটা।

'তুমি বরং এই ফাঁকে একটা বিক্রয়পত্র লিখে ফেলো,' বললাম আমি।

'কিছুই তোমার নজর এড়ায় না দেখছি,' বলল ও। 'এত বুদ্ধিমান, তবু এই আগুনে হাত দিচ্ছো কেন?'

'মিস্টার, ওই মেয়েই ছিল আমার সব কিছু। খুন করা হয়েছে ওকে। এখন আর আমার নিজের জীবনের প্রতি মায়া নেই, আমি চাই বদলা নিতে। আমার বিশ্বাস, খোঁজখবর করলে ওই লোকের ব্যাক ট্রেইলে ড্রুসিলার মত আরও অনেক মেয়ের লাশ মিলবে।'

ঝট করে ঘাড় ফেরাল চৌকো-চোয়াল, নীল চোখজোড়া কঠিন হয়ে উঠেছে। 'এ-রকম ভাবার কারণ?'

'ওর আচরণই বলে দিচ্ছে ও একটা খুনী। প্রথমে মনে হয়েছিল যা করছে, ভয়ে করছে– কিন্তু এখন আর তা ভাবতে পারছি না। মনে হচ্ছে অনেকদিন ধরে এই কায়দা চালিয়ে আসছে সে। বহু লোক নিখোঁজ হয়েছে এখানে, কে তাদের হদিস রাখে বলো?'

'আমার ধারণা, এই লোকের বয়স একেবারে কম নয়। ধূর্ত, এবং দাগী।'

নিচু স্বরে কথা বলছিলাম আমরা, ঘোড়ার পদশব্দ কানে আসতে একটা আঙুল মুখে তুললাম আমি, নিমেষে চুপ করল চৌকো-চোয়াল। তাঁবুর বাইরে খুরের আওয়াজ থামল, পরমুহূর্তে ড্যাঙ্গারের গলা ভেসে এল।

'মি. প্রিটস, ঘোড়া এনেছি।'

'ভেতরে আসতে বলো ওকে,' চাপা কণ্ঠে বললাম আমি।

'ড্যাঙ্গার, শুনে যাও।'

ঢাকনা সরিয়ে তাঁবুতে ঢুকল ড্যাঙ্গার, শক্ত-সমর্থ হাসিখুশি চেহারার কাউ পাঞ্চার। মাথায় ঝাঁকড়া কালো চুল। প্রথমে আমার, তারপর ওর বসের দিকে তাকাল সে। 'আচ্ছা, এই ব্যাপার! আমিও ভাবছিলাম প্যাক হর্সটা আবার কেন।

বস্, ওকে দেখব নাকি এক হাত?'

'না, ড্যাঙ্গার। জানো বোধ হয়, ওর নামই ওসমান।'

মুখ খুললাম আমি। 'ড্যাঙ্গ, তোমার সাথে আমার কোনও ঝগড়া নেই। আমাকে মারার জন্যে কে তোমাকে হুকুম দিয়েছিল তার নামটা শুধু দাও।'

ড্যাঙ্গারের গালে ভাঁজ পড়ল। 'না বললে কী করবে শুনি? গায়ে-গতরে আমি তোমার চেয়ে নেহাত কম নই। তুমি যদি দশটা মারো, অন্তত একটা মারতে পারব। লোকজন তাতে জেনে যাবে, কী হচ্ছে এখানে। আমি হলে কিন্তু ধরা দিতাম।'

'আর সেই সুযোগে তোমার বস্ আমাকে ঝুলিয়ে দিক? সেও তো ঠিক এ-ই চায়, ড্যাঙ্গ। চায় এ-ব্যাপারে তোমরা তাকে সাহায্য করো। নিজের কলঙ্ক ঢাকতে চায় সে।'

'ওসমান এখান থেকে চলে যাচ্ছে, ড্যাঙ্গ। ওকে বাধা দেবে না,' বলল প্রিটস। 'যেখানে আমি নিজেই জানি না ব্যাপারটা আসলে কী– খামোকা একজন ভাল লোককে হারাই কেন।'

উঠে দাঁড়ালাম আমি, কেশে পরিষ্কার করলাম নিজের গলা, তারপর বললাম, 'আমার বিশ্বাস তুমি নির্দোষ। এই প্রিটসও তাই। ওর মুখে কোনও খামচির দাগ নেই, কয়েক হপ্তা আগে যখন প্রথম দেখি ওকে তখনও ছিল না। কবর দেওয়ার আগে ড্রুর নখ পরীক্ষা করেছিলাম আমি। বাধা দিয়েছিল ও...চামড়া, মাংসের কণা লেগেছিল নখে।'

মুহূর্তের জন্যে থামলাম আমি, কান খাড়া। মনে হলো কেউ যেন আসছে। 'ড্যাঙ্গার, তোমাকে দেখে সৎ, বিশ্বস্ত লোক বলেই মনে হয়,' বললাম। 'একটা অবলা মেয়েকে খুন করতে যার বাধে না এতটুকু, এমন লোকের হয়ে পিস্তল ধরো না।'

ওর চোখদুটো একটুক্ষণ স্থির হয়ে রইল আমার মুখে, তারপর পিছিয়ে তাঁবুর বাইরে গিয়ে ঢাকনাটা তুলে ধরল। প্রিটসকে আগে যেতে বলে ওদেরকে অনুসরণ করলাম আমি।

চমৎকার রোদেলা সকাল। বসন্ত সমাগত, শীত কাটেনি। ওম-জড়ানো আবহাওয়া। চাক ওয়াগন থেকে মৃদু কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে।

'চলে যাচ্ছি আমি। অন্যদের বলেছি, এখন তোমাকেও বলছি... সরে যাও। আমার পথে দাঁড়ালে খুন করব।'

'এই গরুগুলোই আমার একমাত্র মূলধন,' বলল প্রিটস। 'প্রতিটা পাই-পয়সা লাগিয়েছি ওদের পেছনে। এগুলো হারালে আমি ফকির হয়ে যাব।'

'তুমি ভেবে দেখ, মিস্ট্যার, কী করবে। আমাকে মেরে পার পাবে না ওরা। সারা দেশে কম করে হলেও আরও পঞ্চাশ ঘর ওসমান আছে। একশোও হতে পারে। ওরা শুনবে এ-ঘটনা, পিলপিল করে ছুটে আসবে সবাই। প্রিটস, হয়তো আমার কথা বিশ্বাস হবে না তোমার, হয়তো এর কোনও অর্থই হয় না, কিন্তু যখন কেউ ওসমানদের সাথে লাগতে যায়,

পরিণামে নিজের ধ্বংসই ডেকে আনে সে।

'তুমি ওর সঙ্গ ত্যাগ করো, নইলে তুমিও ডুববে। কারণ আমি ওকে শেষ করব। যখন দরকার হবে, পালাব; যখন পারব, লড়ব, কিন্তু আর যা-ই করি, হাল ছাড়ব না। অন্যের চেয়ে আমার নার্ভ বেশি শক্ত, সে-জন্যে নয়– আসলে আমি ততটা চালাক নই বলে। কেউ আমাকে শেখায়নি কখন থামতে হয়।'

অদূরবর্তী তৃণভূমির দিকে ইঙ্গিত করলাম, একপাল গরু চরছে ওখানে। 'মিস্টার, এগুলো ছাড়াও বাঁচতে পারবে তুমি। কিন্তু বুলেট কাউকে রেয়াত করে না।'

'আমরা কি পিস্তল ফেলে দেব?' জিজ্ঞেস করল প্রিটস।

'না...আমি চাই না গোলাগুলি শুরু হলে কেউ বলুক একজন নিরস্ত্র লোককে আমি খুন করেছি। কেবল হাতটা সরিয়ে রাখলেই চলবে।'

এরপর আমি ঘোড়াসহ চাক ওয়াগনের কাছে গেলাম। সহজ ভঙ্গিতে রাইফেলটা বাবুর্চির দিকে তাক করে বললাম, 'এক গ্যালন কফি আর ওই স্যান্ডউইচটা দাও। তুমি হুইস্কি ভালবাসো?'

'হ্যাঁ– কেন?'

'ওগুলো আমাকে দিয়ে সরে যাও– না হলে তোমার পেট ফুটো করে দেব। সব হুইস্কি বেরিয়ে যাবে।'

ওখানে দাঁড়িয়ে স্যান্ডউইচ আর কফি খেলাম আমি, তারপর একটা সদ্য-বানানো বড় অ্যাপল পাই তুলে নিয়ে তিন কামড়ে সাবাড় করলাম সেটা। যখন কফি খাওয়া শেষ হলো, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে লাফিয়ে স্যাডলে উঠলাম। তারপর চোখ কুঁচকে তাকালাম ওদের দিকে।

'মি. প্রিটস,' বললাম আমি, 'গ্লোব ভাল জায়গা। তোমরা বরং ওখানেই চলে যাও।'

কাছেই দাঁড়িয়েছিল র‍্যাংগলার। চোখজোড়া জ্বলছে ধক্‌ধক্‌ করে। বোঝা যাচ্ছে কোনও ব্যাপারে চিন্তিত সে। বোধ হয় ভাবছিল ভবিষ্যতে সে যখন কোনও ক্যাম্প ফায়ারের আলোচনায় বন্ধুদের ঘটনাটা বলবে, তখন কেউ তাকে বেমক্কা প্রশ্ন করতে পারে এ-ব্যাপারে তার কী ভূমিকা ছিল। কাজেই বীরত্ব জাহিরের সিদ্ধান্ত নিল সে।

গান বেল্ট ঝুলছিল ওর কোমরে। হয়তো এক-আধটু অনুশীলনও করে থাকবে জঙ্গলে। আমি রওনা দেব, আচমকা পিস্তলের বাঁট চেপে ধরল র‍্যাংগলার।

লোকটা নেহাত বোকা। ডান হাতে উইনচেস্টার ধরেছিলাম আমি, ও পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতেই ব্যারেলটা একটু তুলে ওর কাঁধে গুলি করলাম। সহজ কাজ... মাত্র আঠারো ফুট দূরের টার্গেট।

আধপাক ঘুরে কাত হয়ে পড়ে গেল র‍্যাংগলার। বিহ্বল দৃষ্টিতে দেখছে আমাকে, কল্পনাও করেনি ওর এ-দশা হতে পারে।

'তোমার কাজ ঘোড়া দেখাশোনা করা– তাই করো।' বলে আর এক

মুহূর্ত দাঁড়ালাম না ওখানে। গুলির আওয়াজে ছুটে আসবে সবাই।

যখন পেছন ফিরে দেখলাম ক্যাম্পটা আর দেখা যাচ্ছে না, তখন জোর কদমে ঘোড়া ছোটালাম। যথেষ্ট ভেলকি দেখিয়েছি, কিন্তু তাই বলে এক সঙ্গে চল্লিশজন, কিংবা তার অর্ধেকও মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

আশা করি এখন ওদের সুমতি হবে। পশ্চিমের প্রায় লোকের আছে এটা। জানে যখন কোনও লোক পিস্তল বের করে, সেটা ব্যবহারও করে সে। অতএব তাকে ঘাঁটাতে যাওয়া বোকামি। র‍্যাংগলারের পরিণতি দেখে ওদের সুবুদ্ধি হওয়া উচিত।

রাতে পাইন ক্রীকের প্রাকৃতিক সেতুর নীচে ক্যাম্প করলাম আমি। মাত্র দুমাইল দূরে বাকহেড মেসা– ড্রুসিলার কবর। ঠাণ্ডা স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে শুয়ে আছি। ঘুম আসছে না, ড্রুর ঢলঢলে মুখখানি মনে পড়ছে বারবার।

ওইরকম ভয়ঙ্কর মৃত্যু কারও কাম্য হতে পারে না। আমি ওকে ওভাবে রেখে না এলে হয়তো এখনও বেঁচে থাকত ও। এক-এক সময়ে এ-জন্যে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয় আমার। কিন্তু তারপর ভাবি, অতীতে বহুবার একা রেখে এখানে সেখানে গিয়েছি আমি, এবং ফিরে এসে আবার মিলন হয়েছে আমাদের। আসলে এই সবই বোধ হয় আমার ভাগ্য– যদিও দুর্ভোগ্য।

কাল আমি ফুল দেব ওর কবরে। তারপর খুঁজতে বেরোব আমার কাঙ্ক্ষিত লোকটিকে।

ওর নাম ভিক্টর...

বারো

গুহায় আসার পথে নিজের ট্রেইল ঢাকার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছি আমি। যে-সব জায়গায় পাহারাদার থাকা সম্ভব– পাহাড়ী খাঁজ চুড়ো সব কিছু জরিপ করে, তারপর বনের ভেতর দিয়ে লুকিয়ে এসেছি। সম্ভবত দেখতে পায়নি কেউ, তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। এর আগে যতবার নিজেকে নিরাপদ বলে মনে করেছিলাম, ওরা ঠিকই এসে পড়েছিল। তবে পাইন ক্রীকের রাস্তা দুর্গম, ক্যানিয়নের গহিন জায়গায় অবস্থিত; নজর রাখা কঠিন– আঠার মত লেগে থাকতে হবে আমার পেছনে।

ভিক্টরের দিন ফুরিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই সেও অনুভব করছে তা, স্নায়ুর চাপে ভুগতে শুরু করেছে।

স্যাডল হর্সটা চমৎকার, স্বীকার করলাম মনে মনে। প্রিটস বিক্রয়পত্র লিখে দিয়েছে, কাজেই ঘোড়া চুরির দায়ে ফাঁসাতে পারবে না আমাকে।

অ্যাল য্যাবরিসকিকে দেখলাম। কিন্তু রোমেরো, সনোরা মেকন এরা

কোথায়? একটা অস্বস্তি খচ্ খচ্ করতে লাগল মনের ভেতর।

ভোরের আগেই রওনা হলাম আমি। পথে কিছু বুনো ফুল সংগ্রহ করে বিছিয়ে দিলাম ড্রুসিলার কবরে গিয়ে। তারপর ঘোড়ার কাছে যাব বলে ঘুরতেই হঠাৎ চমকে উঠলাম।

তিনজন অশ্বারোহী, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে...

পালানোর সুযোগ নেই, আমিও চাই না পালাতে। ওরা যদি মোকাবেলা করতে চায়– করবে। চট করে আমার ঘোড়ার আড়ালে চলে গেলাম, উইনচেস্টারের নল রাখলাম জিনের ওপর, চোখ ফোর সাইটে।

ওরা এখনও দেখতে পায়নি আমাকে। গজ তিরিশেক দূরে রয়েছে, তিনটে ঘোড়াই লেযি এ মার্কার।

'আমাকে খুঁজছ?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

রাশ টানল ওরা। একজন পিস্তলের বাঁট চেপে ধরল, ট্রিগার টিপলাম আমি, স্যাডল থেকে পড়ে গেল লোকটা। চকিতে হাঁটু গেড়ে বসে গুলি করলাম আবার, লেভার টেনে বুলেট পাঠালাম চেম্বারে। তারপর আর একটা গুলি করলাম।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা ইতিমধ্যে সামলে উঠেছিল ওরা, পাল্টা জবাব দিল। পয়লা গুলিতে যাকে ঘায়েল করেছিলাম সে পড়ে আছে মাটিতে। কর্ণধারের অভাবে দিশেহারা হয়ে অন্যদের সামনে চলে এসেছিল ওর ঘোড়াটা, ফলে নড়ে গেল ওদের লক্ষ্য।

ফের গুলি করলাম আমি। উর্ধ্বশ্বাসে জঙ্গলের ভেতর ছুটে পালাল ওরা। বাঁ-হাতে স্যাডল হর্ন ধরে ঝুলছে একজন, নেতিয়ে রয়েছে ডান হাতটা, অকেজো হয়ে গেছে।

রাইফেল বাগিয়ে এ-বার আমি আহত লোকটার কাছে গেলাম। মারাত্মক চোট, এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে বুক। সুন্দর স্বাস্থ্য ওর। লম্বা-চওড়া। মুখ দাড়ি-গোঁফের অরণ্যে ঢাকা। জ্ঞান আছে, ঘোলাটে চোখে তাকাল।

'মারা যাব?' ফ্যাসফ্যাসে গলায় জিজ্ঞেস করল ও।

'আমাকে মারতে এসেছিলে– আর কী আশা করো।'

ওর পিস্তলটা কুড়িয়ে নিলাম আমি। নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে তাকালাম এদিক ওদিক, সম্ভব হলে ওকে নিয়ে গিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করব। হতে পারে আমার শত্রু, হত্যা করার উদ্দেশ্যেই এসেছিল– তবু মানুষ তো। একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিল লোকটার ঘোড়া, আমি গিয়ে ওর উইনচেস্টার আর স্যাডল ব্যাগটা তুলে আনলাম।

'তোমাকে শেষ করবে ও,' বলল আহত লোকটা।

কোনও জবাব দিলাম না আমি, পাঁজাকোলা করে ওকে নিয়ে গেলাম একটা ঝোপের ভেতর। 'ওসমান,' আবার বলল সে, 'ভিক্টর নতুন প্ল্যান এঁটেছে।'

'কী প্ল্যান?'

'ফাঁদে পড়ে গেছ তুমি। যত চেষ্টাই করো, আর পালাতে পারবে না। তোমাকে ঘিরে ফেলেছে ওরা– এখন জাল গোটাবে।'

'অসম্ভব– ওর এত লোক নেই।'

খড়ির মত সাদা হয়ে গেছে লোকটার মুখ, ব্যথায় ঘামছে, টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে হাঁ করে। 'প্রায় একশো অ্যাপাচিকে দলে টেনেছে...' গলা ধরে আসছে ওর, কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে, কাশতে কাশতে একদলা রক্তবমি করল। 'ওদেরকে রাইফেল... আর হুইস্কি দেবে বলেছে।'

অ্যাপাচি...

হ্যাঁ, এতে ওর মতলব হাসিল হবে। গোটা তল্লাট হোয়াইট মাউন্টিন আর টনটো অ্যাপাচিদের নখদর্পণে। নিজের হাতের রেখার মতই এখানকার সব কিছু চেনে– এটা ওদের এলাকা। মানসপটে পরিষ্কার দেখলাম, একদল নেকড়ে চারদিক থেকে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসছে– মাঝখানে আমি একা, অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে।

আমার সামনেই মারা গেল লোকটা। ওর চোখের পাতা বুজিয়ে দিলাম আমি।

তারপর জিনে চেপে চলে এলাম ওখান থেকে। পশ্চিমে ছুটছি; দ্রুত, এক নাগাড়ে। নিচু এলাকা দিয়ে যাচ্ছি আমি, কোনও জনমনিষ্যির ছায়ামাত্র নেই কোথাও। তবে দুবার, বহুদূরে দুটো ধোঁয়ার সঙ্কেত চোখে পড়ল...

রুক্ষ এবড়োখেবড়ো অঞ্চল, প্রতিপদে বাধা বিপত্তি, সাবধানে চলাও দায়, কিন্তু আমার এখন একমাত্র সম্বল গতি। বাঁচতে হলে তাড়াতাড়ি পালাতে হবে। ডেড কাউ ক্যানিয়নে পৌঁছে দক্ষিণে বাঁক নিলাম আমি, ম্যাযাৎসাল মাউন্টিনের নির্জন প্রান্তর ধরে ছুটে চললাম একাকী।

উত্তপ্ত দিন। হাওয়া নেই। ভোরের কোমলতা বহু আগেই হারিয়ে গেছে। চড়াই ভাঙতে হিমশিম খাচ্ছিল আমার ঘোড়া দুটো, একটা ক্যাকটাস-ঢাকা খাঁজের ঢালে রাশ টানলাম। একটু বিশ্রাম দেব ওদের, এবং এই সুযোগে আমিও জরিপ করতে পারব এলাকাটা।

চারিদিকে রঙ-বেরঙের বিচিত্র ফুল, দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। দুদণ্ড বসতে পারলে মন ভরতো, কিন্তু এখন সে-সময় নেই।

দিগন্তে নীল দেয়াল তুলে পর্বতমালা দাঁড়িয়ে। অদূরে অসংখ্য ছায়াচ্ছন্ন ক্যানিয়ন। দূরে-কাছে, সর্বত্র আমার সজাগ চোখ ঘোরাফেরা করছে– দেখছি, খুঁজছি।

পাহাড়ী অ্যাপাচিরা ভয়ঙ্কর; দুর্ধর্ষ। লড়াইতে ওদের জুড়ি নেই। নিজেদের কাজ ওরা ভালই বোঝে। এদের মতিগতি আন্দাজ করা ভার; যখন মনে হবে বহুদূরে আছে, হয়তো ঠিক তখনই অতর্কিত হামলা আসবে। শত্রুরা সংখ্যায় এত বেশি যে আমার সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা আছে... একটা কোনও জায়গা খুঁজে পেতে গা ঢাকা দিতে পারি সেখানে; কিংবা এখান থেকে বেরোনোর জন্যে শত্রুব্যূহ ভেদ করার চেষ্টা চালাতে পারি। যদি সফল হই,

কাছাকাছি কোনও সেনা ফাঁড়ি বা গ্লোব অথবা প্রেসকটে গিয়ে অপেক্ষা করব। তারপর অ্যাপাচিদের খাঁই মেটাতে মেটাতে ভিক্টর যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, বিদায় করে দেবে ওদের, তখন ফিরে আসব আবার। তবে পালানোর সুযোগ নেই বললে হয়। আর, কোথাও যে লুকোব তেমন জায়গাও দেখতে পাচ্ছি না– এই অঞ্চলে এমন কোনও গুহা, বা গোপন জায়গা নেই যার খবর অ্যাপাচিরা জানে না।

দূরে একটা সরু ধোঁয়ার রেখা উঠল, কাছেই ধূলিঝড় উঠেছে এক জায়গায়। লাগাম ধরে খাঁজের মাথায় উঠলাম আমি, তারপর স্যাডলে কুঁজো হয়ে বসে ক্যাকটাস রিজ পেরিয়ে উত্তরে যাত্রা করলাম– নব মাউন্টিনের উদ্দেশে।

প্রিটসের কথাই ভাবছি। দৃঢ়চেতা লোক, তবে মোটামুটি বন্ধুসুলভ ব্যবহার পেয়েছি। ভিক্টরের কীর্তিকলাপের প্রতি ওর সমর্থন নেই, এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। ভিক্টর লোকটা এখনও আমার কাছে একটা হেঁয়ালিই রয়ে গেছে। হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ল। ড্রুসিলার মত আরও বহু মেয়ের সর্বনাশ হয়েছে আমি এই সন্দেহ প্রকাশ করায় প্রিটস ভীষণ চমকে উঠেছিল, যেন তারও এ-রকম একটা কিছু সন্দেহ।

যাকগে, এখন অন্যের ভাবনা ভাবলে চলবে না। বাস্তবকে স্বীকার করতে হবে। ওরা আমাকে খুঁজছে– ওকে নয়। অপরাধীকে ধরা দূরের কথা, নিজের প্রাণ বাঁচানোই মুশকিল হয়ে পড়েছে। আমি একা, অন্যদিকে শত্রুরা অগণিত, এত যে জেতার আশা করাই বোকামি, তবু আমি যাকে খুঁজছি তার দেখা পাইনি আজ পর্যন্ত– এমনকী ওই সামান্য নামটুকু ছাড়া আর কিছুই জানি না ওর ব্যাপারে। লোকটা এভাবে লুকিয়ে থাকছে কেন?

জীবনে কখনও কারও সাহায্য কামনা করিনি আমি, কিন্তু এ-বার তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। আমার আক্রমণে যাওয়ার সুযোগ নেই, এটা এখন একরকম পরিষ্কার– কোথাও গা ঢাকা দেওয়ার মত একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে।

নব মাউন্টিন পেরিয়ে মিডনাইট মেসার দিকে যাওয়ার সময় সামনে তিনজন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেলাম আমি। বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আমার দিকেই আসছিল, স্যাডলের ওপর রাইফেলটা আড়াআড়িভাবে রেখে মুখোমুখি হলাম।

আমাকে দেখে একটু ছড়িয়ে পড়ল ওরা। কিন্তু আমি এগিয়ে চললাম, লোকগুলোকে পাত্তা না দেওয়ার ভান করছি। আমার গলা শুকিয়ে গেছে, সমস্ত পেশী টানটান ধনুকের ছিলার মত। তিনজন কঠিন লোককে সামনাসামনি মোকাবেলা করতে অতি বড় সাহসীরও বুক কাঁপবে– তার ওপর যেখানে ভিক্টরের অনুচরেরা সবাই ভাড়াটে খুনে। কিন্তু ওই খাড়া ঢালে পালানোর কোনও পথ নেই বলে এগিয়ে চললাম নাক বরাবর।

রাশ টেনে ধরেছে ওরা, প্রত্যেকেই তৈরি, হঠাৎ লক্ষ করলাম আড়চোখে

আমার ঘোড়ার মার্কা দেখছে একজন... খেয়াল হলো এই দুন ঘোড়াটা লেযি এ বাথানের সম্পত্তি।

দাঁত কেলিয়ে হাসল লোকটা। 'আমরা তো ভড়কে গিয়েছিলাম,' বলল ও। 'ওসমান বলে মনে করেছিলাম তোমাকে।'

দুনের মার্কা দেখতে পেয়ে তিনজনই সহজ হয়ে গেল, কিন্তু আমি ভাবলেশহীন, রাইফেল প্রস্তুত। 'ঠিকই ধরেছিলে, আমার নাম ওসমান,' বললাম ওদের। 'হাতিয়ার ফেলে দাও।'

চমকে উঠল ওরা। দাঁত কিড়মিড় করছে রাগে, পারলে চিবিয়ে খায় আমাকে। হোলস্টারের কয়েক ইঞ্চি দূরে হাত কাঁপছে তিরতির করে, মওকা পেলেই পিস্তল বের করবে। কিন্তু শেষ-মুহূর্তে শুভবুদ্ধির জয় হলো। সকলেই পেশাদার অভিজ্ঞ লোক, জীবনে বহু ঘাটের পানি খেয়েছে, জানে কখন নিজের ইচ্ছাকে কাবু রাখতে হয়। কাঁপা কাঁপা আঙুলে গান বেল্ট খুলে ফেলল ওরা।

ওদেরকে তিরিশ গজ পিছিয়ে গিয়ে নামতে বললাম ঘোড়া থেকে। অনুগতটির মত হুকুম তামিল করল সবাই। গান বেল্ট আর ঘোড়াগুলো নিয়ে এলাম আমি। একটা স্যাডলব্যাগে খাবার ছিল, সেটা ছুঁড়ে দিলাম লোকগুলোর দিকে।

'খেয়ে,' বললাম আমি, 'ভার্দের দিকে হাঁটা দাও। পথে কারও দেখা পেলে ভাল– নইলে হেঁটেই ক্যাম্প ভার্দেয় চলে যেও।'

আমি ব্যবহার করতে পারব এ-ধরনের কার্তুজ ছিল দুজনের বেল্টে, খুলে নিলাম সেগুলো। হোলস্টারসহ খালি পিস্তল তিনটে ঝুলিয়ে রাখলাম একটা গাছের ডালে, কিন্তু রাইফেলগুলো নিজের কাছেই রেখে দিলাম। বলা যায় না, তাড়াহুড়োর সময়ে গুলি ভরার ফুরসত মিলতে নাও পারে।

এরপর ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এলাম ওখান থেকে। মাইল চারেক যাওয়ার পর ছেড়ে দিলাম ওদের ঘোড়াগুলো। ভালজাতের পশু, পথ চিনে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরতে পারবে। নির্ঘাত আমার চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করছে ওরা, তবে এ-জন্যে দোষ দেই না ওদের। দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় হাঁটতে কারোরই ভাল লাগার কথা নয়।

সেই রাত্রিটা আমি ওয়েট বটম ক্রীকের পেছন দিকে একটা পাহাড়ী ফাটলে যাপন করলাম। ওয়েট বটম নামে এক কাউ পাঞ্চার পড়ে গিয়েছিল এই ক্রীকে, সে-জন্যেই জায়গাটার ওই নামকরণ। ছোট করে আগুন ধরিয়ে বেকনের সুপ আর যবের রুটি তৈরি করলাম আমি। ফলে ভালই জমল রাতের খাওয়া।

ভোরে যখন ঘুম ভাঙল তখনও আকাশ ফরসা হয়নি পুরোপুরি। কম্বলের নীচ থেকে বেরিয়ে যাত্রার আয়োজন শুরু করলাম আমি। হঠাৎ একটা কোয়েলের ডাক কানে এল। খুঁতখুঁত করে উঠল আমার মন। এটা কোয়েলের রাজত্ব, নীল মেক্সিক্যান কোয়েল, কিন্তু ওই ডাকটা বেখাপ্পা– ঠিক ওদের মত

নয়। ঝটপট ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে শেষ করলাম বাঁধাছাঁদা।

ইতিমধ্যে আর একটা কোয়েল উত্তর দিয়েছে, এবং তারপর আরও একটা।

ক্রীকের পাশে, কটনউড আর সাইক্যামোর ঝাড়ের আড়ালে ক্যাম্প করেছিলাম আমি। মোটামুটি সমতল জায়গা। শান্ত মনোরম পরিবেশ, পাথরের ওপর দিয়ে কুলকুল শব্দে ঝরনাস্রোত গড়িয়ে পড়ছে। পাহাড়চুড়োয় দেখা দিয়েছে সূর্য। ঝরনায় রোদের ঝিলিমিলি, গাছপালার নীচে আলোছায়ার জাফরি-কাটা নকশা।

নীচে ক্যানিয়নের সুউচ্চ খাড়া দেয়াল, তলদেশে রোদ যায় না বললে হয়। আমার ক্যাম্পের লাগোয়া একফালি উন্মুক্ত ঘেসো জমি। লম্বায় আধ-মাইল, চওড়া এর তিন ভাগের একভাগ।

ঝরনার উল্টো দিকে, উত্তরে আর একটা ক্যানিয়নের মুখে গিয়ে শেষ হয়েছে জমিটা। আমার ডানে ওয়েট বটম ক্যানিয়নের ওপরের অংশ বুল স্প্রিং ক্যানিয়ন এবং একটা প্রাচীন ইন্ডিয়ান ট্রেইলের দিকে চলে গেছে।

লুকোনোর পক্ষে আদর্শ জায়গা। ভেবেছিলাম দিন কয়েক কাটাব এখানে। ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার পাশাপাশি নিজেও ঝরঝরে হয়ে উঠব। সেই ভয়ঙ্কর পতনের পর আমার সম্পূর্ণ শক্তি আজও ফিরে পাইনি আমি, যদিও আগের চেয়ে অনেকটা সুস্থ। ওরা যে আমার খোঁজ পেয়ে গেছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমি কি আদৌ বেরোতে পারব এই নরক থেকে?

ক্যানিয়নের নীচের দিকটাই বোধ হয় সবচেয়ে নিরাপদ হবে। সহজে কেউ ধাওয়া করবে না, অন্তত সুস্থ মাথায়। একজন রাইফেলধারী লোক অনায়াসে একটা বিরাট বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে ওখানে। কিন্তু একবার ক্যানিয়ন থেকে বেরোলে আমি ভার্দে উপত্যকায় গিয়ে পড়ব। লেযি এ কিংবা ইন্ডিয়ান টহলদারেরা নদীর পাড়ে মোতায়েন রয়েছে, এ-কথা হলফ করে বলা যায়।

ওই কোয়েলের ডাকগুলো সম্ভবত অ্যাপাচিদের। ওদের কাছ থেকে বৈরিতা ছাড়া আর কিছুই আশা করতে পারি না আমি। ওদের কেউ কেউ গতযাত্রায় আমাকে সাহায্য করেছিল সত্যি, কিন্তু এখন তার কোনও মূল্য নেই। কারণ ওই একই দলকে ভাড়া করেছে ভিক্টর এমন সম্ভাবনা কম– তা ছাড়া ওদের সামনে এ-বার প্রলোভন রয়েছে।

ঝড়ের আগে যেমন হয়, তেমনি থমথমে গুমট পরিবেশ। লাগাম দুটো হাতে নিয়ে আমি হেঁটে গেলাম ঘেসো জমির শেষপ্রান্তে, বাতাসে কান পাতলাম একটুক্ষণ, তারপর ঝরনায় নামলাম। ঠাণ্ডা টলটলে পানি, নীচে চ্যাপটা চাঁই আর নুড়িপাথর। শীতে এই জলধারা জমে যায়, বসন্তে আবার জেগে ওঠে। এখন পানির গভীরতা জায়গাভেদে আঠারো ইঞ্চি থেকে দুই ফুট। হাঁটু-পানিতে গিয়ে স্যাডলে চাপলাম আমি।

ডানে, অনতিদূরে মেসার কিনারা। নড়াচড়ার সুবিধার জন্যে রাইফেল স্ক্যাবার্ডে রেখে দিলাম। তা ছাড়া এখানে পিস্তল ব্যবহারের সুবিধাই বেশি, কোনও দিকেই দু-তিন গজের বেশি দৃষ্টি চলে না।

অলসচক্রে মাথার ওপর বিলি কাটছে একটা আশাবাদী শকুন। ছপ্ ছপ্ শব্দে পানি ভাঙছে ঘোড়াদুটো। কোথাও নড়াচড়ার আভাসমাত্র নেই। একা থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি আমি, তবু এই মুহূর্তে একজন সঙ্গীর উপস্থিতি কামনা করছি অন্তর থেকে, যে আমাকে সাহায্য করতে পারবে বিপদের সময়ে... প্রতিপক্ষ ভীষণ শক্তিশালী, দৈব সহায় না হলে আমার জীবনপ্রদীপ নিভতে আর বেশি দেরি নেই।

সূর্যকিরণে ঝিক্ করে উঠল রাইফেলের নল, নিমেষে সতর্ক হয়ে গেলাম আমি, মিশে গেলাম স্যাডলের সাথে, পেটে স্পারের গুঁতো খেয়ে লাফিয়ে আগে বাড়ল আমার দুন। পাহাড়ের দেয়ালে বিকট শব্দে আছড়ে পড়ল বুলেট, তারপর গুমগুম প্রতিধ্বনি উঠল ক্যানিয়নে। যে-জায়গায় গুলি লেগেছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকালাম সে-দিকে। জলসীমা থেকে বড়জোর চার ফুট ওপরে পাথরের চলটা উঠে সাদা হয়ে গেছে জায়গাটা। এর অর্থ, গুলিটা যে-ই করে থাকুক সে ও-পাশের পাহাড়ে রয়েছে।

গুলিটা ঠিক কোন জায়গা থেকে এসেছিল বোঝার চেষ্টা করছি, এমন সময় মাথা তুলল গুপ্তঘাতক– রাইফেল তাক করছে, অনেক দূরে রয়েছে ও, পিস্তলের আওতার বাইরে, তাই দেয়ালের দিকে সরে গেলাম আমি। হঠাৎ আর একটা জিনিস চোখে পড়ল, মাত্র বিশ ফুট দূরে, ঝরনাতীরে একজন ইন্ডিয়ান দাঁড়িয়ে আছে।

পানির ছপ্ ছপ্ আওয়াজে আমার অবস্থান ঠিকমত আন্দাজ করতে পারেনি ও, ঝোপ থেকে বেরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়েছিল। তারপর যখন নিজের ভুলটা ধরতে পারল তখন দেরি হয়ে গেছে। কোমরের কাছ থেকে আমি গুলি করলাম ওকে। দেখলাম ওর বুক ছ্যাঁদা করে বেরিয়ে গেল বুলেট। পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে গেল সে, তারপর ঝপাৎ করে মুখ থুবড়ে পড়ল পানিতে। আর এক মুহূর্ত নষ্ট করলাম না আমি, বাঁক ঘুরে ঝড়ের বেগে ছুটে চললাম ওয়েট বটমের চড়াই বেয়ে।

বুল স্প্রিং ক্যানিয়নের ট্রেইলে পৌঁছে, বাঁয়ে মোড় নিয়ে রওনা হলাম ওপরে– দুটো ঘোড়াকেই খাটাচ্ছি ভূতের মত। প্রায় একশো গজ যাওয়ার পর মন্থর করলাম গতি, এভাবে আর কিছুক্ষণ ছুটলে মারা পড়বে ওরা। মেসার মাথায় ট্রেইলটা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছে। এ-জন্যে প্রস্তুত ছিলাম আমি। অনুমান করেছিলাম ট্রেইল যেখানে ভাগ হয়ে গেছে সেখানে লোক থাকবে।

ঠিক তাই। লেযি এ-র তিনজন পাহারাদার রয়েছে। ধীর কদমে হাঁটছিল দুন, পুরু পাইন পাতার ওপর এতটুকু শব্দ নেই। ওদের দেখামাত্র ঘোড়ার পেটে স্পারের খোঁচা দিলাম আমি, চোখের পলকে তিনজনের মাঝখানে গিয়ে

পড়লাম, যেন নিক্ষিপ্ত কামানের গোলা।

টলে উঠল দুন, কিন্তু ভারসাম্য বজায় রেখেছে। একটা বুকফাটা মরণচিৎকারে খানখান হয়ে গেল প্রেইরির নৈঃশব্দ্য। দুনের ধাক্কায় মেসার কিনার টপকে চিরকালের মত খাদে হারিয়ে গেল একজন। আর একজনকে গুলি করলাম পয়েন্ট-ব্ল্যাংক। আচমকা টান পড়ল আমার কাঁধে, বুলেটের ঘষায় জ্বালা করে উঠল, আর একটু হলেই পড়ে যেতো পিস্তলটা– সামলে নিলাম।

ডানে ঘুরলাম আমরা। বড় বড় পাথরচাঁইয়ের আড়াল দিয়ে চলে এলাম ক্যানিয়নের ভেতর। প্রায় একই সময়ে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল দুটো বুলেট। কাঁধের জ্বলুনি বাড়ছে, চোট একেবারে সামান্য নয়, রক্তে ভিজে উঠেছে শার্ট। মুখখিস্তি করলাম আমি, আবার আমার ডানা ভেঙে দিয়েছে ওরা।

ফের একঝাঁক বুলেট ছুটে এল। অনুভব করলাম একপাশে কাত হয়ে যাচ্ছে দুন, চট করে লাফিয়ে নেমে পড়লাম আমি। ট্রেইলের দুদিকেই ধাবমান খুরের আওয়াজ, ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে দ্রুত আশ্রয় নিলাম পাথরের আড়ালে– হাতে উইনচেস্টার উদ্যত।

বাঁক ঘুরেই বিপদে পড়ল ওরা।

লম্বা ঘাস আর পাথরের মাঝে উপুড় হয়ে শুয়ে আছি আমি। দুপাশে ক্যাকটাস ঝোপ। হাতে চালু উইনচেস্টার। ক্ষিপ্র হাতে লেভার টেনে গুলি করলাম বার কয়েক, তারপর সিক্স-শূটার তুলে নিলাম।

ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল ওরা। একজন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাটিতে, পাশেই দাঁড়িয়ে ওর ঘোড়া– প্রাণহীন প্রভুর গা শুঁকছে। আর একজন দুহাতে স্যাডলহর্ন ধরে ঝুলছিল, পিঠ রক্তাক্ত, একসময় ধপ্ করে বালুর ওপর লুটিয়ে পড়ল।

এক দৌড়ে ট্রেইলে নেমে গেলাম আমি। তিনটে রাইফেল আর কার্তুজের বেল্ট ফেলে গিয়েছিল শত্রুপক্ষ, ওগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে এলাম আগের জায়গায়। হাঁফাচ্ছিলাম উত্তেজনায়, খানিক জিরিয়ে আরও ভেতরে সরে গেলাম।

আমাকে খুন করার জন্যে ভাড়া করা হয়েছে ওদের। এত সহজে সফল হতে দেব না আমি, টাকাটা ওদের খেটেই রোজগার করতে হবে।

শান্ত হয়ে বসে চারপাশের এলাকা জরিপ করলাম। দুদিক থেকে আমার ওপর চড়াও হতে পারবে ওরা, তবে সে-জন্যে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হবে।

আমাকে বাগে পেয়েছে, ঠিক। আটকে ফেলেছে ক্রীকের ওপর দিকে। আমার কাছে ঘোড়া নেই– কিন্তু মরার সময়ে, শপথ করলাম মনে মনে, বেশ কয়েকটাকে সাথে নিয়েই যাব।

ওরা সহজে আসতে পারবে না এখানে, তবে সম্ভবত ক্যানিয়নের দেয়ালের ওপর ওঠার চেষ্টা করবে। অতএব রাত ঘনালে যেভাবেই হোক সরে

যেতে হবে এখান থেকে।

এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, তারপর আর একটা। তেতে লাল হয়ে আছে সূর্য। আর একটুবাদেই এ-পাশে ছায়া পড়বে বলে ধন্যবাদ দিলাম নিজের ভাগ্যকে। কিন্তু এই সঙ্গে অসুবিধাও আছে কিছু। অন্ধকারে কোনও নড়াচড়া দেখতে পাব না আমি, এবং ওরাও সেটা জানে বলেই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে।

কোনও মানুষের ছায়াও দেখা যাচ্ছে না কোথাও... একটা গুবরে পোকা গুনগুন করছে ঝোপের ভেতর... সে-ই শকুনটা এখনও লেগে রয়েছে আমার পেছনে, কোলের ওপর ওর ছায়া পড়েছে। রাইফেলগুলো পরখ করলাম আমি, খালি চেম্বারে টোটা পুরলাম নতুন করে, তারপর সিক্স-শূটারটা চেক করলাম।

কাঁধের জ্বলুনি কমেছে কিছুটা। রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে ক্ষত থেকে। গলা শুকিয়ে গেছে আমার, পানি খেতে ইচ্ছে করছে, অথচ পারছি না– ক্যান্টিনটা ঘোড়ার সাথে রয়ে গেছে। সহসা মনে হলো পানি খাওয়ার সুযোগ বোধ হয় আর কখনও পাব না আমি। ওরা সত্যিকার অর্থেই এইবার আমাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। পেছনে বুলফ্রগ রিজের নিরেট দেয়াল, সামনে নদী, আধ-মাইল বা তার কিছু বেশি দূরে।

হঠাৎ ক্রুদ্ধ গুঞ্জন তুলে একটা বুলেট উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে, পাহাড়ে আঘাত হানল।

অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে এই কৌশলই অবলম্বন করেছিল সেনাবাহিনী। ইন্ডিয়ানরা এখান থেকে মাইলখানেক দূরে একটা গুহায় লুকিয়েছিল। সৈন্যরা কিছুতেই নাগাল পাচ্ছিল না ওদের, তাই গুহার পেছনের দেয়াল লক্ষ্য করে গুলি চালায়... এইধরনের বুলেটের বিধ্বংসী ক্ষমতা মারাত্মক, বেরোনোর পথ না পেয়ে উন্মত্তের মত ছোটাছুটি করে এদিক ওদিক। তখন সামনে কোনও মানুষ পড়লে তার বারোটা বেজে যায়, ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলে। পরে ওই গুহা পরিদর্শন করেছিল, এমন কয়েকজনের সাথে আমার আলাপ হয়েছে। ওদের কাছেই শুনেছিলাম কী বীভৎস কাণ্ড ঘটেছিল ওখানে।

একটা গর্তের সন্ধানে ডানে-বাঁয়ে তাকালাম আমি। একটা ফাটল দেখতে পেয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঢুকে গেলাম ভেতরে।

পরবর্তী আধ-ঘণ্টা অবিরাম গোলাগুলিতে আমার কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো। ভোঁতা ক্রুদ্ধ হিংস্র গর্জনে একের পর এক সীসা ছুটে আসছে, পাথরকুচি উড়ছে চারদিকে। গুটিসুটি মেরে আরও ছোট করে ফেললাম নিজেকে। এখন যদি ওরা সদলে ধেয়ে আসে, নির্ঘাত কাবু করে ফেলবে আমাকে। সময়মত বেরিয়ে রুখে দাঁড়াতে পারব না আমি। তবে আশার কথা, ওরা দূরে রয়েছে– আমার এই দুর্গতির কথা জানে না।

ধুলো পড়েছে চোখে, খচ্ খচ্ করছে। বার কয়েক গায়ে পাথরকুচি বিঁধল, তবে ফাটলটা ঢালের প্রায় লাগোয়া বলে কোনও বুলেট কাছে ঘেঁষতে পারছে না। যেভাবে আমি গুটিয়ে আছি তাতে গুলি লাগলে রীতিমত আশ্চর্যের ব্যাপার

হবে সেটা। কিছুক্ষণ বাদে হাল ছেড়ে দিল ওরা। আমি বেরিয়ে এলাম গর্ত থেকে, নদীতীরের যে-জায়গায় বসে গুলি ছুঁড়ছিল শত্রুপক্ষ সেটা জরিপ করলাম। দেখতে পেলাম না কাউকে, আমার উপস্থিতি ওদেরকে জানান দেওয়ার জন্যে একটা ফাঁকা আওয়াজ করলাম।

বেলা ডুবুডুবু। সূর্য পশ্চিমে, পাহাড়ের ও-পাশে হেলে পড়েছে। অস্তরাগে আকাশ লাল। মরুভূমিতে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না গোধূলি, একটু বাদে ঝুপ করে আঁধার নামল। তারা ফুটছে একটা দুটো করে। দূরে কয়োট ডাকছে। ত্রস্ত চোখে লুকোনোর জায়গা খুঁজছি আমি। অন্তর থেকে উপলব্ধি করছি চরম মোকাবেলার সময় এসে পড়েছে। আমাকে ঘেরাও করে ফেলেছে ওরা। পালানোর পথ নেই। যে-হারে গুলি হচ্ছিল তাতে মনে হয় ওদের দলে কমপক্ষে বারোজন, বা তার চাইতেও বেশি লোক আছে। এদিকে আমি নিরুপায়; আমার দুন গেল্ডিং নিহত হয়েছে, প্যাক হর্সটাও পালিয়েছে–এতক্ষণে হয়তো কয়েক ক্রোশ দূরে চলে গেছে।

মৌন মরু-রাত। থেকে থেকে ওদের কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি কেবল। ক্যাম্প ফায়ারের ধোঁয়ার গন্ধ নাকে আসছে। একবার মনে হলো বেকন ভাজা আর কফির সুবাসও যেন পেলাম। আচমকা চাগিয়ে উঠল আমার খিদে, সারাদিন না-খাওয়া।

খাবারের কথা মনে হলেই খিদে বাড়ছে। আমাকে ওরা বাগে পেয়েছে ঠিক, কিন্তু ভরা পেটে মরতে পারলেও সুখ হত। দেখব নাকি একটা চেষ্টা করে? ভাবলাম। চুপিসারে হানা দেব ওদের ক্যাম্পে, আর একান্তই যদি প্রয়োজন হয়– করব গুলি। আমারও পেট ভরবে তা হলে... সীসে খেয়ে।

বেশ রাত করে একজন অশ্বারোহী এল। কুশল বিনিময় করল ওরা। শুনলাম লোকটা বলছে, '... জবর লড়াই! ছোঁড়াদুটো কোত্থেকে এসেছে জানি না, কিন্তু এসেই তুফান ছুটিয়ে দিয়েছে।'

'কোথায়?'

'সলোমনভিলে। পিট রাইল্যান্ড আর কলিন্সকে নিয়ে ডডি ভিক্টর গিয়েছিল ওখানে। এমনি ঘুরতে গিয়েছিল ওরা, ডডি কেমন তুমি জানোই। ওর চাচা একজন ধনী গরু ব্যবসায়ী, নিজেকেও তাই ভাবে সে। বা ভাবত বলাই ভাল।'

'মারা গেছে?'

'চেঁচানোর সুযোগও পায়নি।'

'হঠাৎ এমন হলো কেন?'

'ডডি। ও-ই দায়ী। দুজন কঠিন লোককে সাথে পেয়ে সম্ভবত ওর সাহস বেড়ে গিয়েছিল, কেউকেটা ভেবেছিল নিজেকে। যাই হোক, ওই ছোকরাদেরকে ও পাহাড়ী ভূত বলে গাল দেয়।

'ওদের একজন আড়চোখে একবার কেবল দেখল ওকে, তারপর বলল, "গাল দিও না।"

'কিন্তু ডডি তখন বেহুঁশ। বলল টেনেসির লোকদের জন্যে জায়গাটা

সুবিধের নয়, গরম– একজনকে পাহাড়ে কোণঠাসা করে ফেলেছে ওরা, সকালে ফাঁসি দেবে।

'তখন ওই দুজনের মধ্যে যে-ছেলেটা সবচেয়ে লম্বা, সে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কি ওসমান নামের কাউকে খুঁজছ?" ডডিও ফস্ করে বলে বসল, হ্যাঁ। কলিন্স ওকে ইশারায় বারণ করেছিল বলতে, কিন্তু কে শোনে কার কথা। জানোই, ছোঁড়াটা একটা আস্ত মাথামোটা বাছুর। ডডির কথা শেষ হতেই এই ছেলেটা পিছিয়ে গিয়ে বলল, "তোমার সামনেই আছে দুজন।"

'থ হয়ে গেল ডডি, বুঝতে পারছিল না কী করবে। বেশি বকতে গিয়ে ফাঁদে পড়ে গেছে। হাবার মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল, ভয়ে আমসি হয়ে গেছে মুখ।

'এই পর্যায়ে রাইল্যান্ড নাক গলায়। ডডির কথায় কান না দেয়ার জন্যে ওদেরকে অনুরোধ জানাল সে। কিন্তু ওরা নাছোড় বান্দা।

' "ও-ই তো বলল, তোমরা সবাই ওসমানদের খুঁজছ," জবাব দিল ছেলেটা। "বেশ ভাল কথা, দুজন তোমাদের সামনেই আছে। আমি পিটার ওসমান, আর এ মিলটন।" '

'তারপর?'

'আবার কী, কাবার... তিনজনই। মোট চারটে গুলি হয়েছিল, তার মধ্যে দুটো হজম করেছে ডডি।'

এক মুহূর্ত আর কোনও কথা নেই, তারপর বিড়বিড় করে কেউ একজন বলল কিছু। ওর কথা বুঝতে পারলাম না আমি, তবে মনে হলো যেন গাল দিল কাউকে। একটু বাদে আর একজন মুখ খুলল, 'বস্ কী বলে এ-ব্যাপারে। ডডিকে নিয়ে খুব বড়াই করত সে।'

'রেগে কাঁই হয়ে গেছে। রুডি কী রকম লোক জানোই। ভীষণ বদমেজাজী, শুনে মাথার চুল ছিঁড়তে বাকি রেখেছে কেবল। অ্যালেনও খেপে উঠেছে। হাজার হোক, ডডি ওর ভাই।'

'সেরেছে! ধরতে পারলে ছোঁড়া দুটোকে নিশ্চয়ই কাঁচা চিবিয়ে খাবে অ্যালেন ভিক্টর। ভাগ্যিস, আমার নাম ওসমান না।'

'ভাগ্যিস, আমি অ্যালেন নই!' বলল সে-ই অশ্বারোহী। 'ওদের কারবার দেখনি তো।'

ফের কিছুক্ষণ গুম মেরে রইল ওরা, তারপর আর একটা গলা পাওয়া গেল, 'একটু কফি খেলে মন্দ হত না।'

বুঝলাম মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত, পালাতে চাইলে এইবেলা। যত খোলা কার্তুজ ছিল সব প্যান্টের পকেট আর কার্টিজ বেল্টের লূপে ভরলাম। আর একটা বেল্ট ব্যানডোলিয়ারের ঢঙে আড়াআড়িভাবে ঝোলালাম কাঁধে। তারপর আমার নিজের রাইফেল আর বাড়তিগুলো নিয়ে রওনা হলাম নিঃসাড়ে।

ওই দুই ওসমান ধাঁধায় ফেলেছে আমাকে। কাছাকাছি একমাত্র মোরাতেই একঘর ওসমান বাস করে– অন্তত আমার জানামতে। পিটার ওসমান নামটা

অবশ্যি পরিচিত– কিন্তু তার নিবাস ডেনেইস গ্যাপ। সম্পর্কে আমাদের চাচাতো ভাই।

এইমাত্র যে-কাহিনি শুনলাম তা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে ওরা যথার্থই ওস্মান। পুলক অনুভব করলাম, যাক, আমি তা হলে একা নই।

পা টিপে টিপে নদী তীরবর্তী সমভূমিতে নেমে এলাম আমি। লকলক করছে ওদের ক্যাম্প ফায়ারের শিখা, চারদিকে প্রচুর আলো ছড়িয়েছে। বেশিক্ষণ ওই আগুনের পাশে বসে গল্প করলে, হঠাৎ করে আঁধারে ভালমত দেখতে পাবে না ওরা। এবং সেই সুযোগে...

আচমকা আমার পায়ের কাছে পাতাল ফুঁড়ে একটা ইন্ডিয়ান আবির্ভূত হলো। আলোয় ঝিকিয়ে উঠল ওর ছুরির ফলা। অ্যাপাচির গায়ে রাইফেলের মাযল্ ঠেসে ধরলাম আমি, চাপ দিলাম ট্রিগারে।

ও লুটিয়ে পড়তেই রাইফেলটা তুললাম কাঁধ বরাবর, আগুনের পাশে-বসা লোকগুলোর উদ্দেশে চেম্বার খালি করলাম। নিমেষে হুলস্থুল পড়ে গেল ওদের মাঝে, কে কার আগে পালাবে। আমার পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল একটা ঘোড়া, খালি রাইফেলটা ফেলে দিয়ে ওর স্যাডল হর্নের দিকে হাত বাড়ালাম আমি।

ধরলাম ওটা, কিন্তু গা ঝাড়া দিয়ে আমাকে মাটিতে ফেলে দিল ও। বুলেটের ঘায়ে চারপাশের বালু উড়ছে, তাড়াতাড়ি আত্মগোপন করলাম পাথরের ভিড়ে। আবার আমাকে ফাঁদে আটকাল ওরা।

তবে আমিও প্রতিপক্ষের অন্তত কিছুটা ক্ষতি করতে পেরেছি। ওরা এ-বার থেকে মনে রাখবে সেটা। হামাগুড়ি দিয়ে পেছন থেকে রওনা হলাম আমি, একটু-একটু করে এগিয়ে যাচ্ছি চুড়োর উদ্দেশে।

রুডি ভিক্টর... আমি যাকে খুঁজছি এই প্রথম তার পুরো নামটা জানলাম; কিন্তু ও কোথায়, কীভাবে পৌঁছুব ওর কাছে? ক্লান্ত বোধ করছি, খিদে-তেষ্টায় ঝিঁঝি ডাকছে মাথার ভেতর, চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম একটা পাথরের বেষ্টনীতে। ভাবছি কী করা যায়। সকালে, নিঃসন্দেহে, আমাকে ছেঁকে ধরবে ওরা। এইসময় একটা ঘোড়ার প্রয়োজন ছিল, পেলে হয়তো ফাঁকি দিতে পারতাম ওদের।

একটু আগে আমি যেখানে নেমে গিয়েছিলাম, হঠাৎ দপ্ করে একটা আগুন জ্বলে উঠল সেখানে... শুকনো ডালপালা পোড়ার আওয়াজ শুনতে পেলাম স্পষ্ট। সামান্য বাঁয়ে জ্বলছে আগুনটা। তারপর ডানে আর একটা ধরে উঠল। দেখতে দেখতে পাঁচ জায়গায় আগুন ধরাল ওরা। দিনের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল গোটা এলাকা, ভার্দে নদীর কিনার অবধি সব কিছু দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। বুঝলাম ওই আগুনের পেছনে কোথাও ওত পেতে আছে একদল হায়েনা, এবং ওদের পেছনে আমার জীবন– একটা ঘোড়া!

নাহ্, এ-বার বোধ করি সত্যি সত্যিই পাকড়াও করবে আমাকে।

তেরো

চরম তিক্ততার মুখোমুখি আমি। শত্রুরা ঘেরাও করে ফেলেছে আমাকে– অথচ আমার পিঠ দেয়ালে। কিন্তু এ-মুহূর্তে আমি মৃত্যুভয় করছি না, শুধু একটি কারণে আফসোস হচ্ছে: ড্রুসিলার খুনী বেঁচে গেল। জীবনের স্বাদ খুব অল্পই পেয়েছিল ড্রু, অথচ শেষ-পর্যন্ত ও-ই কিনা আততায়ীর শিকার হলো, কাজ সেরে উচ্ছিষ্টের মত ছুঁড়ে ফেলে দিল ওর লাশ।

আর, রুডি ভিক্টর সমস্ত বিপদাপদের বাইরে থাকছে সর্বদা, আড়ালে রয়েছে যেন মুখোমুখি হলেও আমি চিনতে না পারি। আমার পালানোর একমাত্র যে-রাস্তাটা ছিল সেটাও আলোকিত করে তুলেছে আগুন। চুড়ো স্পর্শ করছে লেলিহান শিখা। এখন আর ওইদিকে যাওয়া সম্ভব নয়, দেয়ালের পটভূমিতে শত্রু রাইফেলের নিশানা হতে চাই না আমি।

ওদের কাহিনি সত্যি হয়ে থাকলে, আরও ওসমান এসে পড়েছে– এবং সে-ক্ষেত্রে আমার সাথে-সাথে ধামাচাপা পড়বে না সব কিছু। যেখানে আমার লাশ পড়বে, অন্যদেরও কবর হবে সেখানে। রুডি ভিক্টর জানে না সে-দিন গ্লোব থেকে আমাদের পিছু নিয়ে নিজের কোনও সর্বনাশকে দাওয়াত করেছে সে।

সতর্ক হয়ে গেলাম ক্ষীণ নড়াচড়ার শব্দে, চট করে সরে গেলাম একপাশে। এগিয়ে আসছে ওরা। এত কাছে থেকে রাইফেলে সুবিধে হবে না, এটা পিস্তলের কাজ।

চকিতে আর একটা জিনিসের কথা খেয়াল হলো। পাথরের মাঝে একটা লম্বা মরা গাছের ডাল দেখতে পেয়েছিলাম আমি। হাত বাড়িয়ে ধরলাম ওটা, সাবধানে তুলে নয়-দশ ফুট দূরের একটা ঝোপ নাড়ালাম। এক মুহূর্ত পর, খুব আলতোভাবে পাতার ওপর দিয়ে টেনে আনলাম ডালটা, প্রার্থনা করছি আওয়াজটা যেন ওদের কানে যায়।

আমার প্রার্থনা কবুল হলো। সদলে ঝোপের দিকে ছুটে গেল ওরা। হাবভাবে বুঝলাম, আমাকে জ্যান্ত ধরতে চায়। দ্রুত কোল্টের চেম্বার খালি করলাম আমি, গুরুগুরু মেঘ ডাকার মত শব্দ হলো। তারপর উবু হয়ে রাইফেলসহ সরে গেলাম অন্যদিকে। গুলির আওয়াজ রাতের নীরবতায় ব্যাঘাত ঘটাল। প্রতিধ্বনির জাল বুনল আমার আশপাশে, মাথার ওপরে। রাইফেলটা নামিয়ে রেখে ফের পিস্তলে টোটা ভরলাম আমি... পাঁচটা, তারপর ঘাপটি মেরে পড়ে রইলাম।

তুলকালাম চলছে ঝোপের ভেতর, ব্যথায় ককিয়ে উঠল একটা লোক। আরও একজন কাতরাচ্ছে, কলজে কাঁপিয়ে। কী করব আমি, এ-ই তো

চাইছিল ওরা।

খুব সাবধানে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করলাম, বুকে হেঁটে চলে গেলাম একটা বোল্ডারের পেছনে, এবং তারপর একটা শুকনো মচমচে ডালের ওপর আমার পা পড়ল। মুহূর্তে গুলির শব্দে মুখরিত হলো রাতের আকাশ-বাতাস। একটা কিছু আঘাত করল আমাকে, টের পেলাম আমার হাঁটু বাঁকা হয়ে যাচ্ছে, তবু অব্যাহত রাখলাম গুলিবৃষ্টি।

ঢলে পড়লাম একটা লোকের ওপর, ওর মুখ রক্তে পিচ্ছিল। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছি আমি, খালি পিস্তলটা এক হাতে রেখে অপর হাত দিয়ে হাতড়ে ওর পিস্তলটা ছাড়িয়ে নিলাম। প্রতিরোধের শক্তি নেই লোকটার।

অন্ধকারে ওখানেই গুটিসুটি মেরে বসলাম আমি, অনুভব করছি জখমের ব্যথা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে, হুল ফোটাচ্ছে। অধিকৃত পিস্তলটা কোলের ওপর রেখে, আমার নিজের কোল্টে টোটা পুরে খাপে ভরলাম। তারপর এক হাতে রাইফেল, এবং অন্য হাতে সিক্স-শূটার নিয়ে সরে এলাম ওর কাছ থেকে... লোকটা মৃত, না মৃতপ্রায়, কিছুই জানি না।

জিভ বের করে শ্বাস নিচ্ছি আমি, ফ্যাসফ্যাসে শব্দ হচ্ছে। ফুসফুসে গুলি লেগেছে, নাকি অতিরিক্ত পরিশ্রমে হাঁফাচ্ছি বলতে পারব না।

নীচের সমভূমি থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। 'কী খবর– লাভ হলো কিছু?'

গুমরে উঠল কেউ একজন, কিন্তু আর কোনও জবাব পাওয়া গেল না। কথা বলে কেউই নিজেকে বন্দুকের নিশানায় পরিণত করতে চায় না।

পাথরে ঘষটে আরও পিছিয়ে গেলাম আমি। দুর্বল ফাঁকা-ফাঁকা বোধ করছি, ব্যথায় ঝিমঝিম করছে মাথা।

তিনজন লোক উদয় হলো, আমার এবং আলোর মাঝখানে। অতিকষ্টে সোজা করলাম রাইফেল। এগিয়ে আসছে ওরা... বোধ হয় ভেবেছে সবাই মারা গেছে। গুলি করলাম আমি, একদম পেছনের লোকটা পড়ে গেল। তবে মরেনি– পা নড়ছে। বাকি দুজন দুদিকে দৌড় দিল। কিন্তু চোখের আড়াল হওয়ার আগেই আর একজনকে ঘায়েল করলাম। একটা তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার শুনতে পেলাম আমি, তারপর অন্ধকারে হারিয়ে গেল ও।

অনেকক্ষণ হলো আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। নীরব নিথর পরিবেশ। ঠিক জানি না, বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম আমি। তবে যখন চোখ মেললাম, গুটিকতক তারা মিটমিট করছিল আকাশে। চারদিক থমথমে। এখনও জ্বলছে আগুন, কিন্তু আশপাশে দেখলাম না কাউকে। ব্যথায় ওখানেই পড়ে রইলাম আমি, ভীষণ একলাটি বোধ করছি। একটুও নড়তে ইচ্ছে করছে না... কেবলই মন চাইছে বিগ সাউথ ফর্কের মাথায় বনমোরগের ডাক শুনব, এপ্রিলে ক্র্যাব অর্চাডের ওপর ডগউডের ঘ্রাণ নেব। কৈশোরের সোনালি স্মৃতিগুলো ভেসে উঠছে মনে।

পাইন আর রক্তের গন্ধ-মাখা রাত। আমার মৃত্যুপথ যে আগুন আলোকিত করে তুলেছে, সেই আগুন থেকে লাকড়ি পোড়ার কটু গন্ধ আসছে। এখনও হাল ছাড়িনি আমি। দৃঢ় প্রত্যয় আছে, রুডি ভিক্টরকে খুন না করে মরছি না। ওই রহস্যঘেরা লোকটি, যাকে আমি কখনও দেখিনি, অথচ যে আমার প্রিয়াকে খুন করেছে, তার শেষ না দেখা অবধি আমার মরণ নেই।

শেষ-পর্যন্ত একধরনের নির্বোধ উপলব্ধি আমাকে নড়তে বাধ্য করল। সহসা অন্তর থেকে কে যেন বলে উঠল, আমার মত এইরকম দীর্ঘ আর কঠিন একজন লোকের একবুক জ্বালা নিয়ে মরার কোনও অধিকার নেই। আমাকে বাঁচতে হবে– এবং লড়তে হবে।

ছেঁচড়ে রওনা হলাম আমি। আগের চোট সারেনি পুরোপুরি, তার ওপর বুকের একপাশে গুলি লেগেছে। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছি ব্যথা।

আরও একজনের সাথে আমার বোঝাপড়া বাকি আছে... সনোরা মেকন। কোথায় ও?

আমার শত্রুরা কেমন সুন্দর দূরে রয়ে গেছে, আমার নাগালের বাইরে। এমনভাবে আমাকে দাবড়ে বেড়াচ্ছে যে আমি ওদের শায়েস্তা করতে পারছি না।

অদূরে আগুন জ্বলছে জ্বলজ্বল করে। সন্দেহ নেই, পাথরে প্রতিফলিত হচ্ছে ওই আলো, এখানে সামান্যতম নড়াচড়াও ধরা পড়বে। ওদের দু-একজন আশপাশে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে নিশ্চয়ই, যেন আমি নড়লেই নিজেদের কাজ হাসিল করতে পারে।

কিন্তু ভিক্টরের সঙ্গে মোকাবেলা না হওয়া অবধি যেভাবেই হোক বেঁচে থাকতে হবে। ওসমান বংশের অন্যেরা আমাকে সাহায্য করার জন্যে এসে পড়েছে এই তথ্যটা নতুন করে প্রাণের সঞ্চার করল আমার মাঝে... হয়তো এ-মূহূর্তে কাছেপিঠেই কোথাও আছে ওরা।

সব সময় একাকী সব কিছু করেছি আমি, দূরে থেকেও আমার পরিবারের কথা ভেবেছি, বংশের মান-মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্যে ওরা যে মরতেও প্রস্তুত তা আমি জানি। কারও কারও কাছে হয়তো এর কোনও অর্থই নেই... তবু প্রতিটি মানুষের জন্যেই একটা বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি দরকার হয়: আমাদের টেনেসির ওসমানদের কাছে পরিবারের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। আর যা কিছু– অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান– সব পরে আসে।

ওসমানদের আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল। তাই বংশের কেউ একজন বিপদে পড়লে অন্যরা ছুটে যায় সাহায্য করতে, এমনকী সে যদি অপরিচিত হয়– তবু। এ-রকম নানান কাহিনি একশো বছর ধরে চালু আছে আমার পরিবারে। এটা আমাদের মজ্জাগত স্বভাব: যে-পার্বত্যাঞ্চলে আমরা জন্ম নিয়েছি সেখানকার রীতি, ধারা।

এখন আমি যেখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছি বাকহেড মেসা সেখান থেকে

মাত্র পাঁচ-ছয় মাইল দূরে, উত্তরে। ওখানেই খুন হয়েছিল ড্রুসিলা।

চূড়োর ডানে-বাঁয়ে খাড়া ক্যানিয়ন। বর্ষার ঢল ওইসব ক্যানিয়ন হয়ে মেসার বাইরে চলে যায়। উঠতে পারব কিনা আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু চেষ্টা করতে হবে– সকালে চূড়ান্ত হামলা চালাবে ওরা। সুতরাং, প্রতিরোধ করতে হলে আমাকে অনেকটা উঁচুতে উঠে যেতে হবে।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে পিছিয়ে ওপরে উঠছি আমি। পাহাড়ের গায়ে এখানে সেখানে ফাটল, বিক্ষিপ্ত ঝোপ, আর সরু কারনিস। নড়াচড়ায় যন্ত্রণা বাড়ছে, কপালের দুপাশের শিরা দপ্ দপ্ করছে। আমার নিজের ভারই সইতে পারছি না আমি, কয়েক ফুট গিয়ে থেমে জিরিয়ে নিচ্ছি, তারপর এগোচ্ছি আবার। ধারেকাছে নিশ্চয়ই কোনও অ্যাপাচি নেই, থাকলে আমার উপস্থিতি ঠিকই টের পেত।

ঢালে ঝোপঝাড়ের আড়াল রয়েছে, কিন্তু খাড়া বলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করছি যেন পাথরে রাইফেল ধাক্কা না লাগে– নীচের পাহারাদাররা শব্দ শুনে ফেলবে।

দেয়ালে প্রতিফলিত আলোয় অদূরে একটা জুনিপার গাছের পেছনে ছোট্ট একচিলতে ফাঁকা জমি চোখে পড়ল আমার। প্রায় নিঃশব্দে পেরিয়ে গেলাম গাছটা। এরপরেই ফাঁকা জমি, আসলে গজ তিনেক চওড়া একটা করিডর, চূড়ো বরাবর চলে গেছে। একটা বেলেপাথরের চাঁইয়ের আড়ালে বিশ্রাম নিতে বসলাম আমি।

কুকুরের মত জিভ বের বরে হাঁফাচ্ছি, কঠোর পরিশ্রমের পর এই ছোট্ট আশ্রয়টুকুর দেখা পেয়ে আর এগোতে মন সরছে না। সারাদিনের ধকল, আমার চোট, সহসা একযোগে ভর করেছে আমার ওপর। শুয়ে পড়লাম আমি, অল্পক্ষণের ভেতর ঘিরে ফেলল অসীম আঁধার। মেঘহীন আকাশে মিটমিট করছে অজস্র তারা। ঘুমিয়ে পড়লাম।

একটা চিৎকার জাগিয়ে দিল আমাকে। ধড়মড় করে উঠে বসলাম, ঘামে জবজব করছে শরীর। আচমকা অন্ধকার থেকে জেগে প্রখর দিবালোকে ধাঁধিয়ে গেল আমার চোখ। দুহাতে কচলে তাকালাম নীচের দিকে। যে-পাথরবেষ্টনীতে গতরাতে প্রথমে ঠাঁই নিয়েছিলাম আমি, সেখানে একদল লোক জড়ো হয়েছে।

এত কাছে চলে এসেছে ওরা, আমাকে খুঁজছে। ওঠার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। পা কাঁপছে থরথর করে, ধপ্ করে বসে পড়লাম আগের জায়গায়। একটু ঝুঁকলেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওদের... বিশজনের মত। নদীর ধারে, সমভূমিতে ওদের ঘোড়াও দেখতে পাচ্ছি। একজন র‍্যাংগলার দড়ি ধরে পাহারা দিচ্ছে।

কাঁপা কাঁপা হাতে উইনচেস্টারটা টেনে আনলাম কাছে।

'বেশ,' আপনমনে বললাম আমি, 'তোমরা বাগে পেয়েছ আমাকে। কিন্তু এ-জন্যে তোমাদেরও মাশুল গুনতে হবে।' একটা পাথরের ওপর রাখলাম

রাইফেলটা। এখন ব্যবহার করা সহজতর হবে– অস্ত্রের বাড়তি ভার বইতে হবে না।

ঠিক এইসময়ে, ওপর থেকে আর একটা শব্দ ভেসে এল। একটা নুড়িপাথর গড়িয়ে পড়ল, আঘাত হানল আমার কাঁধে, তারপর সামান্য ধুলো উড়িয়ে টুপ্ করে হারিয়ে গেল ক্যানিয়নের নীচে।

তার মানে ওখানেও রয়েছে ওরা। ওপর-নীচ, দুদিক থেকেই সাঁড়াশির মত চেপে ধরবে আমাকে। এইবার ওরা আটঘাট বেঁধেই এগিয়ে আসছে– কাজটাকে পাকাপোক্ত করবে বলে।

চোদ্দ

সদ্য-মোছা গ্লাসটা বাতির সামনে তুলে ধরল বব ও'ল্যারি, পরখ করে দেখল পরিষ্কার হয়েছে কি না, তারপর পেছনের তাকে রেখে দিল। সন্ত্রস্ত বোধ করছে সে, এই রাত কখন শেষ হবে সেই আশায় প্রহর গুনছে। নিস্তব্ধ স্যালুন, একটা পিন পড়লেও বুঝি শোনা যাবে তার শব্দ, অথচ প্রায় সব আসনই পূর্ণ।

কোণের একটা টেবিলে বসে আছে অ্যাল য্যাব্রিসকি, সঙ্গে বার্নস আর ব্রিসকো। তিনজনকেই ল্যারি চেনে, এবং পছন্দ করে না। ওরা বিদায় হলেই সে খুশি হয়, কিন্তু সেটা বলার মত সাহস ওর নেই। সেই সন্ধে থেকে য্যাব্রিসকি মদ নিয়ে বসেছে। এর অর্থ ল্যারি ভালই জানে।

প্রিটস দাঁড়িয়ে আছে বারে। একা। এ-কদিনেই বুড়িয়ে গেছে ও, ক্লান্ত কৃশকায় দেখাচ্ছে। এর কারণ খানিকটা জানে ল্যারি, বাকিটুকু আঁচ করে নিয়েছে। প্রিটস তার সমস্ত টাকা-কড়ি রুডি ভিক্টরের সাথে গরু ব্যবসায় লগ্নি করেছে। মাত্র হপ্তা কয়েক আগে দীর্ঘ মরুযাত্রা শেষ করেছে গরুগুলো। ওই যাত্রায় বহু গরু হারিয়েছে ওরা, পালটাকে আবার তরতাজা করে তোলার জন্যে টন্টোর বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে কিছু দিন থাকা দরকার ওদের। ভিক্টর যে-লড়াইতে নেমেছে তাতে জড়ানোর একটুও ইচ্ছে ছিল না প্রিটসের, কিন্তু লোকসানের ভয়ে সরে দাঁড়াতে পারছে না।

সবে আর একটা গ্লাস হাতে নিয়েছে ও'ল্যারি, এমন সময়ে দরজা খুলে গেল। ও-দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্যে জমে গেল সে। পয়লা নজরে নবাগতকে ওরিন ওসমান বলে ভেবেছিল ল্যারি, কিন্তু এ-লোক আর একটু স্বাস্থ্যবান। ঝাঁকড়া বাবরি চুল, থুতনিতে একটা কাটা দাগ।

কোমরে দুটো পিস্তল, হোলস্টার নামিয়ে উরুর সাথে বাঁধা। বুক-খোলা ঝালর-দেয়া বাকস্কিন জ্যাকেটের ফাঁক দিয়ে তৃতীয়টার বাঁট উঁকি দিচ্ছে। ধূলিমলিন শরীর। দরজায় মুহূর্তের জন্যে থেমে ভেতরের আলোর সাথে

নিজের চোখ সইয়ে নিল। নাকের বাঁশি কয়েক জায়গায় ভাঙা, হাতাহাতির সাক্ষ্য বহন করছে। একধরনের বুনো বেপরোয়া ভাব ফুটে আছে লোকটার চেহারায়, দেখে মনে মনে বিষম খেল ল্যারি, একটা হার্টবিট মিস্ করল। স্পারের ঝুনঝুন তুলে, বারে এসে দাঁড়াল সে। দৃপ্ত সিংহের মত হাঁটা-চলার ভঙ্গি।

'রাই,' বলে সারা ঘরে নজর বোলাল আগন্তুক। য্যাব্‌রিসকির ওপর এসে ক্ষণিকের তরে স্থির হলো তার দৃষ্টি, তারপর ওর দুই সঙ্গী, বার্নস আর ব্রিসকোকে মাপল।

তিনজনের মধ্যে ব্রিসকো সবচেয়ে তরুণ। ও-ই প্রথম লক্ষ করল লোকটাকে, ফিসফিস করে বন্ধুদের বলল কিছু। বারের দিকে ঘাড় ফেরাল য্যাব্‌রিসকি।

নোয়েল ওসমান সরাসরি তাকাল ওর চোখের দিকে, বলল, 'শুনলাম এখানে কে নাকি একজন ওসমানকে ফাঁসিতে ঝোলাচ্ছে?'

'তাতে তোমার কী?' ঈষৎ জড়ানো গলায় খেঁকিয়ে উঠল য্যাব্‌রিসকি।

'আমি নোয়েল ওসমান, বাড়ি ক্লিঞ্চ মাউন্টিন। আমার ভাইকে সাহায্য করব বলে অনেক দূর থেকে এসেছি।'

তখনও বিশেষ পান করেনি অ্যাল য্যাব্‌রিসকি, তবে সুরার প্রভাব ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার অবচেতন মন জানান দিল, ওরিন ওসমানকে খুন করার জন্যে ভাড়া করা হয়েছে তাকে। তা ছাড়া, এই বিশালকায় অপরিচ্ছন্ন নেকড়ের সাথে তার কোনও বিরোধ নেই। নোয়েল ওসমান নামটা য্যাব্‌রিসকির পরিচিত, ওর মস্তিষ্কে একটা পাগলাঘণ্টি বেজে উঠেছে... মাইল্‌স সিটি থেকে মেক্সিকোর ডুরাংগো পর্যন্ত আউট-লদের প্রতিটা ঘাঁটিতে ওই নাম সমীহের সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

সর্বত্র একটি কথাই ধ্বনিত হয়: নোয়েল ওসমান? ওকে ঘাঁটিও না।

'আমরা তোমাকে খুঁজছি,' বলল সে।

'কিন্তু যাকে খুঁজছ সে আমার ভাই,' বলল নোয়েল। 'একজন ওসমানের পেছনে লাগা মানেই আর সবার পেছনে লাগা।'

'সময়মত ওর সাহায্যে পৌঁছতে পারব কিনা জানি না, তাই পেছনের আগাছাগুলোকে ছেঁটে ফেলব ভাবছি। তোমার গায়ে কোনও মার্কা নেই, আমাদের ওসমান মার্কা লাগিয়ে দেব এখন।'

লেযি এ বাথানের আরও পাঁচজন বন্ধুকবাজ রয়েছে ঘরে। প্রিটস বারে দাঁড়িয়ে আছে, গোলাগুলি শুরু হলে ওর আহত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

জীবনে এই প্রথম মিষ্টি কথায় বিবাদ মিটিয়ে ফেলার তাগিদ অনুভব করল অ্যাল য্যাব্‌রিসকি। সে টাকার বিনিময়ে লড়ে, সহজেই সমস্যার স্বরূপ বুঝতে পারছে। মুখ খোলার জন্যে তৈরি হলো, কিন্তু ওর কোলের ওপর-রাখা হোলস্টারখানা বাদ সাধল– হাতের কাছেই আছে পিস্তলের বাঁট। হঠাৎ

য্যাবরিসকি ভাবল, নিকুচি করি! সে কিনা ভয় পাচ্ছে একটা পাহাড়ী ভূতকে! ঝট করে হাড়ের বাঁটটা চেপে ধরল ও।

য্যাবরিসকির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও নির্ভুল, কিন্তু ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কেবল দেখল ওসমানের হাতটা নড়ল একটু, তারপর একঝলক আগুনে অন্ধ হয়ে গেল সে, পেটে .৪৫ বুলেটের প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করল।

'কী...? য্যাবরিসকি আসলে জানতে চাইছিল কী হচ্ছে তার, কিন্তু শুধুমাত্র একজন মৃতের পক্ষেই সেটা জানানো সম্ভব ওকে। বাঁকা হয়ে গেল ওর হাঁটু, পিস্তলের অবিরাম গর্জন শুনতে পেল, তারপর স্যালুনের কাঠের পাটাতন দুহাতে খামচে ধরল। স্থির হয়ে গেল ওর দেহ।

বার্নস খতম। তাড়াতাড়ি পিছু হঠতে গিয়ে ওর চেয়ার উল্টে যায়, তারপর যাও-বা উঠল, ওর ডান চোখের ভেতর একটা বুলেট নিজের জায়গা করে নিল।

ব্রিসকো সেয়ানা লোক। গোলাগুলির পূর্বমুহূর্তে একপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে গিয়েছিল। ওইসময়ে হোলস্টার থেকে পড়ে যায় ওর পিস্তল। এখন সেটা মেঝেতে পড়ে আছে, হাত বাড়ালেই নাগাল পায়। ব্রিসকো তৃষাতুর চোখে একবার পিস্তল, আর একবার নোয়েল ওসমানকে দেখছে। পা ফাঁক করে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে সে, বিশাল থাবার মাঝে খেলনার মত দেখাচ্ছে ওর সিক্স-শূটারটা।

'ওঠাও, বাছা,' অমায়িক সুরে বলল নোয়েল, 'জীবনে কেউ চিরদিন বেঁচে থাকে না।'

ব্রিসকো ঘামছিল। খুব কাছেই রয়েছে ওটা। সহজেই তুলে নিয়ে গুলি করতে পারবে। ওর বিশ্বাস নোয়েল ওসমানকে খুন করতে পারবে সে। এ-জন্যে অন্তরের খোঁচাও অনুভব করছে; কিন্তু ব্রিসকোর শরীর অনেক বেশি বুদ্ধিমান, পেশীগুলো বেঁকে বসল। ধীরে ধীরে, পিছিয়ে গেল সে।

দ্রুত এক কদম আগে বাড়ল নোয়েল ওসমান। 'নাও, বাছা। এটা বরং তোমার কাছেই রাখো।' এক হাতে পিস্তলটা ব্রিসকোর দিকে ছুঁড়ে দিল নোয়েল, কিন্তু সভয়ে পিছিয়ে গেল পিস্তলবাজ– যেন ওটা তাতানো লোহা। মেঝেতে ঠকাস্ করে ভারি বস্তু পতনের শব্দ হলো।

মাথা নেড়ে ওকে তিরস্কার করল নোয়েল। 'বাছা, আমার কথা শোনো। জীবনে আর কখনও এ-সব ঝুলিও না– মারা পড়বে।'

বারের উদ্দেশে ঘুরল নোয়েল। একজন দীর্ঘকায় সুদর্শন যুবক অন্য একটা টেবিলের দিকে পিস্তল তাক করে আছে। লোকটাকে দেখে বিস্মিত হলো নোয়েল। পরনে বনাতের সুট, নিখুঁত ছাঁট, মাথায় প্ল্যান্টারদের মত কালো হ্যাট, পায়ে স্প্যানিশ বুট।

পিস্তলটাও সুদৃশ্য, সোনার পাতে মোড়া, মুক্তোখচিত বাঁট। ওর জোড়াটা হোলস্টারে রয়েছে, বাঁট সামনের দিকে, আগন্তুকের বাঁ-কোমরে।

টেবিলের লোকগুলোর ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে, যুবকটি বলল, 'কেমন

আছ, নোয়েল? আমি মাইকেল ওসমান, হাইল্যান্ড রিম।'

'তোমাদের কথা শুনেছি– যদিও পরিচয় হয়নি।'

'এরা অস্থির হয়ে উঠেছিল,' বলল মাইকেল, 'তাই ভাবলাম লাগাম পরিয়ে রাখি।'

নিজের পিস্তল হোলস্টারে গুঁজল সে। 'এসো, নোয়েল, একটু গলা ভেজাবে। ওরা যদি বাড়াবাড়ি করে, আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেব।'

'আমাদেরও ভাগ দিতে হবে,' দোরগোড়া থেকে একটা নতুন গলা ভেসে এল। ঘুরে, নবাগতদের মুখোমুখি হলো ওরা।

ক্রিস ওসমান আর টিংকার, দৃঢ় পদক্ষেপে বারে এসে হাত মেলাল দুজনের সঙ্গে। ওরা এইমাত্র গ্লোবে পৌঁছেছে।

প্রিটসের দিকে ঘাড় ফেরাল মাইকেল ওসমান। 'আমি যদ্দূর জানি, তুমি লেযি এ-র অন্যতম মালিক?'

শিরদাঁড়া সোজা করল প্রিটস। 'আমার কাছে কোনও পিস্তল নেই।'

'আমি সে-কথা বলছি না,' জবাব দিল মাইকেল। 'ব্যবসায়িক আলাপ। তোমাদের পালটা কত বড়?'

'তিনহাজারের মত গরু ছিল, পথে খোয়া গেছে কিছু।'

'বিক্রি করবে?'

'কী?' ফ্যালফ্যাল করে ওর পানে তাকাল প্রিটস। 'বিক্রি করব, তোমার কাছে?'

'কেন, আপত্তি কোথায়? শুনলাম তোমার সব টাকা-পায়সা আটকে আছে ওতে। তা ছাড়া, সবাই বলছে, এই গোলমালে তোমার কোনও হাত নেই।'

'একদম না। কসম। সব নষ্টের গোড়া ওই ভিক্টর।'

'ঠিক আছে, তোমার অংশ আমি কিনব।'

'ভিক্টরের পার্টনার হবে?'

'ঠিক তাই।'

'কিন্তু,' আপত্তি জানাল প্রিটস, 'গরুগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই ঝামেলা শুরু হওয়ার পর থেকে একটুও যত্ন হয়নি। সবাই তোমার এই আত্মীয়ের পেছনে লেগে আছে। ভিক্টর কারও কথা কানে তুলছে না। অবসেশনে ভুগছে ও ... ভয়ে সিঁটিয়ে আছে।'

'ইচ্ছে করলে তুমি লোকসানের ঝুঁকি নিতে পারো– তবে আমার মতে নগদ বেচে দিলেই ভাল করবে।'

'সস্তায় কিনেছি, বেচবও সস্তায়। শিহুয়াহুয়াতে গরুগুলো কিনেছি আমরা– বলতে পারো, একরকম পানির দরে।'

'বলো, কত চাও?' জিজ্ঞেস করল মাইকেল।

ইতস্তত করছে প্রিটস, কিন্তু সাথে সাথে এও বুঝতে পারছে যে এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাওয়াই তার জন্যে সবচেয়ে মঙ্গলজনক। ঘণ্টা কয়েক

আগে তার নিজের মনেও এই দ্বন্দ্ব চলছিল, সব ছেড়ে-ছুড়ে খালি হাতে চলে যাবে কী না। বস্তুত গত কদিন ধরেই এ-রকম ভাবছে সে। এখন তার সামনে সম্ভাবনার আর একটা দুয়ার খুলে গেছে— অন্য কোথাও গিয়ে নতুন করে শুরু করতে পারবে জীবন।

ঘটনাটা আসলে কী সে জানে না। তবে ওরিন ওসমানের দাবি তার কাছে সত্যি বলে মনে হয়েছে। ভিক্টরের হাবভাবও রীতিমত সন্দেহজনক। জানে টেক্সাসে যে-সব কর্মচারীকে নেওয়া হয়েছিল দলে তাদের প্রায় সবাই ইস্তফা দিয়েছে। এখন যারা রয়েছে তারা হয় ভাড়াটে বন্দুকবাজ, কিংবা নামপরিচয়হীন ভবঘুরে।

ভিক্টরকে অনেক বুঝিয়েছে সে, ও কোনও যুক্তিই কানে তোলেনি। ভিক্টরের অংশ কিনে নেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিল— কিন্তু সে কেনা বা বেচা, কোনটিতেই রাজি হয়নি।

প্রিটসের সুনাম আছে। এ-ব্যাপারে সে যথেষ্ট সচেতন, জানে ব্যবসার বারোআনা নির্ভর করে সুনামের ওপর— বিশেষ করে পশ্চিমে।

বহু ভেবেচিন্তে কম দর হাঁকল সে যাতে মাইকেল ওসমান পিছিয়ে না যায়। লোকটা কেনার আগ্রহ দেখিয়েছে ঠিক, তবু প্রিটস অহেতুক ঝুঁকিতে যেতে চাইল না।

'কীসের মধ্যে যাচ্ছো তুমি জানো না,' সাবধান করল প্রিটস। 'রুডি ভিক্টর ভয়ঙ্কর লোক, আধা-পাগল হয়ে গেছে। ওরিন ওসমানকে খুন করা ছাড়া এখন আর কোনও চিন্তা নেই তার মাথায়।'

'ইতিমধ্যেই যদি করে না থাকে— তবে আর করবে না।'

মাইকেল ওসমান তার কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা চিঠি বের করল। 'ফিচ অ্যান্ড চার্চিল, প্রেসকটের এই অ্যাটর্নিদের তুমি চেনো?'

'বার দুয়েক ব্যবসা করেছি ওদের মাধ্যমে।'

'ওরা আমার উকিল। ওদের অফিস ব্যাংক অভ অ্যারিযোনার দোতলায়। ওখানে আমার টাকা জমা আছে, পাওনা মিটাতে অসুবিধে হবে না। এই চিঠিটা টম ফিচ অথবা ক্লার্ক চার্চিল যে-কাউকে দেখালেই হবে— এখন তুমি বিক্রয়পত্রটি লিখে দাও।'

ল্যারির কাছ থেকে একটা কাগজ চেয়ে নিয়ে বিক্রয়পত্র লিখে দিল প্রিটস। ওটা পড়ে মাইকেল ওসমান লেযি এ-র বন্দুকবাজদের পানে ঘুরল।

'তোমরা নিজেদের কানেই শুনলে সব কিছু। এখন আমি লেযি এ-র একজন সমান অংশীদার। কাজেই আমার কথা মানতে তোমরা বাধ্য। মি. প্রিটসের অনুমতি ছাড়াই যে তোমাদের নিয়োগ করা হয়েছে এতে আমার একটুও সন্দেহ নেই। তোমাদের দেখেই বোঝা যায় গরুর 'গ'-ও জানো না তোমরা। সুতরাং তোমাদের যা কিছু পাওনা মি. ভিক্টরের কাছ থেকে নিতে হবে— আমি এক পয়সাও দেব না। ইচ্ছে করলে কোর্টে গিয়ে আমার নামে মামলা ঠুকতে পারো।'

দীর্ঘ সময় নিয়ে চেয়ার ছাড়ল ওরা, স্লো-মোশন ছায়াছবির মত। এইমাত্র যা শুনেছে তার একটা বর্ণও মনঃপূত হয়নি ওদের– বিশেষত এই নবাগত শহুরে লোকটাকে তো আরও অপছন্দ। সবার অলক্ষ্যে ঘরে ঢুকেছে ব্যাটা, তারপর আচমকা পিস্তল তাক করেছে ওদের দিকে, আগেভাগে একটু জানান পর্যন্ত দেয়নি– এখন আবার বিনা নোটিসে জবাব দিল।

'টাকা নেয়ার আরও অনেক রাস্তা জানা আছে আমাদের,' বলল ওদের মধ্যে একজন।

ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল মাইকেল ওসমান। 'আলবত। পিস্তল ঝুলিয়েছ তুমি, তা এখনই হয়ে যাক না?'

বাস্তবের মুখোমুখি হলো বার্নি মাফলিন। সিদ্ধান্ত নিল, নিজের দাবি সে ছেড়ে দেবে। এমনিতেই এ-কদিনের পারিশ্রমিক মিলবে না বলেই তার বিশ্বাস, তার ওপর একটু আগেই স্বচোখে দেখেছে মাত্র একজন ওসমানই কী প্রলয় ঘটাতে পারে।

'ওর কী হবে?' নোয়েলের প্রতি ইঙ্গিত করল বার্নি।

'যদি একজন-একজন করে হয়, ও নীরব থাকবে। যা করবে ঝট্‌পট্ করো– হয় লাগো নয়তো ভাগো।'

দোনোমনো করল বার্নি, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'নাহ্, ঝুঁকির পরিমাণ বেশি। আমরা চলেই যাচ্ছি।'

ইচ্ছে করেই, ওদের দিকে পেছন ফিরল মাইকেল। কিন্তু বার্নি হুঁশিয়ার, ঠিকই লক্ষ করল ওদেরকে আয়নায় দেখছে সে।

নতমুখে স্যালুন থেকে বেরিয়ে গেল ওরা। স্যাডলে চেপে বার্নি বলল, 'ইস্, আমি যদি ওদের পক্ষে যোগ দিতে পারতাম। একখানা দল বটে।'

'শালা!' বলে রাস্তায় থুতু ছিটাল দলের আর একজন। 'কারও সাহায্য লাগবে না ওদের– নিজেরাই যথেষ্ট। ক্ষমতা থাকলে পাখি হয়ে গাছে বসে আমি দেখতাম, এরপর কী ঘটে।'

বারের দিকে ঘুরল মাইকেল। 'তা, নোয়েল, এ-বার হয়ে যাক এক গ্লাস?' বলে ক্রিস আর টিংকারের পানে তাকাল। 'এবং, আপত্তি না থাকলে, তোমরাও।' ক্রিসের প্রকাণ্ড শরীরখানা জরিপ করল ও, তারপর বলল, 'তোমার চেহারা ওসমানদের মতই।'

'ক্রিস। আর এ আমার বন্ধু টিংকার– তালার যাদুকর।'

'ও, আচ্ছা। তোমার কথা শুনেছি, টিংকার।' ইশারায় বোতলটা দেখাল মাইকেল। 'খাও।' তারপর যোগ করল, 'তোমার ছুরির খুব নাম।'

'চলো, আর দেরি করা ঠিক হচ্ছে না,' বলল ক্রিস। 'নীল, অ্যাঞ্জেল, ওরাও আসছে।'

'তাই চলো। বারটেন্ডার, বিল প্লিজ। আর একটা কথা,' ও'ল্যারির উদ্দেশে বলল মাইকেল, 'আমার একটা উপকার করবে। সবাইকে বলবে লেফি এ-র অর্ধেক শেয়ার এখন আমার। পিস্তলবাজির জন্যে আমি এক পয়সাও দেব

না কাউকে।'

একঢোকে পানীয়টুকু শেষ করে খালি গ্লাসটা নামিয়ে রাখল নোয়েল। 'ওরা যখন কথাটা জানবে,' বলল ও, 'ভীষণ একা হয়ে পড়বে ভিক্টর।'

তিন ওসমান– নোয়েল, ক্রিস, আর মাইকেল– হাঁটা দিল দরজার দিকে। পেছন পেছন টিংকার।

যখন বাইরে থেকে কপাট টেনে দিল ওরা, ঘরে যে-দুজন তরুণ রকবাজ তখনও বসেছিল তাদেরকে ল্যারি বলল, 'ওই লাশদুটো সরাও তোমরা– মদ খাওয়াব।'

ওরা চলে গেলে, ব্রিসকো স্খলিত পায়ে বারে এসে দাঁড়াল। 'রাই' বলে একটা রুপোর চাকতি বের করল পকেট থেকে।

'লাগবে না দাম– আমি খাওয়াচ্ছি।'

গ্লাস হাতে নিয়ে বারের পেছনে-দাঁড়ানো আইরিশ লোকটার দিকে তাকাল ব্রিসকো। 'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ, আমি ভয় পেয়েছি?'

দায়সারাভাবে শ্রাগ করল ল্যারি।

'একটা কথা কি জানো, বব,' বলল ব্রিসকো, 'সত্যি ভয় পেয়েছিলাম– কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছিল।'

'ও কিন্তু তোমাকে ভাল উপদেশই দিয়েছে। পিস্তলটা রেখে চলে যাও অন্য কোথাও।'

মাথা ঝাঁকাল ব্রিসকো। পানীয়ে চুমুক দিল একটা, তারপর ওর গান বেল্ট আর পিস্তলদুটো রাখল বারের ওপর।

'তুমি রেখে দাও এগুলো,' বলল সে। 'আর কোনও দিন হাত দেব না আমি।'

যখন ব্রিসকো বিদায় নিল, দুটো পিস্তলসহ গান বেল্টটা বারের পেছনে একটা আংটায় ঝুলিয়ে রাখল স্যালুন মালিক।

অনেকক্ষণ পর গ্লাস মুছতে মুছতে আড়চোখে এগুলো একবার দেখল ল্যারি। বিশ বছর আগে একদিন সে নিজেও এইরকমটি করেছিল। সে-দিনকার কথা আজও মনে আছে তার। 'এবং আমি ঠিকই বেঁচে আছি,' আপনমনেই বিড়বিড় করল ও।

মাঝরাতের অল্পক্ষণ বাকি আছে। একটা খদ্দেরও নেই স্যালুনে। আজকের মত ঝাঁপ ফেলার জন্যে তোড়জোর করছিল বব ও'ল্যারি। হঠাৎ দরজা খুলে একটা তরুণী ঢুকল।

'আমি লোরনা,' বলল ও।

'দুঃখিত। আমরা মহিলাদের সার্ভ করি না।'

'আহ্, ল্যারি, তুমি ভাল করেই জানো আমি কে। কী আছে দাও– খিদে পেয়েছে।' বারের ওপর দুহাত রেখে সোজা বারটেন্ডারের দিকে তাকাল লোরনা। 'ওরা কি ধরে ফেলেছে ওকে?'

'না।'

'খোদা করে, কখনও যেন না পারে।'

ঠিক ওইসময়ে, দূর-ট্রেইলে ছুটছে চারজন ঘোড়সওয়ার– ওদের গন্তব্য মগলোন রিম।

পনেরো

জায়গার নাম ওয়াইল্ড রাই। সময়ে এই নামের সার্থকতার পরিচয়ও মেলে। মূলত স্যালুন, পাশপাশি টুকিটাটিক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায়। মালিকের নাম অগল্‌ট্রি, ১৮৭২-৭৩ সালের অভিযানে জেনারেল ক্রুকের আর্দালি ছিল। পরে ফিরে এসে দোকানটা চালু করেছে। এক কামরার কেবিন, কাঠের, নীচু ছাত। ব্যবসার শুরুতে অগল্‌ট্রির মূলধন ছিল মোটে সত্তর ডলার।

লোক তেমন হয় না। মাঝে-মধ্যে মরমনরা হারানো গরু বা ঘোড়ার খোঁজে আসে। উত্তরে, পাইন টাউনে ওদের বসতি। এ ছাড়া, ক্বচিৎ-কখনও, খনিসন্ধানী কিংবা আউট-লয়েরা ভিড় জমায়। তবে ওর নিয়মিত খদ্দের যে একেবারে নেই, তা নয়। ওয়াইল্ড রাইতে ইন্ডিয়ানদের যাতায়াত হরদম।

অগল্‌ট্রি ঝানু লোক, ধৈর্যশীল। অ্যাপাচিদের সাথে সম্পর্ক ভাল। সাধারণত ওরা তাকে টাটকা মাংস আর চামড়া সরবরাহ করে, তবে কখনও কখনও এক-আধটা সোনার টুকরোও দেয়। জীবনের শেষ দিনগুলো টন্টোতে কাটাবে বলে এসেছিল সে, কিন্তু দুবছর না পুরতেই বেরিয়ে পড়ল অ্যাপাচিদের স্বর্ণখনির সন্ধানে। আলাপ প্রসঙ্গে ওদের কাছে জেনেছিল, তার কেবিন থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে ফোর পিকস অঞ্চলের কোনও এক লুকোনো-উপত্যকায় আছে ওই খনি। তাই একদিন ভোরে একটা প্যাক হর্সসহ সোনার খোঁজে রওনা হয় সে। এর কয়েক হপ্তা বাদে শুধু ঘোড়াটা ফিরে আসে। সেই থেকে অগল্‌ট্রি বা তার মালপত্রের আর কোনও হদিস পাওয়া যায়নি।

তবে এখন টন্টোতে তার পয়লা বছর চলছে। লেথি এ-র অশ্বারোহীরা এই এলাকায় আসার পর থেকে ওয়াইল্ড রাইয়ের জনসংখ্যা বেড়ে হয়েছে পাঁচ– এদের মধ্যে একজন ইন্ডিয়ানও আছে। ওরিন ওসমানকে যে-সব লোক ধাওয়া করছে, তাদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে তামাক কিনতে আসে এখানে। সুযোগ পেলে দুদণ্ড বসে আড্ডা দেয় নিজেদের ভেতর।

অগল্‌ট্রির মাথায় টাক, বেশির ভাগ সময় গেঞ্জি আর গ্যালিস লাগানো প্যান্ট পরে থাকে। সর্বদা একটা রাইফেল রাখে হাতের কাছে। দরজায় দাঁড়িয়ে ধূমপান করছিল ও, হঠাৎ ক্রীকের উজানে দুজন ঘোড়সওয়ারকে

দেখতে পেল— এই দিকেই আসছে। দুজনেই লম্বা একহারা এবং তরুণ। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল, কোমরে একটা পিস্তল। পরনে ময়লা কাপড়চোপড়, চুলে জট। ঘোড়া থেকে নেমে রাইফেলহাতে দোকান পর্যন্ত হেঁটে এল ওরা। ঠাণ্ডা ধূসর-সবুজ চোখ মেলে জরিপ করল দোকানিকে, তারপর খাবার চাইল।

'ড্রিংকস?' প্রশ্ন করল অগলট্রি।

'খাবার,' জবাব দিল অপেক্ষাকৃত লম্বাজন। তারপর যোগ করল, 'আমি পিটার ওসমান। এ আমার ভাই মিল্টন।'

ওদেরকে ঘরে নিয়ে গেল অগলট্রি। ভেতরের মেঝে বাইরের চেয়ে এক ধাপ নিচু। দুই বাটি স্ট্যু এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি ওরিন ওসমানের কেউ হও?'

'হ্যাঁ।'

'ওকে খুঁজছে ওরা।'

এ-কথায় কোনও উচ্চবাচ্য করল না দুজন, নীরবে খেতে লাগল। যখন খাওয়া শেষ হলো, টেবিলের এককোণে দুটো সিকি ডলার রাখল পিটার।

'আর খুঁজতে নিষেধ করো ওদের। আমরা ওরিনকে সাহায্য করতে এসেছি।'

'ঈস্ট ফোর্কে গোলাগুলি চলছে...এখান থেকে উত্তরপশ্চিমে, চোদ্দ-পনেরো মাইল হবে।'

'আয়, মিল্টন। ওখানেই যাব আমরা।'

পাঁচ মিনিটও কাটেনি, রুডি ভিক্টর দোকানে এসে হাজির হলো। সঙ্গে সনোরা মেকন, র‍্যাফ রোমেরো ছাড়াও আরও দুজন রয়েছে। অগলট্রি চেনে না ওদের। ইতিপূর্বে ভিক্টরকে মোটে একবার দেখেছে দোকানি, টনটোতে ও নিজে আসার মাস কতক পরে। তার সাথে এই চেহারার দুস্তর ফারাক।

রুডলফ ভিক্টরের বয়স চল্লিশ বছর। পেশীবহুল ভারি গড়ন, রুক্ষ পুরুষালি চেহারা। আগের যাত্রায় ওর ঠোঁট আর চোখের কোলে আশ্চর্যরকমের কাঠিন্য লক্ষ্য করেছিল অগলট্রি, এবং তখনই লোকটাকে পছন্দ হয়নি। কিন্তু এখন সেখানে ত্রিবলী স্পষ্ট। চোয়াল ভাঙা, চোখ গর্তে।

ভিক্টর উন্নাসিক উদ্ধত। চারপাশের কাউকে মানুষ হিসেবে গণ্য করে না। নিজের চেষ্টায়, এবং অতিসহজে, সাফল্যকে যারা করতলগত করেছে তাদের প্রায় অনেকের মাঝেই এই নাক-উঁচু স্বভাব দেখা যায়। দয়ামায়া নেই ওর। ব্যর্থতা কী জিনিস আজও জানে না, তাই নিজের যে-কোনও কাজকেই ন্যায়সঙ্গত বলে বিশ্বাস করে। তবু এই মুহূর্তে সে ভয়পীড়িত: তার সীমাহীন ঔদ্ধত্য আর সহজাত ক্রূরতা তাকে এমন এক কুকীর্তির পাঁকে ফাঁসিয়েছে যেখান থেকে বেরোনোর পথ পাচ্ছে না। ধরা পড়ার আশঙ্কায় আহার-নিদ্রা হারাম হয়ে গেছে। তার পতন অনিবার্য, এমনকী মৃত্যুও ঘটতে পারে, এ-চিন্তা

দুঃস্বপ্নের মত তাড়া করছে তাকে।

গ্লোবের ফুটপাত কাঁপিয়ে যাওয়ার সময়ে হঠাৎ ড্রুসিলা ওসমানকে দেখতে পায় সে। একটা ত্রিপল-ঢাকা রসদ-বোঝাই ওয়াগনের সিটে বসেছিল ড্রুসিলা। এ-রকম রুক্ষ জংলী পরিবেশে কোনও সুন্দরী মেয়েকে আশা করেনি ভিক্টর, এত আচমকা থমকে দাঁড়িয়েছিল যে আর একটু হলেই পড়ে যেত। কিন্তু সেয়ানা লোক ও, চট করে সামলে নিয়ে এগিয়ে যায় ধীর পদক্ষেপে। ফুটপাতের শেষ-মাথায় গিয়ে মেয়েটাকে আর এক নজর দেখার জন্যে ঘাড় ফেরাতেই ওরিন ওসমানকে চোখে পড়ে— সাপ্লাই স্টোর থেকে বেরিয়ে ওয়াগনে উঠছিল।

ওদের পরিচয় জানত না ভিক্টর, জানার আগ্রহও বোধ করেনি। তার দৃষ্টিতে ওরা ছিল সামান্য 'ভবঘুরে'— অতএব করুণার পাত্র। কিন্তু ড্রুসিলা সুন্দরী; দেখামাত্র ওর রক্তে কামনার বান ডেকেছিল। বহুকালের মধ্যে এমন মেয়ে চোখে পড়েনি তার; প্রায় মাস তিনেক হলো টেক্সাস ছেড়েছে, আজ পর্যন্ত কোনও শ্বেতাঙ্গ রমণীর দেখা পায়নি। ওকে পাওয়ার জন্যে আকুল হয়ে ওঠে ভিক্টর। ঘুণাক্ষরেও ব্যর্থতার চিন্তা ঠাঁই পায়নি মনে। তার মত একজন ধনী গরু ব্যবসায়ীকে যে একটা ভবঘুরের বউ প্রত্যাখ্যান করতে পারে ওর ধারণাতেই আসেনি এটা।

তাই ওদের পিছু নেয় সে। তার আগে গ্লোবের দোকানির কাছ থেকে কথাচ্ছলে জেনে নিয়েছিল মগলোন পর্বতমালার দিকে যাচ্ছে ওরা। এ-খবরে পুলকিত হয়েছিল ভিক্টর, কারণ সে নিজেও ওইদিকেই যাচ্ছিল।

দলের কাউকে নিজের মতলব বুঝতে দেয়নি ও। এমনকী তার অংশীদার প্রিটসকেও নয়। উৎকৃষ্ট ঘাস আর পানির সন্ধানে যাওয়ার ছুতোয় ওয়াগনের ট্রেইল অনুসরণ করেছিল। ওরিনকে চলে যেতে দেখেছিল, ওদের ক্যাম্পের খুব কাছাকাছি ছিল বলে শুনতে পেয়েছিল মেসা থেকে বেরোনোর পথ খুঁজতে যাচ্ছে ওরিন— ফিরতে কয়েক ঘণ্টা দেরি হবে।

এরপর ওয়াগনের ধারে গিয়ে নিজেকে লেযি এ বাথানের মালিক বলে পরিচয় দেয় ও। কিন্তু ড্রুসিলার কোনও ভাবান্তর ঘটেনি এতে, অবিচল ছিল। তখন তার কত গরু আছে তা উল্লেখ করে প্রস্তাব দেয়, যেহেতু তারা প্রতিবেশী হতে যাচ্ছে তাদের একসাথে থাকা উচিত। ভিক্টরের হাবভাবে লুকোছাপার বালাই ছিল না, এবং ড্রুসিলাও ধরতে পেরেছিল ইঙ্গিতটা। জবাবে ও কেবল বলেছিল এটা বিরাট দেশ, কাজেই তারা পড়শি হবে এমন সম্ভাবনা কম। তারপর সে যখন স্যাডল থেকে নেমে ওয়াগনে গিয়ে ওঠে, ড্রুসিলা কঠিন স্বরে নেমে যেতে নির্দেশ দিয়েছিল তাকে।

রুডলফ ভিক্টর চিন্তাও করতে পারেনি এটা ওর মনের কথা হতে পারে। ভেবেছিল মেয়েটা খেলাচ্ছে ওকে। এ-রকম ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত নয় সে, ওর হাত চেপে ধরেছিল। ড্রুসিলা তখন ঠাস্ করে ওর গালে চড় কষায় একটা।

এই আকস্মিক ঘটনায় হকচকিয়ে যায় খচ্চরগুলো, লাফঝাঁপ শুরু করে দেয়, ভারসাম্য হারিয়ে ওরা দুজনেই পড়ে যায় মাটিতে।

নিজেকে মুক্ত করে ত্রস্ত পায়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল ড্রুসিলা— পারেনি। দুকদম যাওয়ার আগেই ওকে দৌড়ে গিয়ে পেছন থেকে জাপটে ধরে ভিক্টর। এইবার ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়ায় মেয়েটা, বড় বড় নখ দিয়ে আঁচড় বসায় ওর মুখে। মুহূর্তে রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল ভিক্টর, তারপর যখন টের পেল সে কী করছে, তখন ড্রুসিলা ওসমান পড়ে আছে মাটিতে, পোশাক ছিন্নভিন্ন, তার বলিষ্ঠ দু-হাতের চাপে শ্বাস রোধ হয়ে মারা গেছে ও।

উঠে দাঁড়াল ভিক্টর, ঠাণ্ডা ঘামে আতঙ্কে ভিজে গেছে।

এতটুকু অনুতাপ নেই ওর মাঝে— আছে শুধু ভয়। একটা শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে খুন করেছে সে...ওর স্বামী এখনই ফিরে আসবে।

এর আগেও এমন ঘটেছে। কিন্তু সেই মেয়ে ছিল রেড ইন্ডিয়ান। ওদের ব্যাপারে মাথাব্যথা নেই কারও— অন্তত প্রতিশোধ নেওয়ার মত কেউ ছিল না। অবশ্যি সে-বার খুব দ্রুত ওখান থেকে সরে এসেছিল সে। এবং কেউ তাকে ওই ঘটনার সাথে জড়িত করতে পারেনি। দু-একবার মনে হয়েছে প্রিটস হয়তো সন্দেহ করেছে একটা কিছু, কিন্তু মুখে সে-রকম কিছু প্রকাশ করেনি। যা-ই সন্দেহ করে থাকুক, প্রিটস সেটা নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ রেখেছে।

কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই মেয়ে শ্বেতাঙ্গ।

ওর টুঁটি চেপে ধরে আতঙ্ক। বহুকষ্টে নিজেকে শান্তসংযত রাখে। তার লোকজন চলে আসবে যে-কোন মুহূর্তে, কোনমতেই এ-সব ওদের নজরে পড়তে দেওয়া চলবে না।

সহসা সমাধান পেয়ে যায় ও। দিন কয়েক আগের ঘটনা, চাক ওয়াগনের কাছে দাঁড়িয়েছিল সে, হঠাৎ একটা বুলেট ওর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। অনুমান করেছিল কোনও লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলি হয়ে থাকবে ওটা, সম্ভবত পাহাড়ের ওপর দিকে শিকারে বেরিয়েছে কেউ। সিদ্ধান্ত নেয় এখন সে-ঘটনাকেই নিজের পক্ষে ব্যবহার করবে।

লাশটা তড়িঘড়ি করে লুকিয়ে দ্রুত দলের কাছে ফিরে গিয়েছিল ভিক্টর। ওদের জানায় গুলি করা হয়েছিল তাকে, এবং তারপর ওসমান আর তার ঘোড়ার বর্ণনা দিয়েছিল।

'ওকে খুঁজে বের করে খুন করবে!' নির্দেশ দেয় ও। 'বুঝেছ আমার কথা— খুন করবে!'

কিন্তু সে মরেনি, বরং গ্লোবে গিয়ে ফাঁস করে দিয়েছে আসল ঘটনা। এবং এর অল্প কদিনের ভেতর লেযি এ-র অধিকাংশ পুরানো কর্মচারী ভিক্টরের দল ছেড়ে চলে গেছে।

ভাড়াটে বন্দুকবাজদের ও বলেছে ওরিনের দাবি আসলে বানোয়াট, মিথ্যায় ভরা; কিন্তু মনে মনে ঠিকই জানে একমাত্র মেয়েটার স্বামীকে মারতে

পারলেই এ-যাত্রা রেহাই পাবে সে। গোড়ায় ওর নাম জানত না ভিক্টর, এবং তার কোনও প্রয়োজন বোধ করেনি। ওর চোখে আজও ওরিন নিছক 'ভবঘুরে,' ফালতু একটা লোক, রবাহুতের মত একজন ধনী গরু ব্যবসায়ীর পথের কাঁটা হয়ে আছে।

লোকটা মারা গেলে, ভিক্টর নিশ্চিত ছিল, পুরো ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে পারবে ও। কিন্তু যখন দেখল সাফল্য এত সহজে আসবে না, তখন লোরনাকে নিয়োগ করল। লোরনা সুন্দরী যুবতী, এল প্যাসোর পশ্চিমে কেউ চেনে না ওকে। দুশো ডলারের বিনিময়ে একজন অচেনা লোকের সাথে রাতে কাটাতে সহজেই রাজি হয়েছিল মেয়েটা। ওর দায়িত্ব ছিল মাঝরাতে সাহায্যের জন্যে চিৎকার জুড়বে। ভিক্টর বুঝিয়েছিল ওকে, আসলে পুরো ব্যাপারটাই একটা তামাসামাত্র। লোরনা অবশ্যি বিশ্বাস করেনি ওর কথা, কিন্তু দুশো ডলারের লোভে রাজি হয়ে যায়। গত তিন বছরে এক সঙ্গে অত টাকা উপায় করেনি ও, তা ছাড়া এ-টাকা দিয়ে স্যান ফ্রান্সিসকো গিয়ে নতুন করে জাঁকিয়ে বসতে পারবে।

অবশেষে, ভাবছিল ভিক্টর, সাফল্য তার মুঠোয় এসে গেছে। তার লোকেরা ওসমানকে এমন জায়গায় কোণঠাসা করেছে যেখান থেকে বেরোতে পারবে না সে। তার ভয় এখন একটা প্রচণ্ড, অযৌক্ত ঘৃণায় পরিণত হয়েছে। তাই ওরিন ওসমানের মৃত্যুর সময়ে রুডলফ ভিক্টর সশরীরে হাজির থাকতে চাইছে ঘটনাস্থলে।

দোকানের সামনে আড়ষ্টভাবে গোড়া থেকে নেমে দরজার দিকে এগিয়ে গেল ও। দোরগোড়ায় মুহূর্তের জন্যে থেমে আর একবার তাকাল চারদিকে–যদিও দেখার মত বিশেষ কিছুই ছিল না।

অগলট্রির দোকান যখন তৈরি হয়, ওয়াইল্ড রাইতে তখন থাকার মধ্যে ছিল একটা ছোট্ট কাঠের কেবিন, ইন্ডিয়ান হামলা মোকাবেলার জন্যে অস্থায়ী ট্রেঞ্চ আর রাই ক্রীকের অপর তীরে দুটো ইন্ডিয়ান কুটির। দোকানের উল্টো দিকে খুঁটির কোরাল এবং একটা লম্বা একচালা। ওখানে অগলট্রি তার মদ চোলাই করে।

দোকানের ভেতরটা অপরিচ্ছন্ন, সাদামাঠা। লম্বা বার, পেছনে কয়েক সারি তাক, কিছু ছড়ানো ছিটানো টেবিল-চেয়ার, একটা বড় বাক্স এবং নড়বড়ে চৌকি একটা। তাকে কিছু খালি বোতল, ছয়টা এক গ্যালনি ক্যান, কার্তুজের বাক্স আর হরেক রকমের সস্তা অথচ চটকদার সাজ-পোশাকের জিনিস সাজানো। ইন্ডিয়ানরা পছন্দ করে ওগুলো। কাউন্টারের পাশেই একটা নিচু বেঞ্চ, তার ওপর ছিপি-লাগানো পিপে রাখা। এবং ঘরের একধারে ফায়ারপ্লেস।

'খাওয়ার কী আছে?' মিলিটারি মেজাজে জানতে চাইল ভিক্টর।

ঝাড়া একটা মিনিট দুই ওসমানের এঁটো থালাবাসন সাফ করল অগলট্রি, তারপর জবাব দিল, 'স্ট্যু।'

'ভাল?' ভিক্টর জিজ্ঞেস করল। 'মানে, খাওয়া যাবে তো?'
'মাত্র খেয়ে গেল দুজন। কোনও অভিযোগ করেনি।'
'আমার লোকদের কেউ?'
ঘুরে ভিক্টরের মুখোমুখি হলো অগলট্রি। দৃষ্টিতে চাপা কৌতুক। 'তোমার লোকজনকেই নাকি খুঁজছে ওরা– তাই বলল। ওদের নাম ওসমান।'
ঝট্ করে পলক তুলল ভিক্টর। সবে ঘরে ঢুকেছে সনোরা মেকন। সেও শুনতে পেয়েছিল। 'তরুণ? কম বয়েসী ছোকরা?'
'একজন আঠারো বা ওইরকম...অন্যজন বছরখানেক বা তার কিছু বড় হবে। অবশ্যি সবই আমার অনুমান। তবে, তরুণ।
'ডডি, রাইল্যান্ড আর কলিঙ্গকে ওরাই খুন করেছে,' বলল মেকন। 'বস্, এইবেলা গেলে ওদের ধরতে পারব।'
'থামো,' বাগড়া দিল ভিক্টর। 'পরে গেলেও হবে। আমার খিদে পেয়েছে।'
'ওরা পালাবে না,' মন্তব্য করল অগলট্রি, 'অন্তত ওই দুজন নয়।'
'তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি,' ধমক লাগাল ভিক্টর। 'আচ্ছা, দাও– তোমার ওই স্ট্যুই দাও।'
খাওয়া সেরে সিগার ধরিয়েছে ও, এমন সময়ে ড্যাঙ্গার এসে হাজির হলো। লেযি এ-র কাজ ছেড়ে দিয়েছে ড্যাঙ্গার, এবং এ-জন্যে সে খুশি, কিন্তু তার কাছে গরম খবর আছে–প্রাক্তন সহকর্মীদের না জানিয়ে স্থির থাকতে পারছে না। স্যালুনে ঢুকে এক কাপ কফির ফরমাস দিল সে।
তারপর ঘাড় ফিরিয়ে রুডলফ ভিক্টরের দিকে তাকাল। 'আপনার একজন নতুন পার্টনার হয়েছে,' বলল ও।
'মানে?'
কাঁধ ঝাঁকাল ড্যাঙ্গার। 'আপনি যাদের নিয়োগ করেছেন, এসেই তাদের বরখাস্ত করেছে লোকটা। মানে যারা ক্যাম্পে ছিল। বলেছে বন্দুকবাজির জন্যে কাউকে এক পয়সাও দেবে না।'
স্যালুনে উপস্থিত আর সবাই গোগ্রাসে গিলছে ওর কথা।
'যা বলার স্পষ্ট করে বলো?' খেঁকিয়ে উঠল ভিক্টর।
'প্রিটস তার অংশ বেচে দিয়েছে। এতক্ষণে সে প্রেসকটের অর্ধেক রাস্তায়।'
'বাজে কথা,' মুখ বাঁকাল ভিক্টর। 'ওর সে-সাহস হবে না, তা ছাড়া কিনবে কে?'
'খদ্দের এসেছিল।' ড্যাঙ্গার আর একটু ঝুলিয়ে রাখতে চাইছিল, কিন্তু কথাটা শোনার পর ভিক্টরের মুখের অবস্থা কেমন হয় সেটা দেখার লোভ সামলাতে পারল না। 'লোকটার নাম মাইকেল ওসমান।'
জড়পিণ্ডের মত বসে রইল ভিক্টর। নিজের হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে পাচ্ছে, হাতুড়ির ঘা পড়ছে ওর বুকে। টেবিলের ওপর অলসভাবে পড়ে আছে ওর বিশাল হাতজোড়া, ঘোলাটে মাথায় খবরটা হজম করার প্রয়াস পাচ্ছে।

প্রিস্ট বেচে দিয়েছে...বেচে দিয়েছে! নতুন পার্টনার এসেছে। তার নাম মাইকেল ওসমান। ওর লোকজনকে জবাব দিয়েছে ওসমান।

'বানিয়ে বলছ না তো? ড্যাঙ্গ, কসম খোদার, তুমি যদি–'

'একটুও না,' ন্যাকা সাজল ড্যাঙ্গার। 'অ্যাল য্যাব্‌রিসকি মারা যাওয়ার পরপরই তো ঘটল সব কিছু।'

স্ট্যুর বাটির দিকে গুম মেরে তাকিয়ে রইল ভিক্টর। স্বাদু ঘ্রাণ, কিন্তু হঠাৎ করে তার বদহজমের ভাব হলো। আর প্রশ্ন করার সাহস নেই ওর, জবাব শুনতে ভয় হচ্ছে। নিঃসন্দেহে, কোনও এক ওসমানের হাতেই মারা পড়েছে অ্যাল।

এখন আর অপেক্ষা করার কোনও অর্থ হয় না, ড্যাঙ্গারও তা বুঝতে পারছে। একটা কনুই বারের ওপর রেখে নিজের কাপের দিকে তাকাল ও। 'নোয়েল ওসমানের কাজ। নাম শুনেছ বোধ হয়'– বন্ধুদের উদ্দেশে ঘুরল ড্যাঙ্গার– 'আউট-ল, গোটা ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলের ত্রাস। ওর সাথে আরও লোক আছে। মাইকেল আর ক্রিস ওসমান। আর, টিংকার নামের একজন।

'সারা দেশ থেকে ছুটে আসছে ওরা, মি. ভিক্টর। আমার পরামর্শ যদি নেন, এখনই স্যাডলে চেপে পালিয়ে যান এখান থেকে। মনে হয় না শেষ-রক্ষা হবে, তবু চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ওই পাহাড়ী ছোকরাদের মাঝে ভীষণ একতা– আপনার পিছু ছাড়বে না।'

'চোপ্!'

সবাই চুপ করে আছে। কাউন্টারের নীচ থেকে একটা বোতল নিয়ে ড্যাঙ্গারের দিকে এগিয়ে দিল অগলট্রি, পরিবেশ হালকা করতে চাইছে। 'আমার তরফ থেকে,' বলল সে।

নিজের চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল রুডলফ ভিক্টর, গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বন্দুকবাজরা অনুসরণ করল তাকে। বাইরে, মৃদু গলায় মুখ খুলল সনোরা মেকন। 'বস্? আপনার ওই পার্টনারের কী হবে? সত্যি কি আমাদের বেতন বন্ধ করতে পারে ও?'

'তোমরা আমার কর্মচারী!' ঝামটা মারল ভিক্টর। 'ওকে না হলেও চলবে। টাকা আমার সাথেই আছে!' বলে নিজের বেল্টে চাপড় দিল।

আড়চোখে রোমেরোর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল মেকন। রোমেরো নীরবে কাঁধ ঝাঁকাল। 'নিশ্চয়ই,' বলল মেকন। 'ঠিক আছে, বস্।'

দোকানের ভেতরে হঠাৎ বেসুরো গলায় গান ধরল কেউ একজনঃ 'দ্য হান্টারস অভ কেনটুকি।' অগলট্রি তালি বাজিয়ে গলা মেলাল।

ভিক্টর, রাগে কদাকার দেখাচ্ছে মুখ, স্যাডলে চেপে রওনা হলো উত্তরে, রাই ক্রীকের উজানে।

ঘাবড়াবার কিছু নেই, নিজেকে বলল সে। ওরিন ওসমান এখন খুব বেশি

হলে চোদ্দ-পনেরো মাইল দূরে আছে। মেসার দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে ওর—পালানোর সব পথ বন্ধ।

আজ রাতেই ওখানে পৌঁছে যাবে ওরা।

ষোলো

তা হলে শেষ-পর্যন্ত আমি, উইলিয়ম ওরিন ওসমান, এখানে এসে ঠেকেছি। কামবারল্যান্ডস, আমার দেশ থেকে বহু, বহুদূরে এসেছি... মগলোনসের দেয়ালে পিঠ দিয়ে মরব বলে।

এই সুদূর পথ পাড়ি দিয়েও কিছু করতে পারলাম না জীবনে, ভীষণ খারাপ লাগছে আমার। ইউনিয়নকে বাঁচাব বলে গৃহযুদ্ধে দেশের হয়ে লড়েছি, আবার তাই লড়ব। ইন্ডিয়ানদের সাথেও যুদ্ধ করেছি আমি, টেক্সাসের উত্তর থেকে মন্ট্যানায় গরুর পাল নিয়ে গিয়েছি, সাহায্য করেছি বসতি ড়ে তোলার ব্যাপারে।

কিন্তু প্রয়োজনে সে-সব কিছুই কাজে এল না। ড্রুসিলা নিহত হয়েছে, এবং সেই একই লোকের হাতে আমার মৃত্যুও অত্যাসন্ন। কোনও পুত্রসন্তান রেখে যেতে পারলাম না আমি।

ভিক্টর বেঁচে থাকছে, এই দুঃখই আমাকে পীড়ন করছে সবচেয়ে বেশি। আমার মানসীকে খুন করেছে ও। শুনেছি প্রতিশোধের কথায় অনেকে ভ্রূ কোঁচকায়। হয়তো সেটাই ঠিক, কিন্তু আমি পাহাড়ের লোক, সামন্ত পরিবেশে মানুষ, বড় হয়েছি সামন্ত ভাবধারায়, মোজেজের চোখের বদলে চোখ এই আইনই আমাদের আইন।

ওরা অপেক্ষা করছে এখন, চূড়ান্ত আক্রমণের আগে কারও আসার প্রতীক্ষায় রয়েছে। সেই প্রতীক্ষিত লোকটা নিশ্চয়ই রুডি ভিক্টর। এখানে উপস্থিত থাকতে চাইছে সে, নিশ্চিত হতে চায় যে সত্যিই আমি মারা গিয়েছি। আমার মরা চোখের পানে তাকিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে চায় ও। এ নিয়ে গুঞ্জন উঠবে, কিন্তু ভিক্টরের বন্দুকের মুখে অচিরেই থিতিয়ে যাবে সব কিছু। বিশেষ করে একমাত্র যে-লোকটি ভিক্টরকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারত সে-ই যখন কবরবাসী হতে চলেছে।

তা হলে ওর অপেক্ষাতেই আছে ওরা। তার মানে ও না আসা পর্যন্ত যেভাবেই হোক টিকে থাকতে হবে আমাকে। টিকে থাকতে হবে, এবং একটা বুলেট বাঁচিয়ে রাখতে হবে ওর জন্যে। আমি মারা যাব তাতে আফসোস নেই, কিন্তু ওকে ধ্বংস করতেই হবে।

লুকোতে পারব এমন জায়গার সন্ধানে নজর বোলালাম চারপাশে।

পালানোর পথ নেই কোনও, তার শক্তিও নেই আমার। একমাত্র উপায় গর্ত খোঁড়া, অথচ এখানকার মাটি কঠিন– পাথুরে।

পেছনে সটান উঠে গেছে পাহাড় চূড়ো। নীচের অংশে বিক্ষিপ্ত সিডার ঝোপ। ভাঙা, নোনা-ধরা পাথর, অধিকাংশই ধসে পড়েছে ওপর থেকে। ডানে-বাঁয়ে ক্যানিয়নের ঢাল খাড়া, তবে আড়াল পেলে একজন লোকের পক্ষে হামাগুড়ি দেওয়া সম্ভব। আমার সামনে একটা সরু নালামত রয়েছে। বেশ কয়েক গজ লম্বা। আসলে চূড়ো থেকে বড় বড় পাথরচাঁই খসে পড়ে দেয়াল তুলেছে দুদিকে, তাই মাঝখানের জায়গাটা নালার মত দেখাচ্ছে। চাঁইগুলোর ফাঁক-ফোকরে সিডার আর চিরহলুদ ইয়াকে ঝোপ। ফলে নড়াচড়া করলেও সহজে কারও চোখে পড়ব না আমি।

চেষ্টা করলে পথ মেলে না এমন জায়গা খুব কমই আছে, কেবল বুকের পা-টা আর শক্তি থাকা চাই। দুটোই যথেষ্ট পরিমাণে ছিল আমার, কিন্তু গত কদিনের ধকল আর জখমের দরুণ ভাটা পড়েছে কিছুটা।

ছেঁড়া শার্টের ভেতর দিয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলাম আমি। আমার স্বাস্থ্য একেবারে খারাপ নয়। একহারা তবে পেশীবহুল। কিন্তু এখন পাঁজরের প্রতিটা হাড় গোনা যাচ্ছে। বুড়ো বেতো ঘোড়ার মত অবস্থা হয়েছে, কিছু হাড় আর চামড়া রয়েছে শুধু।

কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে ওদের ওপর নজর রাখলাম আমি। সম্ভবত ওরা জানে আমি কোথায় রয়েছি, তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্যে নীচে খোঁজাখুঁজি করছে। হঠাৎ করেই আইডিয়াটা খেলল মাথায়।

আমার বল নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। ওপরে গিয়ে খুব যে একটা লাভবান হব তা নয়, কেবল একটু উঁচু জায়গায় মরার সুযোগ পাব এই যা তফাত। সুতরাং ওরা যখন নীচে ওদের তল্লাশি শেষ করবে, তখন আমি নিঃসাড়ে নেমে গিয়ে ওদেরকে ওপরে যাওয়ার সুযোগ দিলে কেমন হয়?

একবার যদি নামতে পারি, ওদের কয়েকটাকে এমন জায়গায় বাগে পাব আমি, যেখানে আমাকে কোণঠাসা করে মারতে চেয়েছিল ওরা। তা ছাড়া রুডি ভিক্টর যখন আসবে, তাকেও নাগালের মধ্যে পাব।

সন্তর্পণে নীচের এলাকা জরিপ করলাম আমি, আশার আলো দেখলাম।

আমার মাঝে একজন ইন্ডিয়ান বাস করে, যদিও রক্তে নয়– শিক্ষায়, চিন্তাভাবনায়। ছোটবেলায় চেরোকীদের সাথে পাহাড়ে খেলাধুলো করেছি। পর্বতমালার পশ্চিমে বাস করত বলে ওদের উপাধি ছিল পাহাড়ী চেরোকী বা ওভারহিল চেরোকী। কীভাবে নিজেকে গোপন রেখে আশপাশে নজর রাখতে হয় ওদের কাছেই শিখেছি আমি। তাই অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালাম নীচে, নামার রাস্তা দেখতে পেলাম। শুধু একটা পথই খোলা রয়েছে আমার সামনে।

এই অবস্থায় ওদের দিকে এগিয়ে যেতে পারি আমি এতটা আশা করবে

না ওরা। সম্ভাব্য জায়গাগুলোতে নজর রাখবে কেবল। আমার রাস্তাটা তেমন নয়...আড়াল নেই। কিন্তু আমি জানি লুকোনোর জন্যে সন্ধানকারীর মনের চাইতে সেরা জায়গা আর হয় না। প্রতিটা লোকের মনেই একটা অন্ধ এলাকা থাকে। সাধারণত অপ্রত্যাশিত কোনও জিনিস দেখতে পায় না সে। বিশ্বাস করে না, বা অসম্ভব বলে মনে হয় এ-ধরনের কোন ব্যাপারে তার মন প্রায়শ সাড়া দেয় না। আমি যে-পথ বেছে নিয়েছি একমাত্র অ্যাপাচি ছাড়া আর কেউই নামতে সাহস পাবে না ওই পথে। এবং ওখানে যদি আদৌ অ্যাপাচিরা থেকে থাকে, একজন শ্বেতাঙ্গ লোকের কাছ থেকে অ্যাপাচি-চিন্তাভাবনা আশা করবে না তারা।

বাঁয়ে একচিলতে খোলা জমি, মাটিতে মিশে ওখানে গেলাম আমি। হুঁশিয়ার রয়েছি, সামান্যতম শব্দে আমার সব আশা-ভরসা ভেস্তে যেতে পারে।

একটা বড় পাথরচাঁইও নেই এখানে। সরু নালা, ফাটল, বা ঝোপ নেই। অসমতল ঊষর মাটি, মাঝে-মধ্যে বিক্ষিপ্ত পাথর, আয়তনে মানুষের মাথার সমান। ইয়াকে ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে জংলা ঘাস, তবে খুব একটা বড় নয়।

প্রথমে ধুলো মাখিয়ে রাইফেলের ব্যারেল থেকে চকচকে ভাব তুলে ফেললাম আমি। ধুলোবালি আর ঘামে মাটির নিজস্ব রঙ ধারণ করেছে আমার শরীর, জামাকাপড়।

মাটিতে পেট ঠেকিয়ে রওনা হলাম। সিডার ঝোপের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি ইঞ্চি ইঞ্চি করে। প্রায় খোলামেলা একটা জায়গায় এসে শুয়ে বিশ্রাম নিলাম একটু। তারপর আবার এগোতে লাগলাম, এত আস্তে যাচ্ছি যে মনেই হয় না আদৌ নড়ছি।

অ্যাপাচিরা করেছে এ-রকম...অন্তত একটা ঘটনার কথা আমি জানি যেখানে এক লোক তার ঘোড়ার গলায় দড়ি বেঁধে ঘোড়াটাকে ঘেসো জমিতে ছেড়ে দিয়েছিল, আর দড়ির শেষ-প্রান্ত রেখেছিল নিজের হাতে। উজ্জ্বল ভরদুপুরে এক অ্যাপাচি চুপিসারে এসে, দড়ি কেটে ঘোড়া নিয়ে চম্পট দেয়। লোকটা বাধা দেওয়ার অবকাশ পর্যন্ত পায়নি, দড়ি হাতে হাবার মত তাকিয়েছিল শুধু।

ধুলোর মত শুকিয়ে আছে আমার মুখ, পিপাসা আর ধরা পড়ার ভয়ে। ধড়ফড় করছে বুক; খিদে, ক্লান্তিতে মাথা ঝিমঝিম করছে। কিন্তু রাইফেল ছাড়িনি, যখন মওকা আসবে, তখন যদি এর ভর রাখার মত একটা কিছু পাই, অনেক সঙ্গীসাথী নিয়ে মরলোকে যাত্রা করব আমি।

দীর্ঘ, ধীরে একটা ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। একবার আমার কয়েক ফুটের ভেতর মচ্ শব্দে গাছের ডাল ভাঙল এক পাটি বুট, নিমেষে জায়গায় জমে গেলাম আমি। আর একবার, টুকরো কথার আওয়াজ পেলাম। ও'ল্যারির স্যালুনে গোলমাল হয়েছে, সেই গল্প জুড়েছে কয়েকজন। তারপর হঠাৎ

নোয়েল ওসমানের নামটা কানে এল।

নোয়েল! তা হলে সেও এসেছে। নোয়েল একজন আউট-ল ওসমান, ভীষণ ডাকাবুকো মানুষ, কিছু দিন আগে ক্যালিফোর্নিয়াতে বিপদের সময়ে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। হয়তো আমি বাঁচব না, কিন্তু এই গ্রীষ্ম বিদায় নেওয়ার আগেই ওসমানদের ভয়াল রূপ ওরা হাড়ে হাড়ে টের পাবে জেনে স্বস্তি বোধ করলাম খানিকটা।

আমি মারা যাব এতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই, এখান থেকে বেরোনোর কোনও পথই দেখতে পাচ্ছি না। অনেকক্ষণ হলো মরার মত নিশ্চল হয়ে পড়ে আছি ফাঁকা জায়গায়, চারপাশে শিকারী লোকজন– আমাকে খুঁজছে। প্রতিমুহূর্তে উপলব্ধি করছি, ওদের অনুসন্ধিৎসু মনই আমার রক্ষাকবচ। কারণ এই মুহূর্তে ওরা ওপরে তল্লাশি চালাচ্ছে, নীচে নয়।

হঠাৎ ট্রেইলে মেঘ ডাকার মত খুরের আওয়াজ পেলাম আমি। জনাকয়েক অশ্বারোহী আসছে। তারপর হেঁড়ে গলা শোনা গেল একটা এবং আমার ভেতরটা ঝাঁকি খেলো প্রবলভাবে, মনে হলো একটা হার্টবিট বোধ হয় মিস্ করলাম আমি, এবং তারপর প্রচণ্ড ঘৃণা জাগল আমার মাঝে– পরিষ্কার উপলব্ধি করছি ওই কণ্ঠস্বরের মালিকই আমার লক্ষ্য।

'ওকে আমরা বাগে পেয়েছি, মি. ভিক্টর,' জবাব দিল কেউ একজন। 'ওপরের ওই পাথরগুলোর আড়ালে আছে। চুড়োর দিকে পাহারা বসিয়েছি আমরা– বাচাধন আর পালাতে পারবে না।'

'ঠিক আছে। যাও, ধরো ওকে।' আবার সেই গলা...কত দূরে আছে ও?

তক্ষুণি রওনা হলো ওরা...কমপক্ষে দশ-বারোজন হবে, চুড়োর কাছে আরও আছে। ওদের পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি, পেছনে হাত বাড়িয়ে হোলস্টারের ঢাকনা সরালাম।

'ওর পেছনের ওই পাথরটায় গুলি করো,' বলল একজন। 'সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসবে।'

মুহূর্তে দুই গণ্ডা উইনচেস্টারের গর্জনে কান বধির হয়ে গেল আমার, এইসময়ে ওখানে থাকলে, একমাত্র দৈব ছাড়া কেউ রক্ষা করতে পারত না আমাকে।

'বোধ হয় মারা গেছে,' চেঁচিয়ে বলল আর একজন। 'ওর কোনও চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না।'

সামনে থেকে একটা গলা ভেসে এল। 'না, এখানেই থাকো,' ভিক্টর বলছে, 'এখান থেকেই পাহাড়টা ভাল দেখা যায়। ওদেরকে ফাঁকি দিতে পারলেও, আমাদের পারবে না।'

'বস্,' আচমকা বলে উঠল একজন, 'কারা যেন আসছে এইদিকে!'

'আমাদেরই কেউ হবে, মেকন। ওদের আসতে বলেছি আমি।'

'কিন্তু পরিচিত বলে মনে হচ্ছে না।' মেকনের কণ্ঠে সংশয়।

'আরে, পাহাড়ের ওপরেও একদল আছে দেখছি।' উচ্চারণে স্প্যানিশ টান... ও-ই কি রোমেরো, মেক্সিকোর কুখ্যাত পিস্তলবাজ? 'কালো কোট-পরা লোকটা কে?'

একদম অনড় হয়ে আছি আমি, কিন্তু মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে। দুর্বোধ্য ঠেকছে সব কিছু, ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছি। মাথা তুলতে সাহস পাচ্ছি না। সন্দেহ নেই, আমি ওদের দৃষ্টিসীমার মাঝে রয়েছি, সামান্যতম নড়াচড়াও চোখে পড়বে। তবু, যা করার এখনই করতে হবে।

বাঁ-হাতে রাইফেলটা সামনে ঠেলে দিলাম আমি, পাথর থেকে দূরে সরিয়ে রাখছি, ঘষা লাগলে বিপদ হতে পারে। তারপর মাথা জাগিয়ে তাকালাম নাক বরাবর। অনতিদূরে একটা বিয়ার ঘাসের ঝোপ, আমার বাঁয়েও আছে।

সহসা পেছনে চেঁচিয়ে উঠল কেউ একজন। 'নেই! শালা, ভেগেছে হারামিটা।'

পরমুহূর্তে আর একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। চেনা গলা।

'হাতিয়ার ফেলে দাও সবাই...খুলি উড়িয়ে দেব!'

বক্তা আমাদের অ্যাঞ্জেল... অ্যাঞ্জেল, এখানে?

রেকাবে ভর রেখে দাঁড়িয়ে আছে ভিক্টর... এই প্রথম আমার শত্রুকে সামনাসামনি দেখলাম আমি।

'ব্যাপার কী?' ক্রুদ্ধ সুরে বলল সে। 'তুমি কে?'

এইবার আমার পালা, চট করে উঠে দাঁড়ালাম। বাঁ-হাতে রাইফেল, ডান হাত কোল্টের বাঁটে।

চোখের কোণে দেখলাম পাহাড়ের ওপর একসার লোক, নেমে আসছে ধীরে ধীরে।

অ্যাঞ্জেল আর ও'নীল আছে ওদের মাঝে। আরও কয়েকজন রয়েছে যাদের চিনি না আমি।

আমার সামনের তিনজন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখছে ওদের। একটু ডানে রয়েছে প্রতিপক্ষ। আমার নাগালের মধ্যে একটা অকোটিও গাছ, একরাশ শক্ত শুঁড় তুলে দাঁড়িয়ে। এবং এর ঠিক পেছনে একটা ইয়াকের ঝোপ। আমি এত নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়েছি যে এখনও আমাকে দেখতে পায়নি ওরা।

ওদিকে, ট্রেইলের অশ্বারোহীরা এগিয়ে আসছে। তারপর নোয়েল ওসমানের গলা শুনতে পেলাম। 'তোমরা লড়তে চাইছিলে– ঠিক আছে এ-বার তা হলে লড়ো।'

সনোরা মেকন, র‍্যাক রোমেরো, আর রুডি ভিক্টর...তিনজনই এখন তাকিয়ে আছে আমার দিকে। নিজেকে স্থির রাখার জন্যে মাটিতে উইনচেস্টারের কুঁদো ঠেকালাম আমি। ভর ছাড়া রাইফেলটা সোজা রাখতে পারব কিনা সন্দেহ, তবে সিক্সশূটারের ব্যাপারে মোটেও চিন্তিত নই। অনায়াসে গুলি করতে পারব ওদের একটাকে।

রেকাবের ওপর দাঁড়িয়েছিল ভিক্টর, শান্তভাবে বসল স্যাডলে। ঘন দাড়ির নীচে ওর মুখখানা যেন ঈষৎ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

'আমাকে তুমি খুঁজছিলে, ভিক্টর। আর আমি তোমাকে।'

আমার দিকে তাকাল ভিক্টর, পলক পড়ছে না। যে-লোককে খুন করার জন্যে এত আয়োজন ও তাকে দেখছে, না যাকে খুন করবে বলে আশা করছিল তাকে, আমি জানি না, তবে সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করছি আমার ভাগ্যে যা-ই ঘটুক না কেন, রুডি ভিক্টর তার চোখের সামনে আজরাইলকে দেখতে পাচ্ছে।

'ওই লোকগুলো কে?' রাগত সুরে জিজ্ঞেস করল ও।

'ওসমান, বেশির ভাগই,' বললাম আমি। 'টেনেসির ওসমান বংশের লোক ওরা, ঘনিষ্ঠ বন্ধুও আছে কিছু। আমি নিজেও সবাইকে চিনি না ভাল করে।'

ক্যাপ সয়্যার রয়েছে। কানে সোনার দুল-পরা একজনকে দেখলাম। অদ্ভুত চেহারা। অচেনা, তবে আমার বাড়ি পাহাড়ে, তাই টিংকার নামটা শুনেছি।

হঠাৎ দীর্ঘকায় এক লোক আমার পাশে এসে দাঁড়াল। কপালের কাছে পাক ধরেছে চুলে। সৌম্য দর্শন। পরনে চমৎকার ছাঁটের কোট। আগে দেখিনি কখনও তবে চেহারাই বলে দিচ্ছে এও একজন ওসমান। 'আমি শ্যন ওসমান,' নিজের পরিচয় দিল সে।

'এখনই গোলাগুলি শুরু হবে,' বললাম আমি।

'হোক, আমি তোমার পাশে আছি, ওরিন।'

মাথার ওপর আগুন ছড়াচ্ছে সূর্য, অদূরে কোথাও সশব্দে নাক ঝাড়ল একটা ঘোড়া, পা ঠুকল অস্থিরভাবে। হুকুমের অপেক্ষায় রয়েছে ভিক্টরের ভাড়াটে সেনা, কিন্তু ভিক্টর পাথর। একদৃষ্টে মাপছে আমাকে।

তাপ তরঙ্গের নাচ না আমার দৃষ্টিবিভ্রম বলতে পারব না, কিন্তু সব কিছু ঝাপসা দেখছি আমি।

'সহায়-সম্বল বলতে ড্রুসিলার খুব বেশি কিছু ছিল না, মি. ভিক্টর,' বললাম আমি। 'কলর‍্যাডোর পাহাড়ে আমাদের প্রথম সাক্ষাতের কথা আমি জীবনে ভুলব না। ও বলেছিল, "আমি ড্রুসিলা কেরি। আমাকে উদ্ধার করেছ তুমি, ধন্যবাদ দিয়ে তোমাকে খাটো করতে চাই না।" হৃদয় নিংড়ে বেরিয়ে এসেছিল ওর ওই কথাগুলো– তখনই বুঝেছিলাম ও একা, দেখার কেউ নেই।

'ওর নিঃসঙ্গতাকে ভরিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম আমি। তাই এই নতুন দেশে, যেখানে পাইনের সারি রাতে কথা বলে চাঁদের সাথে, পাথরের ওপর দিয়ে ছুটে যায় সুশীতল ঝরনাস্রোত, ওকে নিয়ে এসেছিলাম সুখী করব বলে। ইচ্ছে ছিল ওকে একটা বাড়ি তৈরি করে দেব, সংসার পাতব আমরা, সন্তান মানুষ করব। কিন্তু তুমি তা হতে দিলে না, মি. ভিক্টর। ওকে একা পেয়ে ওর দুর্বলতার সুযোগ নিতে চেয়েছিলে তুমি। কিন্তু ড্রুসিলাকে আমি জানি, ও বাধা

দিয়েছিল তোমাকে। তখন গলা টিপে খুন করেছ। তুমি ওর প্রাণ কেড়ে নিয়েছ, মি. ভিক্টর।'

মেকনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, এগিয়ে এল এক পা। 'উনি এ-রকম কিছু করেছেন বলে আমার জানা নেই।'

'করেছে।'

'করতে চাইনি। ভেবেছিলাম...ওকে কোনও ভবঘুরের বউ বলে মনে করেছিলাম আমি।'

'যাই হোক...মেয়েছেলে তো। আর ভবঘুরের কথা যদি বলো, তুমি নিজেও একজন ভবঘুরে, মি. ভিক্টর! কোথেকে আসছ তুমি? কেন? তোমার পেছনে কি আরও রক্তের দাগ আছে?'

হাঁটু কাঁপছে আমার, কী বলছি নিজেও জানি না ভালমত। ঘোড়ার পিঠে বসে আছে ও, পিটপিট করে তাকাচ্ছে আমার দিকে।

'খোদার কসম,' আচমকা ঘেউ করে উঠল ভিক্টর, 'ওকে খুন করার জন্যে তোমাদের টাকা দিয়েছি আমি। খুন করো, এক্ষুণি!'

নিশ্চয়ই নড়াচড়া করেছিল কোনও বোকা...হঠাৎ তুমুল গুলি-বৃষ্টি শুরু হলো চারদিকে। ইতিমধ্যে আমার হাতেও বেরিয়ে এসেছে কোল্ট, লাফাচ্ছে থেকে থেকে, স্যাডলে-বসা লোকটার দিকে টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছি আমি। দেখলাম পিস্তল তুলছে ও, গুলি করল। পরমুহূর্তে তীব্র যন্ত্রণায় বিকৃত করল মুখ, বুকের কাছে রক্তে ভিজে উঠছে শার্ট। আমার পরের বুলেটটা ওর এক গালের মাংস খুবলে নিয়ে চলে গেল। পড়ে গেল ও, ওঠার চেষ্টা করছে, চিৎকার জুড়েছে দুহাতে মুখ ঢেকে। যতক্ষণ পর্যন্ত পিস্তল খালি না হলো, ওর হাতের ফাঁক দিয়ে গুলি চালিয়ে গেলাম আমি। তারপর বসে পড়লাম হাঁটু ভেঙে, আর কাউকে মারার ইচ্ছে জাগছে না।

আমার কাঁধে হাত রাখল অ্যাঞ্জেল। 'শান্ত হ, ওরিন। শান্ত হ। সব শেষ হয়ে গেছে।'

ঝাড়া দিয়ে ওর হাত সরিয়ে দিলাম আমি। টলমল পায়ে উঠে দাঁড়ালাম। অদূরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মেকন। রোমেরোর খুলির একাংশ উড়িয়ে নিয়ে গেছে একটা বুলেট। বাকি সবাই মাথার ওপর দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে, লড়াই করার শখ মিটে গেছে।

ভিড় ঠেলে আমার সামনে এল ও'নীল। এই প্রথম ওকে পিস্তল ঝোলানো অবস্থায় দেখলাম আমি। 'তোর কিছু হয়নি তো, ওরিন?'

এপাশ ওপাশ মাথা ঝাঁকালাম আমি।

'চল, বাড়ি যাবি,' বলল ও।

পেছন থেকে মাইকেলের গলা ভেসে আসছে। 'পিটার, তুমি আর মিল্টন একটু সাহায্য করো আমাকে, গরুগুলো জড়ো করব।'

গ্লোবে যাত্রাবিরতি করলাম আমরা। বব ও'ল্যারির স্যালুনে সবাই সার বেঁধে দাঁড়ালাম এক সাথে। ইতিপূর্বে আমাদের ওসমান পরিবারের এত লোককে এক সঙ্গে কোথাও দেখিনি আমি...সম্ভবত আর কেউই দেখেনি।

আমিও রয়েছি ওদের মাঝে। চারপাশে তাকিয়ে উপলব্ধি করছি আমি একা নই– জীবনে আর কখনও হব না একা।

***

টোপ

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৮৭

এক

উত্তপ্ত দুপুর। চুলোর মত একটা মরুপাহাড়ের ওপর শুয়ে আছি আমি। পাথরগুলো যেন জ্বলন্ত কয়লা। নীচের সমভূমিতে ডাকিনীর মত উদ্বাহু নৃত্য করছে তাপতরঙ্গ। অ্যাপাচিরা ওত পেতে আছে ওখানে। দূরে অটল পর্বতমালা আকাশ ছুঁয়েছে, শান্ত ছায়া-সুনিবিড়।

জিভ দিয়ে আমার ফাটা ঠোঁটজোড়া ভেজানোর চেষ্টা করলাম। পারলাম না. শুকনো কাঠির মত খটখটে হয়ে আছে। পাথরের চাপ চাপ কালো রক্ত... আমার রক্ত।

অদূরে, শরীরে একটা ছোট্ট বুলেটের ফুটো নিয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে আমার পানির ক্যান্টিন। কিছুটা তলানি বোধহয় এখনও আছে– একবার যদি ওটা হাত করতে পারি, আপাতত বেঁচে যাব।

সমভূমিতে পড়ে আছে আমার সোরেল ঘোড়াটা, মনিবকে বাঁচানোর প্রচেষ্টায় নিজেকে বলি দিয়েছে। পেটে গুলি লেগেছিল ওর। দুটো-একটা জিনিস রয়ে গেছে স্যাডলব্যাগে। নিজের বলতে এ-জীবনে হয়তো ওর চেয়ে বেশি কিছু আর হবে না আমার। দেওয়া-থোওয়ার ব্যাপারে আমার ভাগ্যদেবী বড্ড কৃপণ।

আমরা যখন টেনেসির পাহাড়ে থাকতাম, ওখানকার সবাই বলত আমাদের ওসমানদের সাথে লাগতে যাওয়া বোকামি। ওই অ্যাপাচিরা সে-সব কাহিনি জানে না, আর জানলেও আমল দিত কিনা সন্দেহ।

সাদা চোখে কোনও অ্যাপাচিকে দেখলে হয়তো ততটা দাগ কাটবে না মনে। কিন্তু নিজের দেশে, ঝোপ-জঙ্গল আর পাহাড়ে ওদের মত তুখোড় যোদ্ধা আর হয় না। সম্ভবত সর্বকালের সেরা গেরিলা সেনা এই অ্যাপাচিরা।

রোদে ঝলসে যাচ্ছে চোখ, লোনা ঘামে জ্বালা করছিল, বার দুয়েক পিটপিট করে চোখ কুঁচকে নীচের দিকে তাকালাম আমি। রাইফেলের কুঁদো কাঁধে ঠেকানো, দৃষ্টি সজাগ। আমার মুখ শুকনো, আঙুলে খিল, রাইফেলের গা এত তেতে রয়েছে যে কোনও নিশানা না দেখা পর্যন্ত ট্রিগার ছুঁতে সাহস পাচ্ছি না।

বন্ধু বিলি হিগিন্সের লাশ নীচের ট্রেইলে পড়ে আছে: নির্যাতনের কবল থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে শেষ-পর্যন্ত ওকে গুলি করতে বাধ্য হয়েছি আমি।

তখন ভোর, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। আমরা পুবে যাচ্ছিলাম, আচমকা এই অ্যাপাচি হামলা। এটা ওদের এলাকা নয়, পিমা বা পাপাগো ইন্ডিয়ানরা বাস করে এখানে। শ্বেতাঙ্গদের সাথে ওদের সম্পর্ক ভাল, কিন্তু অ্যাপাচিদের সঙ্গে একদম বনিবনা নেই– যুদ্ধ লেগেই আছে।

অপ্রত্যাশিত আক্রমণে হকচকিয়ে গেলাম আমরা, যে-যার প্রাণ বাঁচাতে

ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। একটা পাহাড় লক্ষ্য করে ছুটে গেলাম আমি আর বিলি হিগিন্স। ওখানে তবু কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

হঠাৎ একটা গ্রীজউড ঝোপের পেছন থেকে উঠে দাঁড়াল এক অ্যাপাচি, হাতে .৫৬ স্পেন্সার। বিলির পেট এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল সে। সেব্যরের পোঁচ দিলে যেমন হয়, তেমনি হাঁ হয়ে গেল, বেরিয়ে পড়ল ভেতরের সবকিছু। আমার মত বিলিও বুঝতে পারল সে মারা যাচ্ছে।

যেখানে লুটিয়ে পড়েছিল ও, ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে ফিরে এলাম আমি। শান্ত অপলক চোখে তাকাল বিলি। বলল, 'ওরিন, আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে– তুমি পালিয়ে যাও।'

বুলেটের ধাক্কায় ওর স্নায়ু অসাড় হয়ে আছে, তবে আর দু-এক মিনিটের মধ্যে যন্ত্রণা শুরু হবে।

মাটিতে নেমে ওকে তুলতে চাইলাম আমি, ও বারণ করল। 'দোহাই, ওরিন, টানাটানি কোরো না– নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে যাবে। তুমি চলে যাও। পাহাড়ের ওপর থেকেই বরং আমার বেশি উপকার করতে পারবে– দূরে রাখতে পারবে ইন্ডিয়ানদের।'

বিলির কথায় যুক্তি ছিল। নিমেষে পাহাড় লক্ষ্য করে ঘোড়া ছোটালাম আমি যেন আমার সোরেলের লেজে আগুন লেগেছে। কিন্তু বেশিদূর যাওয়া হলো না, গুলির শব্দ কানে এল, টের পেলাম ঘোড়ার লয় কেটে গেছে। টলছিল, তবু আপ্রাণ চেষ্টায় সোজা রাখল নিজেকে, এগিয়ে গেল আরও পঞ্চাশ গজ, তারপর ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু– এবং ও লুটিয়ে পড়ার আগেই ঝাঁপ দিয়ে মাটি কামড়ে ধরলাম আমি। ওদিকে, বুলেটের আঘাতে আশপাশের মাটি উড়ছে।

প্রায় খাঁজের মাথায় চলে এসেছি আমি, হঠাৎ একটা বুলেট লাগল আমার গায়ে। বলতে কী, ওটাই রক্ষা করল আমার জীবন।

আচমকা বুলেটের ধাক্কায় লাট্টুর মত একপাক ঘুরে গেলাম আমি, হুড়মুড় করে ঢালের ওপর গড়িয়ে পড়লাম। ঠিক ওই-সময়ে, ওপরে আমি যেখানে ছিলাম পরপর দুটো গুলি বিঁধল সেখানে। অতিকষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে কিছুদূর উঠে গেলাম আমি, ঝাঁপিয়ে পড়লাম একটা গর্তের ভেতর। একটুবাদে যখন একটা অ্যাপাচি দেখা দিল, ত্রিনয়ন সৃষ্টি করলাম ওর কপালে।

সেই থেকে থিতিয়ে এসেছে লড়াই। খোলামেলা জায়গা, পালানোর কোনও পথ নেই, যেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম সেখানেই রয়ে গিয়েছি আমি... এদিকে সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়েছে।

কজন অ্যাপাচি রয়েছে ওখানে আমি জানি না। সাধারণত বিরাট দল নিয়ে মরুভূমি পাড়ি দেয় না ওরা: পনেরো-বিশ, বড়জোর ত্রিশজন জোট বাঁধে একসাথে। অন্তত আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে।

মাঝে মাঝে গুলি হচ্ছে উত্তরপশ্চিম দিকে। এর অর্থ আমার সঙ্গীদের কেউ কেউ বেঁচে আছে এখনও। যাত্রার শুরুতে আমরা মোট ছজন ছিলাম। ইউমায় দেখা হয়েছিল আমাদের, তখন আমরা পরস্পরকে চিনতাম না। সে-কালে

হরহামেশা ঘটত এমনটা। ভ্রমণপথে অধিকাংশ সময়ে মানুষ অচেনা লোকদের সাথী হিসেবে পেত। সামান্য মৌখিক সৌজন্য-বিনিময় ছাড়া এখন অবধি আমরা কেউ কারও ব্যাপারে কোনওকিছু জিজ্ঞেস করিনি। ইন্ডিয়ান এলাকা একাকী পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা বিপজ্জনক, তাই একজোট হয়ে পুবে যাত্রা করেছিলাম।

বিলির মৃত্যুতে কমে গেছে দলের একজন। আমিও খতম করেছি একটা অ্যাপাচিকে। এই মুহূর্তে নিজের ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলে মনে হচ্ছে না আমার। টুসানের বন্ধুরা যদি টেবিলে খাবার সাজিয়ে থাকে, হয়তো অপেক্ষা করাই সার হবে ওদের।

বুকে হেঁটে দু-চার হাত এগিয়ে গেলাম আমি। ছোট-বড় পাথর সাজিয়ে গর্তের কিনারে ব্যারিকেড তুললাম। দেয়ালের এখানে-সেখানে ফোকর রেখেছি, শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং গুলি দুটোই চলবে। খালি খোলগুলো বদলে নতুন টোটা পুরলাম রাইফেলে... বলা যায় না আবার কখন ফুরসত পাব।

অ্যাপাচিদের ধৈর্য অশেষ। প্রতিপক্ষের একটামাত্র ভুলের প্রত্যাশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে পারে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গরা চঞ্চল, নড়াচড়া করে, ফলে মারাও পড়ে।

আমি অবশ্যি তেমন নই। টেনেসির চেরোকী অঞ্চলে মানুষ আমরা। বাবা ছিলেন পাহাড়ি, ছেলেবেলা থেকেই ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়ে এসেছেন। যতদিন তিনি বাড়িতে ছিলেন অনেক কিছু শিখিয়েছেন আমাদের... তা ছাড়া খোদ ইন্ডিয়ানদের কাছেও তালিম নিয়েছি আমি।

এখন আমি যে-গর্তে শুয়ে সেটা বেশি হলে তিন ফুট গভীর। সামনে-পেছনে আট ফুট লম্বা। আমার পেছনে, নীচের যে-অংশে ঝরনাস্রোত নালা সৃষ্টি করেছে সেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে এক প্রান্ত।

রোদে-জ্বলা হলুদ আকাশ। নীচে ঈষৎ গোলাপি প্রান্তর। মাঝে মাঝে মরাটে লাল অথবা কালো ঢিবি। লতাগুল্ম নেই বললে হয়, শুধু কিছু বিক্ষিপ্ত মরুঘাস আর আগাছা।

ধীর লয়ে গড়িয়ে যায় সময়। গরম কমেনি। একতিল হাওয়া নেই। আগের মতই থমথমে পরিবেশ। মাথা না জাগালে ভাল করে দেখা সম্ভব নয়, বাধ্য হয়ে শ্রবণশক্তির ওপর নির্ভর করছি।

কিচ্ছু নেই ঢালের ওপর। কেবল আমার মৃত ঘোড়া আর বিলি হিগিন্সের লাশ পড়ে আছে।

আমি এখানে উঠে আসার পরপর বিলির মরণচিৎকারে আমার পিলে চমকে ওঠে। ঝুঁকি সত্ত্বেও, উঁকি দিয়েছিলাম আমি।

ওর উদ্দেশে জ্বলন্ত তীর নিক্ষেপ করছিল অ্যাপাচিরা। বিলির কাছেপিঠে কোথাও লুকিয়েছিল ওরা, তবে আমার নাগালের বাইরে। বিলিকে নির্যাতন করে আমোদ পাচ্ছিল, এবং সেই সাথে আমাকে খেপিয়ে তোলাও ওদের উদ্দেশ্য ছিল: বন্ধুকে সাহায্য করতে আড়াল ছেড়ে বেরোলেই ঘায়েল করতে পারবে।

বিলির শরীরে তখন তিনটে জ্বলন্ত তীর বিদ্ধ হয়েছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছিল ও। কাতর স্বরে মিনতি জানাল, 'ওরিন, তোমার খোদার দোহাই, গুলি করো আমাকে।'

চড়া রোদে সাদা বালুর ওপর পড়েছিল ও, অবিরাম তীর ছুটে আসছিল ওর দিকে।

'ওরিন!'

আবার সেই যন্ত্রণাকাতর গলা।

সহসা সমস্ত মনোবল এক করে উঠে বসল বিলি, কপালে আঙুল ঠেকাল। 'ওরিন! এইখানে! খোদার কসম!'

অগত্যা ওকে গুলি করলাম আমি। জানি, ওই দশা যদি আমার হত, বিলি এই উপকারটুকু করত।

এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল অ্যাপাচিরা– ওদের মজা মাটি করে দিয়েছি আমি।

চকিতে উঠে দাঁড়াল একজন। তেড়ে আসছিল, যেই আমি রাইফেল তাক করলাম অমনি বসে পড়ল টুপ্ করে, তার বদলে আরেকজন আবির্ভূত হলো, তারপর আর একজন। একবারও টিপ করতে পারলাম না আমি, যেমন উঠেছিল তেমনি আচমকা বসে পড়েছে– তবে প্রতিবারই ব্যবধান কমিয়ে আনছে আগের চেয়ে।

মানুষ মাত্রেই এ-রকম অবস্থায় কিছু না কিছু ভাবে। আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে অ্যারিযোনায়, তবু দেশটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম আমি– কিন্তু এখন মনে হলো না এলেই বোধহয় ভাল ছিল। পালানোর চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠলাম আমি... আবার এও বুঝতে পারছি যে অ্যাপাচিদের হাত থেকে সহজে নিস্তার পাব না।

হঠাৎ বালু ফুঁড়ে উঠে এল এক অ্যাপাচি, তেড়ে এল, এ-বারেও তাক করতে পারলাম না। আমি রাইফেল ঘোরাতে ও বসে পড়ল এবং আরেকজন উঠে দাঁড়াল।

একটা বোকাও এক ভুল বারবার করে না। কাজেই এ-বার আর মারার চেষ্টা করলাম না ওকে, বরং আগেরজন যেখানে অদৃশ্য হয়েছে সে-দিকে চোখ রাখলাম। জানি ঠিক ওই জায়গা থেকে উঠবে না ও, বস্তুত কোনও অ্যাপাচিই তা ওঠে না, বসার পর ডানে বা বাঁয়ে কয়েক ফুট গড়িয়ে সরে যায়।

যা ভেবেছিলাম, আচমকা খাড়া হলো ও, রাইফেলের মাযল মাত্র ইঞ্চিখানেক সরালাম আমি, বাঁকা করলাম ট্রিগার, উইনচেস্টারের বুলেট বেরিয়ে গেল ওর বুক ভেদ করে। সটান ঘুরে গেল ইন্ডিয়ানটা, ও মাটিতে পড়ার আগে দ্রুত লিভার টেনে আরেকবার গুলি করলাম আমি।

এ-বার ধেয়ে এল অন্যরা। ঘায়েল করলাম একটাকে, অপরজন হাওয়া হলো, আমার গর্তের ফুট বিশেক দূরে মাটি কামড়ে ধরেছে।

একটা খতম। আরেকটা আহত, পড়ে আছে খোলা ঢালের ওপর, মনে

হচ্ছে পা ভেঙে গেছে। লোকটার দিকে কড়া নজর রাখলাম আমি, যখন রাইফেল তোলার প্রয়াস পেল নিশানা করার জন্যে ঝুঁকলাম। নিশ্চয় এ-সময়ে বাইরে থেকে আমার উইনচেস্টারের ব্যারেল দেখা যাচ্ছিল, গুলি করল তৃতীয়জন। গর্তের কিনারে আমি যে-দেয়াল তুলেছিলাম তার খানিকটা চলটা উঠে গেল, কুচি পড়ল আমার চোখে।

চকিতে দৌড়ে এল দুই যমদূত। একজন আহত, উরুতে গুলি লেগেছে, তবে আমার অনুমান ভুল, ওর পা ভাঙেনি। রাইফেল নামিয়ে রাখলাম আমি, পাথর পড়ে জ্বালা করছে চোখ, পানি এসে গেছে, বউই নাইফ বের করলাম।

আমি বিরাট মাপের লোক। ছয় ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা। শরীরের যা কিছু মাংস তা কাঁধ আর বাহুতে। বউই নাইফটা বেশ মজবুত, ক্ষুরধার। ওরা গর্তের উদ্দেশে লাফ দিতে আন্দাজে ছোরা চালালাম। আর্তনাদ করে উঠল একজন, হুমড়ি খেয়ে পড়ল আমার গায়ের ওপর। ওর থুতনি লক্ষ্য করে সবেগে হাঁটু হাঁকালাম আমি, তারপর পিছিয়ে এলাম ধাক্কা মেরে।

অ্যাপাচি দুটো ধরাশায়ী হয়েছে। জ্ঞান হারায়নি। ভালমত চোখে দেখতে পাচ্ছি না আমি, খচ্‌খচ্‌ করছে, ওঠার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু আমার রাইফেল আঁকড়ে ধরল একজন। বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি, একঝটকায় সরিয়ে দিলাম ব্যারেলটা, ছোরা চালালাম।

আমাকে ধাক্কা দিয়ে বুকের ওপর থেকে সরিয়ে দিল ও। চিত হয়ে পড়লাম আমি, হাত-পা ছড়িয়ে, চোখের পলকে দুজনে উঠে তেড়ে এল। একজনের পায়ে জখম, অন্যজনের বুক আর বাহু থেকে রক্ত ঝরছে, তবু হাল ছাড়েনি– শরীরে বাঘের তেজ, শুরু হলো হাতাহাতি, অনেকটা বনবেড়ালের ঝগড়ার মত, প্রায় আধ-মিনিট ধুলোয় গড়াগড়ি খেলাম আমরা, তারপর হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেল লড়াই। আমি পড়ে রইলাম মাটিতে, হাঁপাচ্ছি, শ্বাস নিচ্ছি হাঁ করে।

কিছুক্ষণ পর উঠে বসলাম দুহাতে ভর রেখে, চারপাশে নজর বোলালাম।

একজন শেষ। বউই নাইফটা বিঁধে আছে বুকে। হাত বাড়িয়ে ছোরাটা খসিয়ে নিলাম আমি, চোখ অপরজনের দিকে। মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়ে আছে ও, উরুর জখম থেকে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে। কমপক্ষে তিন জায়গায় ছোরা খেয়েছে ও, একটা ডান কোমরে– মারাত্মক চোট।

আমার রাইফেল কুড়িয়ে নিয়ে চেম্বারে একটা টোটা পাঠালাম।

জীবিত অ্যাপাচিটা বিস্ফারিত চোখে দেখছে আমাকে, পলক পড়ছে না। বোধহয় পঙ্গু হয়ে গেছে, ভাবলাম, নড়াচড়া করছে না।

নিহত অ্যাপাচির কার্তুজ বেল্ট টান মেরে খুলে নিয়ে নিজের কোমরে জড়ালাম আমি, মুহূর্তের জন্যে অন্যজনকে দৃষ্টির আড়াল করছি না। এরপর বউই নাইফটা তুলে নিলাম মাটি থেকে, ঝুঁকে রক্ত মুছলাম ওর গায়ে, তারপর খাপে ভরলাম।

এক-এক করে ওদের রাইফেলগুলো সংগ্রহ করলাম আমি। টোটা বের করে নিক্ষেপ করলাম দূরে।

'তুমি সাহসী– তোমাকে মারব না,' ওই ইন্ডিয়ানকে বললাম। 'পারলে চলে যেও।'

আমার ক্যান্টিনটা যেখানে পড়েছিল সেখানে গিয়ে তুলে নিলাম ওটা। অনুমান মিথ্যা নয়, কয়েক ঢোক পানি আছে তলায়, এক চোখ খোলা রেখে পান করলাম।

বেলা ডুবুডুবু। যে-কোনও মুহূর্তে আরও ইন্ডিয়ান এসে পড়তে পারে। আর একনজর গর্তের দিকে তাকালাম আমি। আহত অ্যাপাচিটা শুয়ে আছে এখনও, তবে ওঠার চেষ্টা করেছিল। ওর ঘাড়ের নীচে একটা পাথরচাঁই, সম্ভবত ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেছে ওটার ওপর।

সতর্ক চোখে চারদিক জরিপ করে সমভূমির উদ্দেশে রওনা হলাম আমি। কয়েক কদম যেতে একটা নালা পড়ল। এখন শুকনো, একসময়ে ঝরনাস্রোত বইত। নালায় নামলাম আমি।

হঠাৎ খেয়াল করলাম খোঁড়াচ্ছি। পা থেকে কোমর অবধি অবশ হয়ে আসছে। ব্যাপার বোঝার জন্যে নীচের দিকে তাকিয়েই আঁতকে উঠলাম। আমার কার্তুজ বেল্টে গুলি লেগেছিল, সেই আঘাতে একসাথে বিস্ফোরিত হয়েছে বেল্টের দুটো .৪৪ বুলেট। একটা স্প্লিন্টার লেগে কোমরের সামান্য ওপরে ছড়ে গেছে। তেমন মারাত্মক জখম নয় যদিও রক্ত পড়ছে। কিন্তু মাজার কাছে বেল্টে যে-গুলিটা লেগেছে সেটার ক্ষত বেশ গভীর।

পাহাড়-পর্বত থেকে হামা দিয়ে নেমে আসছে ছায়ারা, হঠাৎ অন্ধকার নামল ঝুপ করে, ঠাণ্ডা হাওয়া ছাড়ল।

একটা গলা শুনতে পেলাম আমি। 'বাঁচতে চাইলে পা চালাও।'

বেন মারফি। বেরিয়ে এল একটা ঝোপের আড়াল থেকে, সঙ্গে ট্যাম্পিকো রোকা আর জেমস গ্রীন। টেলর নিহত হয়েছে।

বাঁ-কানের লতি হারিয়েছে মারফি। রোকার দুজায়গায় সামান্য কেটে-ছড়ে গেছে। গ্রীন পুরোপুরি অক্ষত।

'কটা?' প্রশ্ন করল গ্রীন।

'চার,' বললাম আমি। জানি এতগুলো অ্যাপাচিকে ঘায়েল করা রীতিমত সৌভাগ্যের ব্যাপার, অনেকে সারাজীবনেও পারে না। 'তিনজন খতম, অন্যটার অবস্থা শোচনীয়,' শুধরে নিলাম। তারপর এক সেকেন্ড বিরতির পর যোগ করলাম, 'ওরা বিলিকে শেষ করেছে।'

'চলো, আর দেরি করা ঠিক হচ্ছে না,' তাড়া লাগাল বেন। ওদের ঘোড়াগুলো একটা ঝোপের ভেতর বাঁধা ছিল, আমরা গেলাম সেখানে। দুটো ঘোড়া, আমরা পালা করে চড়ব।

মারফি লম্বায় আমার সমান হলেও, ওজনে বিশ পাউন্ড কম হবে। আমার একশো নব্বই। ও লেখাপড়া জানা লোক। বইয়ের পোকা। যা পায় তাই পড়ে... এমনকী, যখন কিছু পায় না, কৌটোর লেবেলও বাদ দেয় না।

রওনা হলাম আমরা। একটু বাদে ট্যাম্পিকো রোকার ঘোড়ায় চাপলাম

আমি, আর ও হাঁটতে লাগল। ভোরের মুখে, যখন দুটো ঘোড়াই ক্লান্ত এবং আমাদেরও মুখ দিয়ে ফেনা বেরোনোর উপক্রম হয়েছে, সামনে একটা স্টেজ স্টেশন দেখতে পেলাম। সারারাত এক নাগাড়ে পথ চলে ষোলো মাইল অতিক্রম করেছি আমরা; আর ধকল সইছিল না শরীরে, স্টেশনটা চোখে পড়তে আনন্দিত বোধ করলাম।

এগিয়ে গেলাম। স্টেশন যখন আর মাত্র কয়েকশো গজ দূরে, হঠাৎ দরজা খুলে এক লোক বেরিয়ে এল, হাতে রাইফেল। পরিষ্কার বোঝা যায়, ভেতরে জানালার কাছেও রয়েছে একজন– নজর রাখছে।

আমরা উঠোনে পৌঁছুতে প্রথমে গ্রীন তারপর পালা করে অন্যদের দিকে তাকাল লোকটা, তারপর আবার জেমসের কাছে ফিরে গেল ওর চোখ। 'হ্যালো, জেমস? কী ব্যাপার? অ্যাপাচি?'

'দুটো ঘোড়া হবে?' স্টেশন টেন্ডারকে জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'কিনে নেব– যদি বেচতে আপত্তি থাকে, আপাতত ধারই না হয় দাও।'

'ভেতরে এসো।'

শীতল শান্ত পরিবেশ। ঢুকেই সামনে যে-চেয়ারটা পেলাম তাতে ধপ্ করে বসে পড়লাম আমি। উইনচেস্টারখানা রাখলাম টেবিলের একপাশে।

যে লোকটা জানালায় দাঁড়িয়েছিল, রাইফেল হাতে নীরবে রান্নাঘরে ফিরে গেল সে। বাসনকোসন ধোয়ার খুটখাট শব্দ ভেসে এল। স্টেশন টেন্ডার একটা টেবিল থেকে কাঠের গামলা আর মগ এনে রাখল আমাদের সামনে। মগ বলতে রোদে-শুকোনো লাউয়ের খোল। 'আগে পানি খাও,' বলল সে।

বারে হেলান দিল স্টেশন টেন্ডার। 'জেমস, অনেকদিন পর দেখা। আমি ভেবেছিলাম ওরা বুঝি সত্যি সত্যি লটকে দিয়েছে তোমাকে।'

'আরেকটু ধৈর্য ধরতে হবে,' জবাব দিল জেমস গ্রীন।

মগে মুখ ডুবিয়ে ঠাণ্ডা পানি খাচ্ছি আমি। ধীরে ধীরে ফিরে আসছে সাড়া।

চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসে আছে জেমস, সকৌতুকে দেখছে স্টেশন টেন্ডারকে। 'হার্ডি, তুমি এ-লাইনে কবে থেকে?'

'বছর দুই,' বলল হার্ডি। 'বউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেল। ওর ধারণা পশ্চিমে কোনও ভদ্রমেয়ে থাকতে পারে না। এখন বস্টনে আছে। ভালই করেছে গিয়ে, হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি আমি। মাঝে মাঝে টাকা পাঠাই– বলা যায় না আবার কখন ফিরে এসে প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে।'

'ভাগ্যিস বিয়ে করিনি,' মন্তব্য করল বেন। আমার দিকে তাকাল। 'তুমি, ওরিন?'

ক্ষণিকের জন্যে বেদনায় বোবা হয়ে গেলাম আমি। কবরে শায়িত ড্রুসিলার মুখ ভেসে উঠল চোখে, কলর্যাডোর পাহাড়ে আমাদের প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে পড়ল।

'ও মারা গেছে,' ধরা গলায় বললাম আমি।

'সরি,' বলল বেন। 'রোকা?'

'না, সিনর। বিয়ে-ফিয়ে করিনি। একটা মেয়ের সাথে খাতির ছিল, সেও বহুদিন আগের কথা, অ্যামিগোস। মেয়েটার বাবা ছিল টাকার কুমির... আর আমি পথের ফকির। তার ওপর দোআঁশলা– আমার মা ছিলেন অ্যাপাচি গোত্রের মেয়ে।'

মেঝের দিকে তাকিয়ে আছি আমি। কাঠের পাটাতনে মাকড়সার জালের মত ফাটল। আমার জীবনটাও যেন ওইরকম, ছেঁড়া-ছেঁড়া। বারবার পানি খাওয়া সত্ত্বেও তৃষ্ণা মিটছে না, সমস্ত আর্দ্রতা শুষে নিচ্ছে ক্ষুধার্ত শরীর। ঝিমুনি আসছে। দরজার ফাঁক দিয়ে একচিলতে চৌকো রোদ্দুর এসে পড়েছে ভেতরে, গুনগুন করে মৌ-মাছি উড়ছে একটা... শান্তি, আমি তা হলে বেঁচে আছি।

অ্যাপাচিদের রক্ত এখনও লেগে আছে আমার হাতে। ধোয়ার অবকাশ পাইনি, তবে শিগগিরই ধুয়ে ফেলব।

পশ্চিমের স্টেজ স্টেশনগুলো যেমন হয়, এটাও তেমনি– কেবল কাঠের মেঝেটা যা একটু ব্যতিক্রম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেঝেতে শুধু মাটি থাকে, দুরমুজ-করা। গোটা কয়েক কাঠের নড়বড়ে চেয়ার-টেবিল আর বেঞ্চ পাতা। মাটির ছাত, নিচু ঢালু কড়িবরগা, রোদে-পোড়া ইটের দেয়াল। রান্নাঘর থেকে বেকন ভাজা আর কফির সুবাস ভেসে আসছে।

পায়ের ওপর পা তুলল বেন মারফি। 'ওরিন, আমরা এই চারজন কিন্তু সুন্দর একটা দল হয়ে গিয়েছি– একসাথে থাকলে কেমন হয়?'

চারটে টিনের প্লেট আর ফ্রাইং প্যানে বেকন ভাজা এনে টেবিলে রাখল বাবুর্চি। প্লেটগুলো ঠেলে দিল আমাদের দিকে, তারপর কাঁটাচামচ দিয়ে বেকন তুলে দিল। চলে গেল ও, ফিরল কফিপট আর এক প্লেট টর্টিলা নিয়ে। সবশেষে আনল বড় এক গামলা ফ্রিওলস আর চার টুকরো শুকনো আপেলের পাই। ফ্রিওলস মানে মেক্সিকোর সীম, বাদামি রঙ, ঢাউস সাইজ।

'দুটো ঘোড়া লাগবে আমাদের,' ঘাড় ফিরিয়ে হার্ডির উদ্দেশে বললাম আমি।

'পাবে,' বলল হার্ডি। 'তোমরা নিলে বর্তে যাই, যে-কোনও সময় অ্যাপাচিরা ছিনিয়ে নিতে পারে। তবে ওগুলো কোম্পানির মাল– ফেরত দিতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেকনগুলো দেখাল ও। 'এর জন্যে তোমাদের উচিত পিট কিচেনকে ধন্যবাদ দেওয়া। নিজের বাথানে শুয়োর পালে ও। আদর করে নাম রেখেছে অ্যাপাচি পিনকুশন– প্রায়ই ওরা আসে কিনা।'

জেমস গ্রীন শক্ত-সমর্থ লোক। টেবিলের ও-পাশ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওসমান... ম্, নামটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।'

'তাই,' দায়সারা গোছের জবাব দিলাম আমি। ইচ্ছে করেই থামিয়ে দিলাম ওকে। আমার পরিচয় জানামাত্র মগলোপের প্রসঙ্গ তুলবে, ড্রুসিলা কীভাবে খুন হয়েছিল শুনতে চাইবে। অথচ আমি তা চাই না– প্রাণপণে ভোলার চেষ্টা করছি

ওই ঘটনা। ওটা আমার জীবনে একটা দুঃস্বপ্ন।*

'আমার কিন্তু এখনও বিশ্বাস,' খেই ধরল বেন, 'আমরা একজোট হতে পারি।'

'যদি তোমাদের ফাঁসিকাঠে ঝোলার শখ থাকে,' টিপ্পনী কাটল জেমস। ওর হাসি দুকানে গিয়ে ঠেকেছে। 'হার্ডি তখন কী বলল শোনোনি?'

'আমি,' বলল রোকা, 'আমি আর নড়ছি না কোথাও।'

'পরে,' মৃদু সুরে বললাম আমি। 'আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে– ওখান থেকে ফিরে আসি, তারপর।'

সবাই একযোগে তাকাল। 'আমার ভাতিজাকে অ্যাপাচিরা ধরে নিয়ে গেছে। আমি সিয়েরা মাদ্রেসে যাচ্ছি।'

ওরা আমাকে পাগল ঠাউরাল। আমারও একেকবার তাই মনে হচ্ছিল নিজেকে। রোকা মুখ খুলল সবার আগে। 'একা? সিনর, আর্মিও পারবে না। ওটা অ্যাপাচিদের গোপন ঘাঁটি– দুর্ভেদ্য। ভুলেও কোনও শ্বেতাঙ্গ যায় না ওখানে।'

'আমি যাব।'

হার্ডি শুধু একদৃষ্টে কিছুক্ষণ মাপিল আমাকে, তারপর রায় দিল, 'পাগল– বদ্ধ পাগল।'

'কচি ছেলে, তার ওপর,' বললাম আমি, 'নিশ্চয়ই আশা করছে কেউ না কেউ যাবে তাকে উদ্ধার করতে।'

দুই

কিটি হার্স্টের সৌন্দর্য চোখে পড়ার মত। সোনালি চুল, পলকা গড়ন। স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত শ্যামবর্ণ প্রাণোচ্ছল যুবতীদের ভিড়ে ফ্যাকাসে নাজুক একটা ফুল: উদাস, অচঞ্চল, ধরাছোঁয়ার বাইরে।

টুসান এলাকার তরুণ আর্মি অফিসারদের কাছে কিটি হার্স্টের আবেদন চুম্বকের মত। ও বিবাহিত, এই তথ্যটা জানার পরেও এতটুকু ভাটা পড়েনি ওদের আগ্রহে। সবাই জানে ওর স্বামী, কংগ্রেস সদস্য অ্যাঞ্জেল ওসমান ওয়াশিংটন ডি.সি.তে থাকে। বোঝা যায় আলাদা হয়ে গেছে ওরা।

তবে ওদের বিয়েটা এখন কোন পর্যায়ে আছে তা কেউ জানে না, কিটি এ-ব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ, এমনকী কেউ কটাক্ষ করলে সে-দিকেও কান দেয় না।

ওর আচার-ব্যবহার মার্জিত, অভিজাত রমণীসুলভ; কণ্ঠস্বর মদির ও

---

*হুইশ্‌ল: প্যাঁচার ডাক।

সুরেলা। খুঁটিয়ে দেখলে মুখে একধরনের প্রচ্ছন্ন কাঠিন্য আর শীতল চোখজোড়া ঠিকই ধরা পড়ে; কিন্তু সাধারণত ওর ঠোঁটে সর্বক্ষণ ঝুলে-থাকা মৃদু হাসির আড়ালে এই বৈশিষ্ট্যগুলো চাপা পড়ে যায়।

টুসানের লোকেরা কস্মিনকালেও কিটির বাবা, জোনাথন হার্সটের নাম শোনেনি, রা মোরায় যখন জমিবণ্টন নিয়ে দাঙ্গা হয়েছিল সে-সময়ে এই শহরের কেউ ছিল না ওখানে।

জোনাথন হার্স্ট সম্প্রতি মারা গেছে। ভীষণ সংকীর্ণমনা একগুঁয়ে নিষ্ঠুর লোক ছিল সে। কিটি তার একমাত্র সন্তান, ওর চোখে জোনাথন একজন দেবতুল্য মানুষ। বাবার মৃত্যুতে ওসমানদের প্রতি ওর ঘৃণা আরও বিষিয়ে উঠেছে, ওদেরকে সমূলে উৎখাত করার তীব্র তাগিদ অনুভব করছে।

বাবাকে মোরা থেকে বিতাড়িত হতে দেখেছে কিটি: দেখেছে তার সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন কীভাবে ধুলোয় মিশে গেছে, নিহত অথবা বন্দী হয়েছে তার ভাড়াটে বন্দুকবাজেরা। জোনাথনের দম্ভ ছিল আকাশ-ছোঁয়া, নিজেকে কেউকেটা লোক বলে মনে করত। মেয়েকে বুঝিয়েছিল, নিজেকে সে যা ভাবে আসলেও সে তা-ই। এবং কিটির ধারণা, সমাজের বাকি লোকজন ওর বাবার ব্যক্তিত্বের সামনে তুচ্ছ কীটমাত্র।

পশ্চিমে আসার আগে, অত্যন্ত গরীব ছিল ওরা। ধনী হওয়ার বাসনায় জোনাথন যে-সব মহাপ্রকল্প হাতে নিয়েছিল, একের পর এক ব্যর্থ হয়ে যায় সেগুলো, এবং প্রতিটা ব্যর্থতার সাথে সাথে বেড়ে ওঠে জেদ, তিক্ততা। নিজের ভুল জোনাথন জীবনে কখনও স্বীকার করেনি– বরং ব্যর্থতার জন্যে অন্যের ঈর্ষা, ছলচাতুরীকে দায়ী করেছে।

অ্যাঞ্জেল ওসমানকে বিয়ে করার পেছনে কিটি হার্সটের একটা উদ্দেশ্য ছিল: ওর বাবার পরিকল্পনাকে সফল করা। অ্যাঞ্জেল দীর্ঘদেহী সুদর্শন সদালাপী। টেনেসির পাহাড়ি অঞ্চল থেকে তখন সবেমাত্র পশ্চিমে এসেছে ও, কিটির মত মেয়ে সে-ই প্রথম দেখল। ভাবল ও-ই তার স্বপ্নের মানসী, এমন একটা মেয়েকেই এতদিন খুঁজছিল সে। ও'নীল অবশ্যি প্রথম দর্শনে ওদের স্বরূপ চিনে ফেলেছিল, কিন্তু অ্যাঞ্জেল তখন উড়ছে– কিটির মাঝে এক অপূর্ব সম্ভাবনাময় সুন্দরী গুণবতী মহিলাকে আবিষ্কার করেছে। কিন্তু শেষ-পর্যায়ে যখন দুজনের, কিটি আর তার বাবার, আসল চেহারা ফাঁস হয়ে গেল ওদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল সে। তাই, কিটি হার্স্ট ওসমান এখন তার বাবাকে যারা ধ্বংস করেছে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার মতলবে আবার ফিরে আসছিল পশ্চিমে, যদিও কীভাবে তা সম্ভব হবে জানত না।

টুসানগামী স্টেজে সবকিছু খাপে খাপে মিলে যেতে শুরু করল। ইউমার পুবে, প্রথম স্টেজ স্টপে ড্রাইভারের সাথে স্টেশন টেন্ডারের কথাবার্তা কানে এল

দ্রষ্টব্য: বসতি

ওর।
'ইউমায় দেখেছি ওকে,' বলছিল ড্রাইভার। 'অন্যখানে দেখলেও চিনতাম। ওসমানদের সবার চেহারাই প্রায় এক।'
'ওসমান? পিস্তলবাজ?'
'পিস্তলে ওরা প্রত্যেকেই দক্ষ। এর নাম ওরিন ওসমান– কালিফোর্নিয়ার দিকে যাচ্ছে।'
সে-রাতেই আইডিয়াটা কিটির মাথায় এল। প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে ওর মনে, ওসমানদের ক্ষতিসাধনের জন্যে একটা কোনও ফিকির খুঁজছিল। এ-মুহূর্তে হাতের কাছে রয়েছে ওরিন ওসমান– ওদের বড়ভাই। ওরিনের সঙ্গে কিটির আলাপ নেই, অ্যাঞ্জেলের সাথে তার মনোমালিন্যের কথা ও না জানাই স্বাভাবিক। ওসমানরা খুব কম চিঠিপত্র লেখে। তা ছাড়া কথায় কথায় কিটি একদিন জেনেছিল, এই ভাইটির সঙ্গে অনেকদিন হলো ওদের দেখাসাক্ষাৎ নেই। অবশ্যি ও চলে আসার পর ওদের মাঝে যোগাযোগ হয়ে থাকতে পারে; তবু একটা ঝুঁকি নেবে বলে সিদ্ধান্ত নিল কিটি।
সৌভাগ্যক্রমে ওরিনকে প্যাঁচে ফেলার হাতিয়ার এখন তার কাছে মজুত, যাত্রীদের টুকরো টুকরো কথা থেকে হাতিয়ারটা পেয়েছে সে। এবং তখন থেকেই ভাবছিল কীভাবে নিজের কাজে লাগানো যায় ওটা। অ্যাপাচিরা তিনটে শ্বেতাঙ্গ বাচ্চাকে চুরি করেছে, সে-ব্যাপারে আলাপ করছিল ওরা। 'ওদের মধ্যে ডিন ক্রীডের দুই ছেলে রয়েছে,' বলল একজন, 'আরেকজনের পরিচয় জানি না।'
একজন তরুণ আর্মি লেফটেন্যান্ট ছিল স্টেজে। কিটির সাথে আলাপ জমানোর চেষ্টা করছিল সে, আর ও প্রতিবার অসীম ধৈর্যের সাথে এড়িয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এরপর যখন আবার সচেষ্ট হলো, অফিসারকে অবাক করে ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে তুলল কিটি।
'লেফটেন্যান্ট, সত্যি কি অ্যাপাচিরা আসে এখানে? ওদের কথা আমার জানতে ইচ্ছে করছে।'
আগ্রহের সঙ্গে সামনে ঝুঁকে বসল লেফটেন্যান্ট জ্যাক ডেভিস। ওর বয়েস অল্প, দুনিয়ার হালচাল দেখেনি ভাল করে, তাই কিটি ওসমানের মত একজন সুন্দরী যুবতী যখন ওর সাথে কথা বলতে চাইল সঙ্গত কারণেই টগবগ করে উঠল ওর রক্ত। অ্যাপাচি এলাকায় এ-পর্যন্ত মোটে দুবার গেছে লেফটেন্যান্ট, কিন্তু অভিজ্ঞ অফিসারদের অধীনে কাজ করার সুবাদে বহুকিছু জেনেছে।
'হ্যাঁ, আসে,' বলল ডেভিস, 'যে-কোনও মুহূর্তে চড়াও হতে পারে আমাদের ওপর। তবে ঘাবড়াবার দরকার নেই, স্টেজের পুরুষ যাত্রীরা প্রত্যেকেই সশস্ত্র– যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে।'
'ন্-না, ঘাবড়াইনি– এই কৌতূহল আরকী। আচ্ছা, আক্রান্ত হলে ওরা নাকি মেক্সিকোয় পালিয়ে যায়– সিয়েরা মাদ্রেসে?'
'হ্যাঁ। মেক্সিক্যানরা আমাদেরকে কোনও সাহায্য করে না এ-ব্যাপারে।

অ্যাপাচি দমনে দুই সরকার প্রয়োজন হলে একসাথে কাজ করবে, এমন একটা মৌখিক চুক্তি অবশ্যি আছে– কিন্তু তাতে কাজ হয়নি।'

'তার মানে কোনও বন্দীকে যদি ওরা সীমান্তের ও-পারে নিয়ে যায়, তোমরা তাকে উদ্ধার করতে পারবে না– তাই তো?'

'একরকম তাই। বার কয়েক বন্দী বিনিময় হয়েছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে কেউ কেউ ঘোড়া বা অন্য কিছু দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছে তাদের আপনজনকে। তবে অ্যাপাচিদের তাড়া করা হলে, সাধারণত বন্দীকে মেরে ফেলে ওরা।'

কিটি হার্স্ট ওসমান চতুর মহিলা, পরের স্টপে উইলিয়ম ওরিন ওসমানকে একখানা চিরকুট লিখল। তার অনুমান ঠিক হলে, পত্রপাঠ টুসানে চলে আসবে ওরিন; এবং তারপর সিয়েরা মাদ্রেসে ছুটবে। বাকি কাজ সমাধা করবে অ্যাপাচিরা।

আর ওরা যদি একান্তই ব্যর্থ হয়, তখন না হয় অন্য রাস্তা ধরবে সে।

সুকৌশলে তরুণ লেফটেন্যান্টের কাছ থেকে বহু তথ্য আদায় করল কিটি, এবং সেগুলোর সাথে স্টেজের আরও দু-একজন যাত্রীর মন্তব্যও গাঁথল একসুতোয়। ফলে ওরা যখন টুসানে পৌঁছুল, অ্যারিযোনা টেরিটোরিতে অ্যাপাচিদের কার্যকলাপ সম্পর্কে কিটি হার্স্ট তখন বেশ ওয়াকেবহাল হয়ে গেছে। এমনকী অ্যাটম্যান ম্যাসাকারের পর থেকে আজ পর্যন্ত কত শিশুকে অ্যাপাচিরা খুন অথবা অপহরণ করেছে তাও জেনে নিল।

'আচ্ছা, সাধারণ কোনও লোক যদি সিয়েরা মাদ্রেসে ঢোকার চেষ্টা করে, তা হলে?' লেফটেন্যান্ট ডেভিসকে প্রশ্ন করল ও।

'নির্ঘাত মারা পড়বে।' লেফটেন্যান্টের কণ্ঠ প্রত্যয়ে ভরা। 'বাঁচার প্রশ্নই ওঠে না।'

একজন যাত্রী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল লেফটেন্যান্টকে। লোকটার গড়ন একহারা। কঠিন চেহারা। সীমান্তবাসীদের মত বেশভূষা। 'নির্ভর করে কে যাচ্ছে তার ওপর,' একটু বাদে বলল সে, কিন্তু তার কথা আমল দিল না কেউ।

সেই রাতে, কিটি ওসমান তার আয়নার সামনে বসে উপলব্ধি করল এতদিন যা খুঁজছিল সে, আজ তা পেয়ে গেছে। খোদ অ্যাঞ্জেল, বা ও'নীলকে ফাঁদে ফেলতে পারলে যতটুকু তৃপ্তি পেত, ওদের প্রাণপ্রিয় ভাইকে ফাঁসিয়েও সে তেমনি পরিতৃপ্ত হবে।

এ-মুহূর্তে কেবল একটা ইচ্ছেই তার আছে: ওদের ভাইকে কীভাবে ডোবানো হয়েছে সেটা জানার পর ওদের মুখের অবস্থাটা যেন সে দেখতে পায়।

ইউমা স্টেজ স্টেশনের কেরানি যখন আমাকে জানাল, আমার একটা চিঠি আছে, আমি ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই ভুল করছে ও। এমন ভাবার কারণ আছে। সারাজীবনে আমি গোটা চারেক চিঠি পেয়েছি কিনা সন্দেহ, তা ছাড়া কেউ জানে না আমি ইউমাতে রয়েছি– একজনও নয়।

আমাদের পরিবারে লেখার অভ্যেস কারও বিশেষ নেই। অ্যাঞ্জেল আর

ও'নীল লিখতে শিখেছে, কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা খুব বিরক্তিকর লাগে। জরুরি দরকার না পড়লে আমরা চিঠিপত্র খুব একটা লিখি না। তবু এই চিঠিটা যে আমার তাতে একটুও সন্দেহের অবকাশ নেই। ওপরে লেখা, উইলিয়ম ওরিন ওসমান। পড়তে শুরু করলাম আমি:

প্রিয় ওরিন

আমাদের ছেলে অ্যাপাচিদের খপ্পরে পড়েছে। ওকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা। অ্যাঞ্জেল ওয়াশিংটন ডি.সি.তে। ও'নীল ব্যস্ত।

তুমি কি কোনও সাহায্য করতে পারবে?

– কিটি অ্যাঞ্জেল ওসমান

আচ্ছা, বুড়ো খোকা অ্যাঞ্জেলের তা হলে একটা ছেলে হয়েছে। খবরটা, দেখছি, আমাকে জানানোর দরকার বলে মনে করেনি কেউ। অবশ্যি ওদের দোষ দেওয়া যায় না, আমি ভবঘুরে মানুষ– কখন কোথায় থাকি তার ঠিক নেই।

যাকগে, মান-অভিমান করে এখন আসল কাজের কিছুই হবে না। আমার প্রয়োজনের সময়ে সবাই সব কাজ ফেলে ছুটে এসেছিল। অ্যাপাচিরা যদি সত্যি সত্যি অ্যাঞ্জেলের ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, যা করার এক্ষুণি করতে হবে।

অ্যাপাচিদের মতিগতি আগাম আঁচ করা অসম্ভব। মন চাইলে ওকে মেরে ফেলতে পারে; আবার আপন সন্তানের মত স্নেহ যত্নে মানুষ করা বিচিত্র নয়। ছেলের বয়েস, তার সাহস এ-সবের ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। কত দ্রুত পথ চলতে হচ্ছে ওদের তাও গোনায় ধরতে হবে।

সাহসী লোককে অ্যাপাচিরা শ্রদ্ধা করে, আমি জানি। দুর্বল, ভীরু লোকের কোনও স্থান নেই ওদের সমাজে। অনুকম্পার কথা বললে বিনিময়ে কেবল ঘৃণা জোটে।

একজন অ্যাপাচির নিজের জীবনে যে-সব গুণের দরকার হয় একমাত্র সেগুলোকেই সে কদর করে। সাহস, শক্তি, কষ্টসহিষ্ণুতা– এগুলোর গুরুত্ব তার কাছে অসীম, শিকার আর শিকারীর দক্ষতাকে ওরা সমমর্যাদা দেয়।

ভরদুপুরের সূর্য মাথায় করে টুসানে ঢুকলাম আমরা। একটা কোনও স্যালুন বা রেস্তোরাঁর সন্ধানে তাকাচ্ছি এদিক-ওদিক। গলা ভেজাব, চুটিয়ে আড্ডা মারব কিছুক্ষণ– দিন-দুনিয়ার খবর অনেকদিন জানা হয়নি।

আমরা শহরে ঢুকেছি হুঁশিয়ার হয়ে। কমবেশি আমাদের প্রত্যেকের শত্রু আছে। হোলস্টারে পিস্তল আলতোভাবে ঝুলছে, হাত বাড়ালেই পাব। অবশ্যি তার বোধ হয় দরকার হবে না– পথঘাট বিরান, তেতে রয়েছে গরমে। একশোর ওপরে তাপমাত্রা।

'দুটো জিনিস দরকার এখানে,' বলল জেমস গ্রীন। 'প্রচুর পানি আর ভালমানুষ।'

'নরকের চাহিদা। ভেংচি কাটল বেন মারফি। 'চলো, কোথাও গিয়ে বসি।'

আমাদের সখ্য জীবনের রূঢ় দিকের সাথে। স্নেহ-মমতার ছোঁয়া সেখানে নেই বললে চলে। কঠিন পথে চলাফেরা করি– একাকী। ইউমায় যখন এই যাত্রা শুরু হয়েছিল তখন পরস্পরকে চিনতাম না আমরা, এখনও যে খুব একটা জানি তা নয়। তবে আমরা খিদে-তৃষ্ণায় কাতর হয়েছি একসাথে, লড়াই করেছি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে– তাই আমাদের মাঝে অদৃশ্য এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে উঠেছে।

অসংখ্য বেদনার স্মৃতি আছে আমাদের জীবনে। সে-সব কথা আমরা কাউকে বলি না, নিজের মনে সীমাবদ্ধ রাখি– মুখে ফুটে থাকে একধরনের নির্লিপ্ত ভাব যেন জগতের কোনও ঘটনা, শোক-তাপ, হাসি-কান্না স্পর্শ করে না আমাদের। সংসারে যাদের কোনও সমব্যথী নেই তারা এইসব অনুভূতি ঢেকে রাখতে শেখে। প্রায়শ আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারও অত্যন্ত হালকা চালে আলোচনা করি।

আমরা স্পর্শকাতর, কিন্তু সেটা বুঝতে দেই না কাউকে। প্রতিপক্ষের দুর্বল স্থান যদি জানা থাকে আঘাত হানা সহজ হয়ে যায়।

টুসান সম্পর্কে এ-পর্যন্ত আমরা কেউই বিশেষ কিছু বলিনি, তবু বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না শহরটা ভাল লেগেছে আমাদের– এখানে আসতে পেরে খুশি হয়েছি।

আমি পাহাড়ের লোক। বাড়িতে যেমন শিক্ষা পেয়েছি সেভাবে চলার চেষ্টা করি। আমার মা লেখাপড়ার সুযোগ তেমন পাননি, কিন্তু ভালমন্দ বোধ সম্বন্ধে তাঁর একটা সহজ-সরল ধারণা আছে। শত্রু বা দুষ্ট লোকদের মোকাবেলা করার ব্যাপারে মা এবং বাবা, দুজনেই ছিলেন অত্যন্ত কঠোর।

মায়ের সাথে বাবার নীতির কোনও তফাত ছিল না, তবে বাবা আমাদের বাড়তি কিছু জিনিস শিখিয়েছেন: কীভাবে নিজের বিশ্বাসে অটল থাকতে হয় তাঁর কাছেই শিখেছি আমরা। যুদ্ধের কলাকৌশল, দুর্গম এলাকায় পথ চেনার কায়দা, তাসের কারুকাজ নিষ্ঠার সাথে আমাদের তালিম দিয়েছেন।

'দেশে বাটপারের অভাব নেই,' তিনি বলতেন, 'শিখে রাখ।'

বস্তুত বাবার উৎসাহেই আমরা তাসের সবরকম জোচ্চুরি– ইচ্ছেমত সাজানো, নখের সাহায্যে বড় তাসে চিহ্ন দিয়ে রাখা এগুলো জানি।

টুসানের রাস্তায় ছাড়াছাড়ি হলো আমাদের। মেক্সিক্যান পাড়ায় রোকার বন্ধুবান্ধব থাকে, বেন মারফি ওর সাথে গেল। জেমস গ্রীনের ব্যক্তিগত কাজ রয়েছে।

আমার সামনে বিকল্প কোনও পথ নেই, এবং সময় সংক্ষিপ্ত। অ্যাঞ্জেলের ছেলের জন্যে তাড়াতাড়ি একটা কিছু করতে হবে। ঠিক করলাম সাফসুতরো হয়ে প্রথমে মুখে দেব কিছু, তারপর এই কিটি ওসমানের খোঁজে বেরোব।

অ্যাঞ্জেলের স্ত্রীকে আমি কখনও দেখিনি। জীবনসঙ্গিনী হিসেবে ও যাকেই

বেছে নিয়ে থাকুক আমার তাতে একটুও আপত্তি নেই। ভাইদের কাছ থেকে দূরে ছিলাম আমি, ওদের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে অল্পই জানি। একটি স্প্যানিশ মেয়েকে বিয়ে করেছে ও'নীল। সুখে আছে। অ্যাঞ্জেল কংগ্রেস নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জিতেছে। ওর বিয়ের খবর ভাসা-ভাসা কানে এসেছিল। কিটি টুসানে কেন, আর অ্যাঞ্জেল ওয়াশিংটনে জানি না, জানতেও চাই না– কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর অভ্যেস আমার নেই। কারও যদি আমাকে কিছু জানানোর থাকে, নিজের গরজেই জানাবে।

শূ-ফ্লাই মাঝারি মানের রেস্তোরাঁ। লম্বা অপ্রশস্ত ঘর। মখমলের সিলিং। দুরমুজ-করা মেঝে। চার দেয়ালে ছোট ছোট চারটে জানালা। ডজনখানেক চেয়ার টেবিল ছড়ানো ছিটানো, সস্তা পাইন কাঠের, ঠিকমত বসেনি মেঝেতে, টুকটুক করে নড়ে। তবে খাওয়াটা ভাল– পরিবেশ ঠাণ্ডা শান্ত।

দরজা দিয়ে ঢুকে এক মুহূর্ত দাঁড়ালাম আমি, ভেতরের আলোর সাথে চোখ সইয়ে নিলাম।

তিনজন আর্মি অফিসার এক টেবিলে বসে, আরেকটায় দুজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবং তাদের স্ত্রী। ওদের কাছাকাছি রয়েছে জন টিটাস, ওর সঙ্গীর নাম ব্যাশফোর্ড। দুজনেই বেশ প্রভাবশালী। জানালার কাছে, কোণের একটা টেবিল আলো করে আছে একজন যুবতী। সোনালি চুল। পাণ্ডুর অথচ আকর্ষণীয় চেহারা। মনে হলো আমাকে দেখে চমকে উঠল মেয়েটা, ঈষৎ বিস্ফারিত হলো চোখ, তারপর দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

খদ্দেরদের মধ্যে আমি বোধ করি সবচেয়ে লম্বা। পরনে নোংরা তালি-মারা কাপড়। বুটের গোড়ালি ভাঙা, হাঁটার সময়ে ক্যালিফোর্নীয় ঢঙের অতিকায় স্পার দুটো ঝুনঝুন শব্দ তুলছে। জিন্সের রঙ জ্বলে গেছে, রক্তের দাগ লেগে রয়েছে কয়েক জায়গায়। দাড়ি কামিয়েছি, কিন্তু চেহারার জৌলুস বাড়েনি তাতে। মাথায় ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল, বহুদিন হলো কাঁচি পড়েনি। কোমরে সিক্সশূটার আর বউই নাইফ ছাড়াও, আমার হাতে একটা উইনচেস্টার রয়েছে।

রেস্তোরাঁর মালিক একজন মহিলা। নাম, মিসেস রোজমেরি ওয়ালেন। আমাকে চিনতে পারল। আগের যাত্রায় এখানে খাওয়া-দাওয়া করেছিলাম আমি। 'কেমন আছেন, মি. ওসমান?' জিজ্ঞেস করল সে। 'এই এলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, চারজন এসেছি,' সাদামাঠা গলায় বললাম আমি। 'বাকি দুজন পারেনি।'

ঘাড় ফেরাল টিটাস। 'অ্যাপাচি?'

'জ্বি...পনেরো-বিশজন।'

'ওদের কাউকে?'

'পাঁচ-ছজন হবে,' বলে দেয়াল-ঘেঁষা একটা টেবিলে বসলাম আমি। এখান থেকে দরজার দিকে নজর রাখতে পারব, রাইফেলটা ঠেস দিয়ে রাখা যাবে।

'ওদের একটাকেও যদি খতম করে থাকো,' বলল আর্মি অফিসারদের একজন, 'তোমার কপাল ভাল বলতে হবে।'

'জ্বি,' বিনীত সুরে জবাব দিলাম আমি।

সীমান্তের আর সব মেয়েদের মত মিসেস ওয়ালেনও ক্ষুধার্ত লোক দেখলে চিনতে পারে। একটা কাপ আর কফিপট রেখে গেল। নিয়ে এল বড় একচাকা গরুর মাংস আর মরিচ-মাখানো মটরশুঁটি।

খেতে শুরু করলাম আমি। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হচ্ছে পেশীগুলো। মরু অঞ্চলে বিপদ আসে অতর্কিতে, তাই পেশী স্নায়ু টানটান রাখতে হয় সর্বদা। সময় কাটানোর জন্যে এই রেস্তোরাঁটা মন্দ নয়। আমি একটু লাজুক, তবে লোকসঙ্গ খারাপ লাগে না।

আমাদের ভাইদের মধ্যে অ্যাঞ্জেল সবচেয়ে মিশুক। সহজে পরিবেশের সাথে ম্যানিয়ে নিতে পারে। কথা বলতে, এবং বলাতে ভালবাসে ও। গিটার বাজাতে জানে। চমৎকার গানের গলা, যে-কোনও খাঁটি ওয়েলশের মতই। ওকে দশ মিনিট সময় দেওয়া হোক, একঘর লোককে আপন করে নেবে।

আমি মুখচোরা। বন্ধুবৎসল, কিন্তু চট করে মিশতে পারি না। নাচের আসরে বেমানান, হাত-পা গুটিয়ে একপাশে বসে থাকি বলে অনেকে গেঁয়ো ভাবে আমাকে। অবশ্যি কে কী ভাবল না ভাবল তাতে আমার যায়-আসে না কিছু। ঘরের পেছন দিকে বসে, কফি খেতে খেতে অন্যদের কথা শুনতে ভাল লাগে আমার। আর সবাই আমার চোখের সামনে থাকে বলে কোনওকিছুই নজর এড়ায় না।

কোথাও কোনও গোলমাল দেখা দিলে অ্যাঞ্জেল মিষ্টি কথায় পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার চেষ্টা করবে, যেখানে মুখের কথায় কাজ হয় না সেখানে অবশ্যি ঠিকই অস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করে ও। ও'নীল এর বিপরীত– পাকা বজ্জাত। খারাপ লোক তা বলছি না, অত্যন্ত অমায়িক– তবে কেউ যদি গায়ে পড়ে লাগতে আসে ও একপায়ে খাড়া। আমি দুটোর কোনওটিই নই। পারতপক্ষে ঝামেলায় যাই না। আমাকে রাগানো কঠিন– কিন্তু রাগলে বাপের কুপুত্র।

টেক্সাসের চারণভূমিতে বহু লংহর্ন ধরেছি আমি। অনেক বেয়াড়া মাসট্যাংকে পোষ মানিয়েছি, শায়েস্তা করেছি গুণ্ডা-বদমাশকে। গুলিচালনায় ও'নীল আর আমার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বলা শক্ত। আমরা দুজনেই সেই ছেলেবেলায় হাত পাকিয়েছি এতে।

বেশ তৃপ্তিসহকারে খেলাম। ঝরঝরে লাগছে। নিচু স্বরে আড্ডা দিচ্ছে খদ্দেররা। চারিদিকে ফিসফাস গুঞ্জন। আমি এককোণে চুপচাপ বসে আছি। নিজের বলে আমার কি একটা ঘর হবে না কোনওদিন? প্রতিবার অন্যের জন্যে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে সুযোগ।

যেখানে আমি আমার হ্যাট ঝোলাই সেটাই আমার ঘর। তবে এখানে যারা রয়েছে তাদের বেশির ভাগ সংসারী লোক, রোববারের ছুটি উপভোগ করতে জমায়েত হয়েছে। যখন পাহাড়ে ছিলাম, রোববার এলে ভাল জামাকাপড় পরে আমরা চার্চে যেতাম।

সে-কালে লোকজনের সাথে দেখা-সাক্ষাতের জন্যে ওর চেয়ে ভাল সুযোগ

আর মিলত না। সুন্দর সময় কাটত। পাদ্রি যখন আমাদের পাপস্খালনের কথা বলে প্রার্থনা করতেন, আমরা তন্ময় হয়ে শুনতাম আর ভাবতাম নিজেদের অজান্তে প্রতিদিন কত অজস্র ভুলত্রুটি না করে ফেলি আমরা। অথচ আমাদের বিশ্বাস ছিল সারাদিন খেতে-খামারে কাজ করে আর গরু খেদিয়ে পাপ করার মত ফুরসত কারও থাকে না।

গলা মিলিয়ে, আবার কখনও-বা বেসুরো আওয়াজে, স্তোত্র পাঠ করতাম আমরা। প্রার্থনা-শেষে গাছের ছায়ায় বসতাম, সঙ্গে থাকত শুকনো খাবার। মেয়েদের কেউ কেউ সেগুলো ভাগজোক করে পরিবেশনের দায়িত্ব নিত। এমি ট্যাটানের হাতে তরমুজের জেলি একবার যে খেয়েছে তার স্বাদ সে ভুলতে পারবে না। বুড়ি জেনি ব্ল্যান্ড থাকতেন ক্রীকের উজানে, তাঁর রান্নাও ছিল চমৎকার।

বহুকাল আগের কথা সে-সব; অনেক, অনেক দূরে ওদেরকে ফেলে এসেছি আমি, তবু আজও মাঝে মাঝে চোখ বুজলে পরিষ্কার শুনতে পাই ওরা গাইছে 'অন জর্ডন্স্ স্টর্মি ব্যাঙ্কস্' অথবা 'রকি এজেস্' এই গানগুলো। বনের ভেতর আমাদের সেই কাঠের গির্জাটাও ভেসে ওঠে চোখে। সবকিছুই ছিল বাড়িতে তৈরি, এমনকী আমরা যে-সব কাপড় পরতাম সেগুলোও। স্পষ্ট মনে আছে আমার বয়েস তখন ষোলো। সে-বারেই আমি প্রথম কেনা প্যান্ট পরেছিলাম। রোদে চামড়া শুকিয়ে নিজেদের জুতো আমরা নিজেরাই তৈরি করতাম।

আমার টেবিলের পাশে একজন আর্মি অফিসার এসে দাঁড়াল। 'বসতে পারি, সার,' জিজ্ঞেস করল সে।

'স্বচ্ছন্দে,' বললাম আমি। 'আমার নাম ওসমান, উইলিয়ম ওরিন ওসমান।'

হাত বাড়াল অফিসার। 'ক্যাপ্টেন জনসন, সার। অ্যাপাচিদের সাথে গোলমালের কথা বলছিলেন আপনি– ওদের কারও চেহারা দেখতে পেয়েছেন?'

'আপনি বোধহয় জানতে চাইছেন, ওরা রিজার্ভেশন ইন্ডিয়ান কিনা, তাই তো– না।'

'কীভাবে বুঝলেন?'

ক্যাপ্টেনের চোখে চোখ রাখলাম আমি। 'গন্ধ শুঁকে। দীর্ঘ মরুভূমি পেরিয়ে এসেছিল ওরা। ওদের ঘোড়ার মলে অজীর্ণ মরু-লতাপাতার আঁশ লেগেছিল।'

'কজনকে মেরেছেন আপনি?'

'তিন...আরেকজনকে আহত করেছি তবে মারিনি।'

ক্যাপ্টেনের দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা লক্ষ্য করে ঘটনাটা খুলে বললাম আমি। 'খুব ভাল যোদ্ধা ছিল লোকটা, তাই খুন করতে বাধল। দুটোকে খতম করেছি আমার রাইফেল দিয়ে, তারপর দুজন আমার গর্তের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একজনকে খুন করেছি, কিন্তু অন্যজন ছিল বাঘ। মনে হলো ও পঙ্গু হয়ে গেছে তাই আর কিছু বলিনি।'

'নিশ্চয়ই একা ছিলেন না আপনি?'

'ছজন। সবাই আমার সঙ্গে ছিল না। ওরাও দু-একটাকে মেরেছে।'

'আপনারা দুজনকে হারিয়েছেন?'

'টেলর আর বিলি হিগিন্সকে। টেলরের ফার্স্ট নেম আমি জানি না। ওদের লাশ তুলে আনা সম্ভব হয়নি। প্রথম সুযোগেই পালিয়ে এসেছি।'

'আচ্ছা, নিহত অ্যাপাচিদের মধ্যে কারও থুতনিতে কাটাদাগ ছিল? অবশ্যি থাকলে আমি অবাক হব।'

'না...নিহতদের কারও ছিল না। তবে যে-লোকটাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি, তার থুতনিতে একটা ক্ষতচিহ্ন ছিল।'

তিন

আঁতকে উঠল ক্যাপ্টেন জনসন। 'ওকে মেরে ফেললেই ভাল করতেন, মি. ওসমান। ওর নাম কাহ্‌তেনি। অ্যাপাচিদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর– মহা ধড়িবাজ।'

'ওর অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল, ক্যাপ্টেন। আমি নিজে একজন যোদ্ধা হয়ে আরেকজন অসহায় যোদ্ধাকে মারি কী করে?'

জনসন হাসল। 'আমার মনের কথাটা বলেছেন। আমি হলেও পারতাম না। কিন্তু কী করব বলুন, অনেকের ধারণা ওদেরকে ঝাড়ে-বংশে নিপাত করা উচিত।'

স্বর্ণকেশী মহিলা বসে আছে কামরার ও-পাশে। আমাদের কথা না শোনার ভান করছে ও, নিবিষ্ট মনে প্লেটের খাবার নাড়াচাড়া করছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস একটা কান ঠিকই এ-দিকে রেখেছে।

'ক্যাপ্টেন, ইন্ডিয়ানরা আমাকে আক্রমণ করেছিল, বাধ্য হয়ে আমি পাল্টা আঘাত হেনেছি। এ-জন্যে ওদেরকে দোষ দেই না আমি। যুগ যুগ ধরে ওরা তাই করে আসছে।

'আমার বিশ্বাস, ওরা লড়াই করে কারণ এটা ওদের রীতি, আর আমরা জবাব দেই কারণ সেটা আমাদের নিয়ম। কেউ জেতে, কেউ হারে। রক্ষা করার মত নিজের কেউ একজন না থাকলে, কোনও লোকের পক্ষেই শান্তিতে বসবাস করা সম্ভব নয়– সে আপনি যে-দেশেই বলুন।'

ক্যাপ্টেনের জন্যে কফি নিয়ে এল মিসেস ওয়ালেন। আমরা আরও কিছুক্ষণ ওখানে বসে অ্যাপাচি এবং তাদের জীবনধারা সম্পর্কে আলোচনা করলাম।

'আপনি বোধহয় সৈনিক ছিলেন, মি. ওসমান?'

'জ্বি, স্যার। গৃহযুদ্ধের সময়ে চার বছর ইউনিয়ন আর্মিতে ছিলাম। মূলত শিলোহ্‌ আর ওয়াইল্ডারনেস এলাকায়...তবে আরও দু-চার জায়গায় গিয়েছি অ্যাকশনে।'

'আপনাকে কাজে লাগাতে পারব আমরা। আবার যোগ দেওয়ার ইচ্ছে

আছে?'

'না। তখন যা উচিত বলে মনে করেছিলাম সেটাই করেছি। এখন যদি কেউ আমাকে না ঘাঁটায় আমি কেন লাগতে যাব?'

'কংগ্রেস সদস্য ওসমান কি আপনার...?'

'ভাই। বলতে কী, আমি এখানে ওর স্ত্রীর সাথে কথা বলতে এসেছি।'

আড়চোখে সেই স্বর্ণকেশী মহিলাকে দেখলাম আমি। এখন সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে আছে ও। 'অ্যাপাচিরা ওদের ছেলেকে চুরি করেছে– আমি উদ্ধার করব।'

'ওদের ছেলে?' ক্যাপ্টেন জনসন অবাক, কিন্তু সে আর কিছু বলার আগেই কিটি ওসমান বাধা দিল।

'ওরিন? আমি কিটি। এই টেবিলে আসবে?'

উঠে পড়লাম আমি। 'মাফ করবেন, ক্যাপ্টেন,' বলে আমার কফি নিয়ে হেঁটে গেলাম ওখানে।

'হাউডি, ম্যাম। অবাক লাগছে তোমাকে চিনি না আমি। অবশ্যি তোমাদের বিয়ের সময়ে আমি আরেক মুল্লুকে ছিলাম। বিশেষ কিছু শুনিনি এ-ব্যাপারে।'

'বসো, ওরিন। আমাদের কথা হওয়া দরকার।' আমার হাতের ওপর নিজের একটা হাত রাখল কিটি, গভীর নীল চোখজোড়া বড় বড় করে তাকাল। 'সমস্যার কথা আপাতত থাক। তোমার কথা বলো আগে। হাজার হলেও, আমাদের মধ্যে জানাশোনা হওয়া দরকার।'

কোনও রূপসী মহিলাকে শ্রোতা হিসেবে পেয়েও মুখ সেলাই করে রাখে এমন পুরুষ মিলবে কিনা সন্দেহ। গড়গড় করে নিজের সব কথা ওকে বললাম আমি। ড্রুসিলার প্রসঙ্গই গুরুত্ব পেল বেশি। কলর‍্যাডোর পাহাড়ে প্রথম সাক্ষাতের পর্ব থেকে আমাদের বিয়ে, ওর নিহত হওয়ার ঘটনা এবং আমার প্রতিশোধ– কিছুই বাদ গেল না।

কিটির হাসিটা মিষ্টি, প্রচুর পরিমাণে উপহার দিল আমাকে। কিন্তু দৃষ্টিটা একটু কেমন যেন, তবে আমি জানি অবিমিশ্রভাবে কোনও মানুষই নিখুঁত হয় না। মুখখানা ছোট, মাঝে-মধ্যে কঠিন আর শক্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু কথা বলে সুখ আছে, অযথা বাগড়া দেয় না।

একসময়ে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আমাকে অনুরোধ জানাল ও। সারা বিকেল গল্পে-গল্পে কাটিয়ে দিয়েছি আমরা, চমক ভাঙতে খেয়াল করলাম, আর্মি অফিসার তিনজন চলে গেছে। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ছেলের প্রসঙ্গ তুলল কিটি। বলল ওর নাম অ্যান্ডি, অ্যাঞ্জেলের আদ্যাক্ষরের সাথে মিলিয়ে রেখেছে।

'ক্রীডের দুই ছেলের সঙ্গে ধরে নিয়ে গেছে,' ব্যাখ্যা করল ও। 'আর্মি এ-ব্যাপারে কিছু করতে পারবে না। অ্যাঞ্জেল এখানে থাকলে, ও-ই মেক্সিকোয় গিয়ে উদ্ধার করত ওকে। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়; ওর অপেক্ষায় বসে থাকলে দেরি হয়ে যাবে। তারপর হঠাৎ শুনলাম তুমি ইউমায় আছ। তুমিই এখন আমার একমাত্র ভরসা।'

'ছেলের বয়েস কত?'

'পাঁচ...আর কদিন পর ছয়ে পা দেবে।' একটু থেমে বলল ও, 'তবে একটা অনুরোধ, ওরিন, তুমি যা-ই করো না কেন, এখানে কাউকে কিছু বলবে না। আর্মি তোমাকে এ-রকম কাজে সীমান্ত পেরোনোর অনুমতি দেবে না। অ্যাপাচিদের শায়েস্তা করার ব্যাপারে ওরা এখন মেক্সিক্যান সরকারের সাথে আলোচনা চালাচ্ছে। সরাসরি সিয়েরা মাদ্রেসে আঘাত হানতে চায়...আমাদের তাড়ার পেছনে এটাও একটা কারণ। আমি শুনেছি আক্রান্ত হলে অ্যাপাচিরা তাদের সব বন্দীকে হত্যা করবে।'

হাঁটার গতি কমিয়ে আমি ওর পাশে চলে এলাম। ছেলেটা বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কম, কিন্তু সেটা বলা যাবে না ওকে। ওর খোঁজে যাব না এ-চিন্তা একবারও আমার মাথায় আসেনি। যত দুর্যোগই আসুক, আমরা ওসমানরা একে অন্যের বিপদে এগিয়ে যাই। ওই ছেলেটা একজন ওসমান– এবং আমার ভাইয়ের সন্তান।

মেক্সিকোর পথে ছুটে গেল আমার মন, শিরদাঁড়ায় একটা শিরশিরে অনুভূতি জাগল। ওই ট্রেইলের প্রতিপদে রয়েছে বাধা-বিপত্তি। অ্যাপাচিরা তো আছেই, পানির উৎসও কম। গাঁয়ের সাধারণ মানুষ মোটামুটি নিরীহ, কিন্তু আর্মি বা বিপ্লবী রুর‍্যালস্ বাহিনীর সামনে পড়লে রক্ষা নেই– ওরা ভীষণ নিষ্ঠুর। নির্বিচারে মানুষ খুন করতে বাধে না।

টুসানে আসার পথে ডিন ক্রীডের দুই ছেলে এবং আর একটা বাচ্চা অপহৃত হওয়ার কথা আমার কানে এসেছে, কিন্তু বিশদ কিছু শুনিনি।

খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে। আর্মি যদি জানতে পায়, যাওয়া হবে না। বাধা দেবে।

দুই সরকারের মধ্যে আলোচনা চলছে। সুতরাং অ্যাপাচিরা একটা বিরাট বাহিনীকে আশা করবে...ব্যক্তিগত উদ্‌যোগে কেউ মেক্সিকোয় আসতে পারে, এটা স্বপ্নেও ভাববে না। অন্যদিকে, আমিও একজন ওসমান। আর্মির সন্দেহ উদ্রেকে এটুকুই যথেষ্ট।

ওদিকে, আবার, কিটি অস্বস্তিতে ফেলেছে আমাকে। মেয়েদের আমি ঠিক বুঝতে পারি না, একমাত্র ড্রুসিলা ছাড়া জীবনে কোনও মহিলার সামনে স্বাভাবিক হতে পারিনি, অপ্রতিভ বোধ করতাম, কথা সরত না মুখে। কিটি কেতাদুরস্ত শহুরে মেয়ে। সোনালি চুল, পরনে সাদা লেস-দেয়া গাউন, হাতের দস্তানাটাও লেসের, মোজার মত ওগুলোর কোনও আঙুল নেই। তার ওপর ছোট ছাতা একটা...আমি সামান্য গেঁয়ো চাষা, পাহাড়ি ভূত, এ-সব চাকচিক্যের সঙ্গে পরিচিত নই।

'তা হলে তুমি যাচ্ছ?' ওর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলাম আমরা, আলতোভাবে কিটি আমার বাহুতে হাত রাখল। 'ওরিন, তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। আর কেউ নেই।'

'দেখি, কদ্দূর কী করতে পারি।' ওর ডাগর নীল চোখজোড়ার পানে

তাকিয়ে মনে হলো, আহা, যদি তিনজন সঙ্গী পেতাম সত্যিই হয়তো কিছু করতে পারতাম আমি। 'একটা কথা ভুলো না, ম্যাম, অ্যাপাচিদের বিশ্বাস নেই– বিশেষ করে বন্দীদের ব্যাপারে। নিজের মনকে শক্ত রেখো।'

'ওইটুকু বাচ্চা– ভাবতেই যেন কেমন লাগে।'

একবার ভাবলাম ওকে জিজ্ঞেস করি আমাকে কোন আঁগুনের ভেতর ঠেলে দিচ্ছে ও জানে কি না। পরক্ষণে বাতিল করলাম চিন্তাটা। এত স্বার্থপর হওয়া উচিত হচ্ছে না। ও কীভাবে জানবে সনোরাগামী ট্রেইলটা কেমন? পথ তো নয়, যেন নরক, প্রতিমুহূর্তে বিপদের আনাগোনা। এর স্বরূপ জানতে হলে ওই পথে ভ্রমণ করতে হবে। মানসপটে দেখতে পেলাম সুতোর মত একটা ট্রেইল উত্তপ্ত মরুভূমির বুক চিরে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। ওপরে তামাটে আকাশ, নীচে ধু-ধু বালু। এখানে-সেখানে ক্যাকটাস আর কাঁটাঝোপ, র‍্যাটল সাপের আবাস। ইন্ডিয়ান কিংবা আউট-লদের কথা না হয় বাদই দিলাম।

হঠাৎ আর একটা কথা খেয়াল হলো। 'আমার অবাক লাগছে, কোন আক্কেলে অ্যাঞ্জেল তোমাকে একাকী আসতে দিল? তাও আবার বাচ্চাসহ?'

ম্লান হাসি ফুটল ওর মুখে। 'উপায় ছিল না, ওরিন। বাবা ক্যালিফোর্নিয়ায় মারা গেলেন, আমাকে অন্ত্যেষ্টিতে যেতে হলো। তারপর যখন বুঝলাম বিপদ হতে পারে, অ্যান্ডিকে রেখে গেলাম এখানে...ভেবেছিলাম নিরাপদেই থাকবে।'

ওর কথায় যুক্তি আছে। তবু খটকা রয়ে গেল, কিন্তু খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে সময় অপচয় করা আমার ধাতে সয় না। জরুরি কাজ থাকলে সেটা আগে সারা আমার নীতি– প্রশ্ন পরে। বাচ্চার চেহারা আর পোশাকের বর্ণনা জেনে নিয়েছি। এ-বার সরঞ্জাম জোগাড় করে বেরিয়ে পড়ব।

বাসার সামনে দাঁড়িয়ে রইল কিটি, রোদে-পোড়া ইটের দেয়ালের পটভূমিতে ওর সাদা গাউন আলোর মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ফিরতি পথে একবার পেছনে তাকালাম আমি, এখনও দাঁড়িয়ে আছে ও, অপলক দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে।

পুরো ব্যাপারটা এত আচমকা আমার ঘাড়ে চেপেছে যে দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছি, পরিস্থিতি বিচার করার সময় পাইনি। সামনে দুর্গম অ্যাপাচি এলাকা, দম ফেলার অবকাশ মিলবে না, তবু সবকিছু একবার ভাল করে ভেবে দেখতে হবে আমাকে।

সবচেয়ে বড় অসুবিধা, আমার হাতে টাকা নেই। অথচ কোথাও যেতে হলে অল্পবিস্তর খরচা হবে। কঠিন কাজে নামছি আমি: টাকার শ্রাদ্ধ ছাড়াও ঘাম ঝরবে– এবং, হয়তো-বা, রক্ত।

মোটে দুশো ডলার আছে আমার পকেটে। গত দুমাসের সঞ্চয়। অ্যাপাচি হামলায় স্যাডলটা খোয়া গেছে, আবার একটা ঘোড়া কিনতে হবে। স্টেজ কোম্পানির ঘোড়া ধার করে টুসানে এসেছি আমরা, আজ-কালের ভেতর ফেরত চলে যাবে ওগুলো।

টাকা বাঁচলে এই সাথে প্যাক হর্সও কিনব একটা।

সেকেন্ড-হ্যান্ড স্যাডল নেব বলে ভাবছি। নতুন স্যাডলে চেপে অ্যাপাচি এলাকায় যাওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই আমার...নতুনে অতিমাত্রায় খসখস শব্দ হয়। আসলে সব স্যাডলেই হয়, সুন্দর মিষ্টি একটা শব্দ; কিন্তু অ্যাপাচিরা যখন কাছেপিঠে থাকে, তখন মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের চেয়ে জোরাল কোনও আওয়াজের অর্থ নিজের মৃত্যু ডেকে আনা।

এখানেই শেষ নয়। এরপর আছে একজোড়া স্যাডলব্যাগ, একটা ক্যান্টিন, পঞ্চো, কম্বল, একটা বাড়তি কার্তুজ বেল্ট এবং কিছু খাবার। পাহাড়ি অঞ্চলে ভূতের মত নিঃশব্দে চলাফেরা করতে হবে আমাকে– সঙ্গে খাবার থাকলে অনর্থক গোলাগুলির ঝামেলায় যেতে হবে না।

কোয়ার্টয রক স্যালুনে ঢুকে দেখলাম ট্যাম্পিকো রোকা বসে আছে। আমি সোজা ওর টেবিলে গিয়ে বসলাম। ও সামনে ঝুঁকে এল। 'আজ রাতেই জেমস গ্রীন চলে যাচ্ছে,' চাপা গলায় বলল রোকা। 'বিপদ, মনে হচ্ছে।'

'বিপদ?'

'টেক্সাসে গোলমাল হয়েছিল। গ্রীন জিতে যায়। নিহত লোকটার দুই ভাই শহরে এসেছে, সাথে বন্ধুবান্ধব রয়েছে। গ্রীন ঝামেলা বাড়াতে চায় না।'

'ওর হাতও তো বোধহয় শূন্য, তাই না?' জিন্সের পকেটে হাত ঢোকালাম আমি। 'মেক্সিকোতে যেতে হবে, তবু গোটা বিশেক ডলার দিতে পারব।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল রোকা। 'আমি তা বলিনি, অ্যামিগো। শহরের বাইরে আমাদের সাথে যোগ দেবে ও। কথাটা তোমাকে জানাতে বলেছে যাতে তুমি ওকে ভুল না বোঝো। আমরা তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, সিনর।'

'না-না, তা কী করে হয়? এটা আমার ব্যাপার, তোমরা কেন যাবে? বিপদ আছে।'

নিঃশব্দ হাসিতে উদ্ভাসিত হলো ট্যাম্পিকোর মুখ। 'অ্যামিগো, তুমি রোকার সাথে কথা বলছ– কোনও আনকোরা লোকের সাথে না। আমার শরীরে অ্যাপাচি রক্ত আছে, ওদের নাড়িনক্ষত্র জানি। আমাকে তোমার দরকার হবে, অ্যামিগো।'

হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইলাম আমি। ভাষা জোগাচ্ছে না মুখে। আমি বাকপটু নই, এ-সব ক্ষেত্রে কী বলতে হয় জানি না। চুপ করে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে, ও স্মিত হাসল, হাতের ইশারায় আরেক দফা বিয়ার দিতে বলল ওয়েটারকে।

ধীরে ধীরে সরগরম হয়ে উঠছে স্যালুন। খারাপ জায়গা বলে দুর্নাম আছে এর। কোয়ার্টয রকের প্রশংসা এ-যাবৎ কেউ করেনি। কংগ্রেস হল স্যালুনে ভদ্রলোকদের দেখা মেলে। ভালমানুষেরা যায় ওখানে, এদের ভিড়ে দু-চারটে ভবঘুরেও মিশে থাকে, কিন্তু কোয়ার্টয রক একেবারে নিম্নস্তরের। অন্তত ফস্টারের আমলে তাই ছিল।

বিপদের আশঙ্কায় সজাগ থাকতে হয় সর্বক্ষণ। খদ্দেরদের প্রায় সবাই দাগী আসামী। চলাফেরা জামাকাপড় সবকিছু অশালীন। সাথে অস্ত্র রাখে। নিছক

লোক দেখানোর জন্যে নয়, ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই।

আমরা দ্বিতীয় দফা বিয়ার শেষ করে এনেছি, এমন সময়ে চারজন লোক ঢুকল।

নড়েচড়ে বসল রোকা, ডান হাতটা মুক্ত রাখল। বিপদের আলামত বুঝে মন বেজায় খারাপ হয়ে গেল– যাত্রার মুখে কোনও ঝঞ্ঝাটে জড়ানোর ইচ্ছে ছিল না আমার।

কঠিন বদখত চেহারার চারজন লোক। একনজরে বোঝা যায় সব একই গোয়ালের গরু, এইমাত্র উঠে এসেছে রাস্তা থেকে। মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। তৃষ্ণার্ত নেকড়ের মত বারে জমায়েত হলো। এক পেগ পানীয় পেটে পড়তে অন্যদের দিকে তাকাল ওরা।

'এরাই জেমসকে খুঁজছে, অ্যামিগো। ওরা বোধহয় জানে আমি ওর বন্ধু।'

কামরার এ-প্রান্তে এল লোকগুলো, উপস্থিত সবাই বিপদের গন্ধ পেল।

আমাদের টেবিলের সামনে থমকে দাঁড়াল চারজন। প্রত্যেকেই সশস্ত্র, ঝোলানোর কায়দা থেকে বোঝা যায় পিস্তলের ব্যবহার জানে।

আলগোছে ডান পা সামান্য একটু সরালাম আমি। অপর পা পাশের একটা চেয়ারের কিনারে তুলে রেখেছি, নিরীহভাবে।

'অ্যাই ব্যাটা, গ্রিজার!' ঝাঁটা গোঁফঅলা লোকটা রোকার উদ্দেশে তর্জনী তুলল। 'শুনলাম তুমি গ্রীনের বন্ধু।'

রোকা কুণ্ডলী-পাকানো সাপের মত শান্ত। সরল দৃষ্টিতে তাকাল ওদের দিকে, হাসল। গ্রিজার সম্বোধন মেক্সিক্যানদের পছন্দ নয়। আমি অনেককে গ্রিংগো বলে ডেকে দেখেছি এতে ক্ষুব্ধ হয় না ওরা। তবে ওদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ভীষণ স্পর্শকাতর, রোকার অবস্থা এখন সেইরকম। ওকে দোষ দিচ্ছি তা নয়। ইচ্ছে করলেই ঝামেলা এড়ানো যায়, এটা বলা খুব সহজ, কিন্তু এই লোকগুলো নাছোড়বান্দা– গোল পাকানোর আশায় মুখিয়ে আছে।

'সি, সিনর,' ভদ্রভাবে বলল রোকা। 'জেমস গ্রীনকে বন্ধু বলতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।'

'তোমাকে খুন করব আমরা, মেক্স। তা হলেই ওর নাগাল পাব।'

এ-বার লোকটার দিকে আমি তাকালাম। বললাম, 'আমিও কিন্তু ওর বন্ধু'। যেন কিছুই যায়-আসে না এ-রকম নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললাম কথাটা। তবে ওরা খোঁচাটা ঠিকই বুঝতে পারল।

সবকটা চোখ ঘুরে আমার ওপর স্থির হলো। আমি নির্বিকার ভাবে বসে রইলাম চেয়ারে।

'মরার শখ হয়েছে?' আবার দাঁত-মুখ খিঁচাল ঝাঁটা-গোঁফ।

'টেক্সাসে মাইলের পর মাইল ঘেসো জমি আর খোলা আকাশ,' শুরু করলাম আমি। 'অজস্র ঝরনা রয়েছে, ইচ্ছে করলেই যে-কেউ গরু পালতে পারে। কিন্তু অ্যারিযোনা কাঠের দেশ, শীতপ্রধান জায়গা–'

'কী বকছ আবোলতাবোল?' খেঁকিয়ে উঠল ঝাঁটা-গোঁফ। 'পাগল নাকি?'

'না, ভাবছি একজন লোক কতটা গাধা হলে ও-রকম সুন্দর সুযোগ হাতছাড়া করতে পারে। শোনো, দুটো পথ খোলা আছে তোমাদের সামনে। লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়েদের বাড়ি ফিরে যাও, গরু দেখাশোনা করোগে।'

'নইলে—?'

'নইলে থাকো এখানে, মাটির নীচে তোমাদের জায়গা হবে।'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ওরা। বোঝার চেষ্টা করছে এগুলো কথার কথা, নাকি আমি সত্যিই শক্তপাল্লা। আমি ধৈর্যশীল মানুষ। ও'নীল হলে, এতক্ষণে ওদের লাশ পড়ে থাকত এখানে। আমি প্রতিপক্ষকে একটা সুযোগ দেই। মাতাল মানুষ অনেক সময় বেশি বকবক করে, তারপর হঠাৎ করে নিজের ভুল ধরতে পেরে চলে যায় সেখান থেকে। আমি ওদেরকে সেই সুযোগটুকুই দিচ্ছি।

ওরা গ্রহণ করল না।

ঢ্যাঙামত গুম্ফবান এক লোক চোখ গরম করে বলল, 'আমি টম লোগান,' স্বরে প্রচ্ছন্ন আত্মবিশ্বাস, যেন নামটা শুনেই ভিরমি খাব আমি।

'খুশি হলাম পরিচয় পেয়ে, মি. লোগান,' অমায়িক স্বরে বললাম, 'আমি নিজের হাতে নামফলক লিখে দেব।'

লাল হয়ে গেল ওর মুখ। স্পষ্টত লোগান হকচকিয়ে গেছে। লড়াই করার মতলবে এসেছিল, এখন আমার পরিহাসে দিশেহারা হয়ে পড়ছে। এমনকী, নাম শুনে কোনওরকম ভাবান্তর ঘটেনি আমার, এতেও রীতিমত অবাক হয়েছে সে।

আমাকে কথা বলার সুযোগ দিচ্ছে রোকা; চুপচাপ বসে আছে, কিন্তু ইউমা থেকে ট্যাম্পিকো রোকা আমার সঙ্গে রয়েছে, জানি ওকে ঘাঁটানোর পরিণাম ভাল হয় না। টম লোগান খেই হারিয়ে ফেলেছিল, আবার গা ঝাড়া দেওয়ার প্রয়াস পেল।

'এই গ্রিজারকে আমি খুন করবই।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল রোকা। 'এখনই করো।'

ঝাঁটা-গোঁফ মাতাল হয়নি পুরোপুরি, চালু লোক। নিজের পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে, এবং আচমকা আমি পা সোজা করলাম। চেয়ারটা দড়াম-করে ওর পায়ের ওপর পড়ল, ও ধাক্কা খেলো লোগানের সাথে— এবং ওরা যখন একজন আরেকজনের গায়ে হুমড়ি খাচ্ছে, আমি সারির শেষ লোকটাকে গুলি করলাম। পরক্ষণে আরেকটা গুলির আওয়াজ হলো। লোগান ভ্রাতৃদ্বয়ের দিকে রোকা আর আমি তাকালাম, একজন কথা বলছে মাটির সাথে, অপরজন বসে আছে হাঁটু ভেঙে।

'আমরা চাইনি,' বললাম আমি, 'তোমরা বাধ্য করেছ। তোমাদের দুজন মারা গেছে।'

তখনও সঙ্গীদের হাল দেখেনি ওরা, ও-দিকে তাকিয়ে চুপসে গেল।

'টম,' বললাম আমি, 'নিজের এলাকায় তুমি হয়তো কঠিন লোক, কিন্তু এখন অন্য জায়গায় রয়েছ। আমার পরামর্শ শোনো, বাড়ি ফিরে যাও।'

আমার মত রোকাও পিস্তল তাক করে আছে ওদের দিকে, হাত বাড়িয়ে নিজের বিয়ার তুলে নিল, একঢোকে সাবাড় করল।

কামরার উল্টো দিকে বারে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিল ফস্টার। 'শেরিফ আসার আগেই তোমরা কেটে পড়ো,' পরামর্শ দিল সে। 'আর গোলাগুলি নয়—ব্যবসা খারাপ হয়ে যাবে।'

'যাচ্ছি,' বললাম আমি, পিস্তল খাপে ভরলাম। সতর্ক ভঙ্গিতে পা বাড়ালাম দরজার উদ্দেশে।

ট্যাম্পিকো রোকাকে গ্রিজার বলে গাল দিয়েছিল ওরা, কাজেই আরেকটু দাঁড়াল সে। ধীরেসুস্থে গ্লাস নামিয়ে রেখে হাসল। 'পিস্তল রেডি রেখো,' বলল, 'তোমাদের সঙ্গে আরেক হাত লড়ার ইচ্ছে আছে।'

রাস্তায় বেরিয়ে একটা গলির ভেতর ঢুকলাম আমরা, কেউ ছুটে আসছে কিনা বোঝার জন্যে কান পাতলাম, তারপর সরে এলাম কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে।

কোরালে পৌঁছে খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম আমরা। রোকা সিগারেট বানাল একটা। 'গ্রেসিয়াস, অ্যামিগো,' বলল ও। তারপর যোগ করল, 'তোমার হাত খুব চালু, অ্যামিগো, দারুণ চালু।'

চার

যখন ভোর হলো, দুশ্চিন্তা বাসা বাঁধল আমার মনে। মুষড়ে পড়লাম।

গতরাতে খুনোখুনি করেছি। অবশ্যি পিস্তল ঝুলিয়ে যারা গোল পাকাতে আসে তাদের ব্যাপারে বড় একটা মাথা ঘামাই না আমি। কোনও লোক যখন সাথে পিস্তল রাখে তখন তার ভেবেচিন্তে পা ফেলা উচিত, কারণ নীরবে মার হজম করতে কেউই চায় না।

আসলে ওই বালকই আমাকে দুর্ভাবনায় ফেলেছে। বাচ্চা একটা ছেলে, বন্দী হয়েছে অ্যাপাচিদের হাতে, ইতিমধ্যে হয়তো ওকে খুন করেছে ওরা। ছেলেটা আমার ভাতিজা, রক্ত সম্পর্কের।

কী দুস্তর পথ আমাকে পাড়ি দিতে হবে, আমার চেয়ে ভাল তা আর কেউ জানে না। বলতে কী, আগামী একটা মাস কিংবা তার কিছু বেশি দুঃস্বপ্নের মত কাটবে আমার। বন্ধুর প্রান্তর, প্রায় জনমানবহীন, খাদ্য আর পানীয় জলের প্রচণ্ড অভাব।

ট্যাম্পিকো রোকা সাথে থাকলে এক অর্থে সুবিধাই হবে। একজনের পক্ষে যতটা সম্ভব, দুজন লোক কখনোই ততখানি নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারে না। কিন্তু রোকার ব্যাপার আলাদা। আবার অন্যদিকে, ওর উপস্থিতি পরিস্থিতি আরেকটু জটিল করেছে: রোকার যদি কোনও ক্ষতি হয় সেটা হবে আমার

কারণে।

প্রথমে একটা ঘোড়ার সন্ধান করলাম, কিন্তু কেউ বেচল না। বহু কষ্টে একটা পুরোনো স্প্যানিশ স্যাডল জোগাড় হলো। পুরোনো হলেও মোটামুটি অক্ষত রয়েছে; আরামদায়ক, এবং নরম। আঠারো ডলার দিয়ে স্যাডলটা কিনলাম আমি। তিন ডলার খরচ করলাম স্যাডলব্যাগের পেছনে। একটা পুরোনো আর্মি ক্যান্টিন পড়ল পঁচিশ সেন্ট। একটু-একটু করে জড়ো করছি মালপত্র। বাড়তি কার্তুজ বেল্ট, লাগাম এবং আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনেছি। আমার সামান্য কটা টাকা থেকে এরই মধ্যে পঞ্চাশ ডলার নেমে গেছে– অথচ এখনও আসল জিনিসটাই কেনা বাকি।

টুসানে ঘুরে ঘুরে সবকিছু জোগাড় করছি, কিন্তু আমার চোখকান খোলা রয়েছে, টম আর উলফ লোগান ওত পেতে থাকতে পারে। খবর পেলাম, যে-দুজনের গুলি লেগেছিল তাদের মধ্যে একজন মরেনি। মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে, তবে বেঁচে যাবে। অন্যজনকে তার কম্বলে মুড়িয়ে বুট-হিলে কবর দেওয়া হয়েছে।

আমার যা যা লাগবে দুপুরের মধ্যে কেনা হয়ে গেল সেগুলো, তবু একটা ঘোড়ার খোঁজ মিলল না। সিদ্ধান্ত নিলাম শূ-ফ্লাইতে গিয়ে কিছু খাব। কপাল ভাল হলে, হয়তো এমন কারও দেখা পেয়ে যাব যার কাছে বিক্রি করার মত একটা বাড়তি ঘোড়া আছে।

একটা 'ভি'-আকৃতির মেসকিট গাছের ডালে ভাঙা আয়না ঠেস দিয়ে দাড়ি কামাতে বসলাম আমি। এই ফাঁকে রোকা তার স্যাডলে মাথা রেখে ঘুমোল। আমরা শহরের উপকণ্ঠে কিছু পাথর আর মেসকিট ঝোপের আড়ালে ঘাঁটি গেড়েছি। হঠাৎ আমার কানে এল, কেউ একজন গান গাইছে; 'ওহ্, বারি মি নট অন দ্য লোন প্রেইরী,' রোকা চোখের ওপর থেকে হ্যাট ঠেলে পেছনে সরাল। 'গুলি করো না,' হেসে বলল ও। 'জেমস গ্রীন।'

সত্যি তাই। ঝোপ ভেঙে বেরিয়ে এল গ্রীন, তাকাল আমাদের দিকে। আমরা ওকে খুলে বললাম সব ঘটনা।

'বেন কোথায়?' জানতে চাইল ও। রোকা মারফির হদিস দিল ওকে।

'মেক্সিক্যান পাড়ায়। একটা মেয়ের সাথে খোশগল্প করছে। নাম কনসিটা। বেনের জন্যে চিন্তা কোরো না, সময়ে ও ঠিকই হাজির হবে।'

দাড়ি কামানো সেরে ওদের সঙ্গে সমস্যাটা নিয়ে আরেকবার আলোচনা করলাম আমি, তারপর মারফিকে তুলে আনতে মেক্সিক্যান পাড়ার উদ্দেশে রওনা হলো রোকা। জেমস গ্রীন ঝোপের ভেতর গা ঢাকা দিল আবার। পাছে ও মুষড়ে পড়ে, এই আশঙ্কায় গতরাতের ব্যাপারটা ওর কাছে চেপে গিয়েছি আমরা।

শূ-ফ্লাইতে ঢুকে দেখলাম প্রায় সব আসন পূর্ণ। কৌতূহলী চোখে অনেকে তাকাল আমার দিকে। কাল রাতের গোলাগুলি, নাকি শেভ-লোশনের পরিবর্তে আমি হুইস্কি ব্যবহার করেছি বলে অমন করল ওরা বলতে পারব না। ইচ্ছে করেই মার্শালকে এড়িয়ে চলছি আমি, এত তাড়াতাড়ি শহর ছাড়তে চাই না।

কিছু কাজ বাকি আছে এখনও।

আমি ভোজনরসিক মানুষ– কখনও আপত্তি তুলি না খাওয়ায়। সম্ভবত আজকের পর থেকে বেশ কিছুদিন আর কোনও মহিলার রান্না জুটবে না আমার ভাগ্যে। সনোরা-শিহুয়াহুয়া ট্রেইলে নিজে রেঁধে গরমাগরম খাব তেমন সম্ভাবনাও নেই। আগুন জ্বালালে অ্যাপাচিদের চোখে ধুলো দেওয়া যাবে না।

শূ ফ্লাই বিলাসবহুল না হলেও এই এলাকার সেরা হোটেলগুলোর একটা। পয়লা নজরে মনে হতে পারে এখানে যারা আসে তারা সবাই গোবেচারা ধরনের লোক, খুনোখুনি কী জিনিস জানে না – আসলে তা নয়।

এই মুহূর্তে উইলিয়ম এস. অ্যরির মত লোক বসে রয়েছে কোণের একটা টেবিলে। টেক্সাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছে সে, একসময় রেঞ্জার ছিল, অ্যাপাচি এবং খুনে-ডাকাতদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। দামী বনাতের সুট পরে যে-সব লোক রয়েছে এখানে তাদের প্রত্যেকেরই ইন্ডিয়ান লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা আছে। এরা সুনাগরিক– উকিল, ডাক্তার, খনি ব্যবসায়ী, দোকানি, এই জাতীয় পেশার মানুষ।

সবে খাওয়া শুরু করেছি আমি, কিটি দোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল। পরনে সাদা পোশাক, আরও ফ্যাকাসে রুগ্ন দেখাচ্ছে। ওর ওই আঙুলবিহীন দস্তানাজোড়া আমার কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়। হাতে ছোট্ট একটা ছাতা, সম্ভ্রান্ত মহিলাদের যেমন থাকে।

একটু থেমে ঘরের আলোর সঙ্গে নিজের চোখ সইয়ে নিল কিটি, তারপর আমার টেবিলে হেঁটে এল। আমি উঠে গিয়ে বসালাম ওকে, তারপর নিজের জায়গায় এসে বসলাম।

লোকজন ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে ওকে; কিটি সুন্দরী, কৌতূহল বোধ করছে ওরা– আমাদের সম্পর্কের কথা জানে না।

'ওরিন,' বলল ও, 'শুনলাম তুমি একটা ঘোড়ার খোঁজ করছ? সত্যি?'

'হ্যাঁ, ম্যাম। আমারটা মারা গেছে। এখন একটা স্যাডল হর্স আর একটা প্যাক হর্স লাগবে। অ্যাপাচি হামলায় এদের সরবরাহ কমে গেছে, যা ছিল তাও কিনে নিয়েছে আর্মি।'

'আমাকে বলোনি কেন? আমি তোমাকে ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিতাম। আর দিতাম বলছি কেন, দুটো জোগাড় করে ফেলেছি।'

'ভাল করেছ,' ধন্যবাদ জানালাম আমি। 'আমার মালপত্র কেনা হয়ে গেছে।'

মিসেস ওয়ালেন কফি রেখে গেল টেবিলে। কিটি চুমুক দিয়ে বলল, 'কী একটা ঝামেলায় নাকি জড়িয়ে পড়েছিলে কাল?'

'ঠিক আমার ব্যাপার না। আমার এক বন্ধুকে খুঁজছিল ওরা, না পেয়ে আমাকেই বেছে নেয়। আমাদের আরেক বন্ধুও ছিল তখন– রোকা, আমরা একসাথে এসেছি।'

এ-ব্যাপারে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না কিটি, আমিও কথা বাড়ালাম না।

আশু কর্তব্য সম্পর্কে কিছুক্ষণ আলোচনা করলাম আমরা, তারপর ও জানাল ঘোড়াগুলো কোথায় আছে। 'তোমার জন্যে,' বলল কিটি, 'বড় ঘোড়াটা ঠিক করে রেখেছি আমি। কালো, পাছার কাছে সাদা ছোপ।'

শুনেই আমার চোখ কপালে উঠল। কালোর ওপর সাদা– মরুভূমিতে দূর থেকে চোখে পড়বে ওই ঘোড়া। একেবারে চাঁদের কলঙ্কের মত। আমি খুঁজছিলাম রোয়ান, বাকস্কিন বা ওই ধরনের কিছু একটা। যাকগে, যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে– এখন বাছবিচারের সময় নেই।

'বেশ,' বললাম আমি; তারপর যোগ করলাম, 'ঘোড়া পেলে কাল রওনা হব।'

কিটি জানাল টুসানে হাঁপিয়ে উঠেছে সে, স্যান্তা ফে– কিংবা ওয়াশিংটনে ফেরার জন্যে ছটফট করছে।

'ওয়াশিংটন বেশ ভাল জায়গা,' বললাম আমি।

'গেছ?' কিটি অবাক।

'হ্যাঁ। আমি পটোম্যাকের বাহিনীতে ছিলাম। সেই সময়ে।'

কিটি বিদায় নিল। আমি রয়ে গেলাম। নীরবে চুমুক দিচ্ছি কফিতে, আর পরিস্থিতি বিচার করছি। দক্ষিণ ট্রেইলের ছবি কল্পনা করে বোঝার চেষ্টা করছি কী কী বিপদ আসতে পারে। অন্ধের মত কোনওকিছুতে ঝাঁপিয়ে পড়ি না আমি, বিশেষত পুরো ব্যাপারটাই যেখানে একটু গোলমেলে– যদিও গোলমালটা কোথায় তা আঁচ করতে পারছি না।

মিসেস ওয়ালেন আমার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল। 'কিটি ওসমান আপনার কেউ হয়?'

'ভাই-বউ।'

'অ...এক রকম নাম তো।' খানিক ইতস্তত করে আমার মুখোমুখি চেয়ারে বসে পড়ল সে। 'আমাদের এ-দিকে মেয়েরা বড় একটা আসে না।'

'ওর বাবা মারা গেছেন... ক্যালিফোর্নিয়ায়,' আমি সাফাই গাইলাম। 'ভদ্রলোক একা থাকতেন, আপনজন কেউ ছিল না কাছে। অ্যাঞ্জেল, মানে আমার ভাই, ওর আবার ওয়াশিংটন ছেড়ে নড়ার জো নেই।'

গুম মেরে একটুক্ষণ বসে রইল মহিলা, তারপর উঠে চলে গেল। মিসেস ওয়ালেন কেন আমার সাথে আলাপ করতে চাইছিল বুঝলাম না, তবে মনে হলো আমাকে কিছু একটা বলার ছিল তার– সম্ভবত আর্মি বা অ্যাপাচিদের কোনও প্রসঙ্গ।

প্রথম দর্শনেই বুঝলাম কালো স্ট্যালিয়নটা তেজী। পাছা আর এক পায়ে সাদা ছোপ না থাকলে কুচকুচে কালো রঙ হত। আমার প্রত্যাশার চেয়ে বহুগুণে ভাল জিনিস। প্যাক হর্স দুটো মামুলি মাসট্যাং জাতীয়, তবে শক্ত-পোক্ত।

একটা বাংলোর পেছন দিকে, গোলাবাড়িতে রয়েছে ওগুলো। দোরগোড়ায় হাঁটু গেড়ে বসে আছে মালিক। আমার ঘোড়া জরিপ চোখ কুঁচকে লক্ষ্য করছে।

'বড্ড বাছাবাছি করছ, মিস্টার।' মুখ বাঁকাল সে।

একটা খড় চিবোচ্ছিল, থু করে ফেলে দিল। 'নেয়ার হলে নাও– আমার অত সময় নেই। ভদ্রমহিলা দাম চুকিয়ে দিয়েছেন, তুমি নিয়ে কেটে পড়ো।'

আমাকে পছন্দ হয়নি লোকটার। আমারও ভাল ঠেকছিল না ওর হাবভাব, ঘোড়াগুলো নিয়ে বেরিয়ে এলাম গোলাবাড়ি থেকে। আগের সেই ঝোপের ধারে মালপত্রসহ অপেক্ষা করছে রোকা, স্যাডলে চেপে ওখানে গেলাম।

মেক্সিক্যান পাড়া থেকে একটা ঘোড়া জোগাড় করেছে ও। ফলে আমাদের স্যাডল হর্সের ঘাটতি মিটে গেছে, এখন রওনা হওয়া যায়।

'কোনও সমস্যা,' প্রশ্ন করলাম আমি।

'না,' বলল ও। 'মারফি গ্রীনের সাথে বনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে– আমাদের সঙ্গে দক্ষিণে মিলবে।'

যাত্রা করলাম আমরা। মাইল চারেক পর প্রথমে বেন, তারপর জেমস গ্রীন যোগ দিল।

'খামোকা বিপদের মধ্যে যাচ্ছ তোমরা,' বললাম আমি। 'এটা আমার একার সমস্যা।'

'চোপ্,' বলল বেন। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, সামনে প্রচুর কাজ।'

'সিয়েরা মাদ্রেসে আমি কখনও যাইনি,' ব্যাখ্যা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল জেমস, 'সুতরাং একবার যাওয়া দরকার।'

দক্ষিণে, নাক বরাবর ছুটছি আমরা। আমি পুরোভাগে রয়েছি। পিট কিচেনের বাথানে হরদম লোক যাতায়াত করে এই পথে।

পরিচিত নিয়মিত ট্রেইল হলেই নিরাপদ হবে এমন ভাবা ঠিক নয়। অ্যারিযোনার এই অঞ্চলটিতে পদে পদে বিপদের আনাগোনা। পিট কিচেন চব্বিশ ঘণ্টা সশস্ত্র পাহারাদার মোতায়েন রাখে ট্রেইলে, তাই ইদানীং অ্যাপাচিরা পারতপক্ষে ঘাঁটায় না ওকে।

ইন্ডিয়ানদের সাথে শ্বেতাঙ্গদের এই যে বিরোধ, এতে দু-পক্ষেরই প্রচুর দোষ রয়েছে– এবং এ নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। শ্বেতাঙ্গরা যখন প্রথম এ-দেশে আসে তখন মুষ্টিমেয় কিছু ইন্ডিয়ানের জোত-জমি ছিল এখানে, তাও তাদের অধিকাংশই আবার এক জায়গায় পড়ে থাকেনি। যাযাবরের মত জীবন যাপন করত, ব্যাধবৃত্তিই ছিল জীবনধারণের মূল উপায়। শ্বেতাঙ্গরা এসেছিল বাসোপযোগী জায়গার খোঁজে, নীড় বাঁধার জন্যে। ইন্ডিয়ানদের মত অযথা ঘোরাঘুরি না করে তারা বসতি করে চাষাবাদ শুরু করল।

এদের অনেকেই ইন্ডিয়ানদের সাথে মিলেমিশে থাকতে চেয়েছিল, আবার ইন্ডিয়ানদের মাঝেও এ-ধরনের লোকের অভাব ছিল না; কিন্তু দুপক্ষ থেকেই এর বিরোধিতা করল কেউ কেউ। তরুণ ইন্ডিয়ানরা ঘোড়া চুরি আর করোটি-ছাল সংগ্রহের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী, কারণ এর ফলে মেয়ে মহলে ওদের সম্মান বাড়ে। ওরা দেখল নিজেদের মধ্যে মারামারি করার চেয়ে শ্বেতাঙ্গদের ওপর হামলা চালানো সহজ। দুপক্ষের জ্ঞানী-গুণিরা যখনই শান্তিস্থাপনের চেষ্টা

করেছে, কোনও মাতাল শ্বেতাঙ্গ বা রক্তচক্ষু ইন্ডিয়ান ভণ্ডুল করে দিয়েছে সেই প্রচেষ্টা।

ইন্ডিয়ানরা লুটপাট করে নির্বিচারে, নারী-পুরুষ-শিশু কাউকে রেয়াত করে না। ফলে শ্বেতাঙ্গরা যখন ঘরে ফিরে দেখত তাদের কেবিন ভস্মীভূত হয়েছে, নিহত হয়েছে বউ-ছেলেমেয়ে– তখন, এমনকী বন্ধুসুলভ শান্তিপ্রিয় লোকদের পক্ষেও মাথা ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, এই সমস্যা মেটাতে সরকার যাদেরকে নিয়োগ করেছিল, ধনী শ্বেতাঙ্গদের যোগসাজশে তারা ইন্ডিয়ানদের ওপর অত্যাচার শুরু করল।

কোনও এক পক্ষকে দোষারোপ করা যায় না, আমি জানি। তবে এ-বারের ঘটনায় অ্যাপাচিরা দায়ী, কয়েকজন শিশুকে অপহরণ করেছে, আমরা তাদের উদ্ধার করতে মেক্সিকোয় যাচ্ছি।

সারা বিকেল এবং সন্ধ্যের কিছু সময় এক নাগাড়ে ছুটে চললাম আমরা। রাতে একটা ভাঙা বাড়িতে ক্যাম্প করলাম। ইন্ডিয়ান হামলায় নিহত হয়েছে এই বাসার লোকজন, সব ভেঙেচুরে ছারখার করে দিয়েছে ওরা।

দ্বিতীয় রাতটা কাটালাম পিট কিচেনের বাথানে।

পাঁচ

পিট কিচেনের বাসা থেকে বেরিয়ে সোজা দক্ষিণে কয়েক মাইল গেলাম আমরা, তারপর ট্রেইল ছেড়ে পুবে ঘুরলাম। মরুভূমিতে কখনও যদি ট্রেইল ছাড়তে হয়, নিজের গন্তব্য ঠিকমত জানা চাই, নইলে বিপদ ঘটতে পারে।

এখানে নিজের খেয়াল-খুশিমত কিছু করা যায় না। প্রতিটা পদক্ষেপে পানির কথা মনে রাখতে হয়। দুটো পথ খোলা থাকে সামনে। হয় পানির উৎসের দিকে এগোতে হবে অথবা, একান্তই যদি ট্রেইল থেকে সরতে হয়, পানি ঠিক কোথায় আছে সেটা জানা থাকতে হবে। মরুভূমিতে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নির্ভর করে একটা চিকন সুতোর ওপর।

এর আগে সীমান্তের দক্ষিণে আমরা প্রত্যেকেই গিয়েছি, তবে আমাদের মধ্যে ট্যাম্পিকো রোকা সবচেয়ে ভাল চেনে জায়গাটা, আমার স্থান সম্ভবত ঠিক ওর পরেই। অন্যদের বেলায় যেমন, আমাদেরও তেমনি ওঅটর হোলের ভরসায় থাকতে হবে। এবং যে-রাস্তাই বেছে নেই না কেন, আগে বা পরে ওইসব জলাশয়ের কাছে যেতে হবে আমাদের। অ্যাপাচিদের ক্ষেত্রেও এই সত্য খাটে।

মরুভূমিতে কিছু কিছু ওঅটর হোলের খবর সবাই জানে, তেমনি ছোটখাট আরও কয়েকটা রয়েছে যেগুলো সকলে চেনে না। ওইসব ওঅটর হোলে কম পানি থাকে, খুঁজে বের করাও শক্ত। পশুপাখিরা ওগুলোর ঠিকানা জানে, আর জানে অ্যাপাচিরা। সাধারণ কোনও মরুযাত্রীর যদি চেনা থাকে, ভাল– নইলে

চেনার কৌশল রপ্ত করতে হবে তাকে। তবে এই রপ্ত করার কাজটা বেশ কঠিন।

হিংস্র এলাকায় যে-লোকের বসবাস তাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সদা-সচেতন থাকতে হয়। সজাগ রাখতে হয় চোখ-কান, প্রতিটা ইন্দ্রিয়। কেবল অ্যাপাচিদের ভয়ে তা নয়; ভয় খোদ মরুভূমিকে। এর সাথে বিরোধ চলে না... সহবাস করতে হয়।

মরুভূমি মানে শুধু উত্তপ্ত সূর্য আর বালু নয়; পাথরও। মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, কোথাও-বা স্তূপাকারে। মরাটে লাল অথবা কালো পাহাড়ের ভাঙা খাঁজ রয়েছে, ডাইনোসরের ভাঙা শিরদাঁড়ার মত, দেখলেই গায়ে কাঁটা দেয়। বালুর ওপর দিয়ে চলে গেছে এগুলো, আর বালু এদেরকে ফের কবর দেওয়ার লক্ষ্যে নিরন্তর ব্যস্ত।

দক্ষিণ-পশ্চিম মরুভূমিতে শুকনো নদীবক্ষগুলো ফ্যাকাসে সাদা, তবু এক-আধটু সবুজের দেখা মেলে। কোনও কোনও মরু-উদ্ভিজ্জ বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে, তারপর আচমকা বিকশিত হয়ে সব পানি শুষে নেয়। তবে সবুজ দেখলেই বৃষ্টি হয়েছে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই: অধিকাংশ মরু-লতাগুল্ম খরার সময় টিকে থাকার জন্যে নিজেদের কোমল শরীরে পানি সঞ্চিত রাখে। আবার তেমনি, অনেক গাছের পাতা শক্ত চকচকে, ফলে আর্দ্রতা শুষে নিতে পারে না সূর্য– রোদ ঠিকরে ফিরে আসে।

গাছপালা, পশুপাখির মত অ্যাপাচিরা মরুভূমিতে জীবন-ধারণের কায়দা রপ্ত করেছে। এবং এ-ক্ষেত্রে ওদের সঙ্গে আমাদের এই চারজনের মিল রয়েছে।

মরুভূমি অসাবধান লোকের শত্রু। সময়, রাস্তা, বা যন্ত্রপাতি এমন কিছু নেই যা এর ব্যতিক্রম ঘটাতে পারে। সহজতম রাস্তা বেছে নেওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই সচেতন হতে হবে মরুযাত্রীকে। নিজের দম, শক্তি এগুলো জিইয়ে রাখার জন্যে ধীর কদমে এগোতে হবে। যে-সব চিহ্ন দেখে বোঝা যায় পানি কোথায় আছে সব সময় চোখে-চোখে রাখতে হবে সেগুলো। পশুপাখির ট্র্যাক, মৌ-মাছি এগুলো দেখেই পানির হদিস পাওয়া যায় মরুভূমিতে। কোনও কোনও পশুপাখি পানির কাছ থেকে একদম নড়ে না; অন্যরা কদাচিৎ পান করে, আহার্য বস্তু থেকে তাদের পানির অভাব মিটে যায়।

অবিরাম এগিয়ে চললাম আমরা, তারপর সূর্য যখন প্রায় মাথার ওপর চলে এসেছে তখন দিক্ বদলে একটা সরু ক্যানিয়নে ঢুকে ছায়ায় দাঁড়ালাম– দিনের সবচেয়ে গরমের সময়টুকু পাড়ি দেব এখানে। জিন খসিয়ে একটু নড়াচড়ার সুযোগ দিলাম ঘোড়াগুলোকে, তারপর রোকার পরিচিত শীর্ণতোয়া একটা ঝরনা থেকে পানি খাইয়ে আনলাম। এরপর, একজনকে পাহারায় রেখে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম বালুর ওপর।

পাহারার দরকার আছে। অ্যাপাচিরা চতুর ঘোড়া চোর, যদিও কোম্যাঞ্চেদের তুলনায় শিশু। প্রবাদ, আরোহী স্যাডলে থাকা অবস্থায় কোম্যাঞ্চেরা নাকি তার ঘোড়া চুরি করতে পারে। মরুভূমিতে ঘোড়া হারানো আর মৃত্যুর সাথে কোলাকুলি করা একই কথা।

ক্যানিয়নে ঢোকার আগে আশপাশ জরিপ করেছি আমরা। মানুষ যেমন খবরকাগজ পড়ে, তেমনি বুনো এলাকায় যাদের ঘোরাফেরা তারা সহজেই ট্রেইলের চিহ্ন পাঠ করতে পারে– ক্ষেত্র বিশেষে ব্যাপারটা বেশ রোমাঞ্চকর।

শুধু ট্র্যাক দেখলেই চলে না, দূরের আকাশে ধুলোর পরিমাণ দেখে ওর নীচে কজন ঘোড়সওয়ার রয়েছে এবং তারা কোনদিকে যাচ্ছে সেটাও আঁচ করতে হয়।

ঘোড়ার মল দেখে বোঝা যায় কী খেয়েছিল সে।

একটা ঘোড়ার ট্র্যাক আরেকটার সাথে মেলে না। প্রতিটির চলন আলাদা। সমান তালে পা ফেলে না ওরা, নাল পরানোর তারতম্য দেখা যায় বহুক্ষেত্রে।

বুঝতে পারলাম অন্তত গত দু-তিন মাসের ভেতর কেউ আসেনি এ-দিকে। জুন, জুলাই, আগস্ট এই তিন মাসে মাঝে-মধ্যে বৃষ্টিপাত হয় সনোরায়। যেমন আচমকা মুষলধারে শুরু হয় তেমনি ছেড়ে যায় হঠাৎ করে। এইসময়ে পাহাড়ের বিভিন্ন গর্ত ভরে যায়।

মরু-পাহাড়ে এ-ধরনের জলাশয় হরহামেশা দেখা যায়, তুমুল বৃষ্টিপাত আর ঝরনাস্রোতে পাথর ক্ষয়ে সৃষ্টি হয়েছে এগুলো। বৃষ্টির মৌসুমে ভরে যায় গর্ত, এবং কয়েক হপ্তা, এমনকী মাস অবধি ধরে রাখে পানি। হালে বৃষ্টি হয়েছে এ-দিকে, ওঅটর হোল আর ওইসব গর্তে এখন পানি পাওয়া যাবে।

সূর্যাস্তের একটু আগে, দিবানিদ্রা ছেড়ে আবার স্যাডলে চাপলাম আমরা। এ-বার আমি নিলাম নেতৃত্বের ভার।

এখানে-সেখানে চোলা আর অকোটিওর ঝাড়। সুযোগ পেলেই চলে যাচ্ছি ওগুলোর আড়ালে। একটা প্রাচীন ট্রেইল বেছে নিয়েছি আমরা, এখন আর ব্যবহার হয় না, তবু মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়ের পাশে থেমে চারদিক জরিপ করছি।

খোলামেলা জায়গা বলে অসতর্ক হলেই মরণ। অ্যাপাচিরা এ-রকম জায়গাতেও অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে।

আমরা ধীরেসুস্থে এগোচ্ছি, ঘোড়ার শক্তি বাঁচিয়ে। তাড়া থাকলে, একজন অ্যাপাচি দিনে ষাট-সত্তর মাইল পাড়ি দেয়। হাঁটাপথে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ মাইল যেতে পারে। আমরা এখন ঘোড়ার পিঠে ওই গতিতে চলছি।

অন্ধকার নামার এক ঘন্টা পর একটা পাহাড়ের ফাঁকে সাময়িক যাত্রা বিরতি করলাম আমরা। চারদিক মেসকিট ঝোপে ঘেরা। ছোট করে আগুন ধরালাম শুকনো ডালপালা দিয়ে, কফি তৈরি করলাম। সামনে ঝোপ থাকায় আগুন ঢাকা পড়েছে, চট করে চোখে পড়বে না।

'কী মনে হয়?' আচমকা নীরবতা ভাঙল রোকা। 'রাইডার?'

'হুঁ,' বললাম আমি; 'বেঁটে লোক, অথবা বাচ্চা ছেলে।'

'কী এত ফিসফাস করছ?' জিজ্ঞেস করল গ্রীন।

'ট্র্যাক,' বললাম আমি। 'নাল-পরানো ঘোড়া। ছোট কিন্তু ভাল জাতের। ছুটতে পারে... মরুভূমির জিনিস।'

'ইনজুন, চোরাই ঘোড়ায়,' ঝটপট মীমাংসায় পৌছুল বেন। 'এখানে একাকী কোনও শ্বেতাঙ্গ আসবে না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সংশয় প্রকাশ করল রোকা। 'কী জানি... হতে পারে।'

ট্র্যাকগুলো দুর্ভাবনায় ফেলে দিল আমাকে। ওই ঘোড়সওয়ার যে-ই হোক, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চলাফেরা করছে। এর অর্থ লোকটা অ্যাপাচি নয়। এটা ওদের এলাকা। এখানে কোনও অ্যাপাচি ভয়ে ভয়ে চলবে না। হুঁশিয়ার থাকবে, কিন্তু থেমে এই অশ্বারোহীর মত সবকিছু জরিপ করবে না।

সুতরাং এই ঘোড়সওয়ার শ্বেতাঙ্গ না হয়েই যায় না। অবশ্যি নাবালক হলে অন্য কথা।

মরুভূমিতে সূর্য বিদায় নেওয়ার পর তাপের উষ্ণতা কমে আসে, ঠাণ্ডা নামে ধীরে ধীরে। শীতল বাতাসের পরশ পেয়ে ঘোড়াগুলো এমনভাবে ছুটছে যেন সিয়েরা মাদ্রের পাইন বনের গন্ধ পেয়েছে। সময়ে সময়ে থেমে রাত্রের আঁধারে কান পাতছি।

ভোর হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিলাম আমরা। একটা মেসকিট ঝোপের পেছনে হাঁটু গেড়ে বসে সিগারেট ধরাল রোকা, একগাল ধোঁয়া ছেড়ে তাকাল আমার দিকে। 'ব্যাভিসপে চেনো?'

'হ্যাঁ... সামনের মোড়ে দেখা পাব... ওখানেই আবার দক্ষিণে ঘুরেছে নদীটা।'

এই অঞ্চল ট্যাম্পিকো রোকার নখদর্পণে; হাজার হোক ওর ধমনিতে অ্যাপাচি রক্ত বইছে, সিয়েরা মাদ্রেয় ছিল এক সময়ে। গ্রীন অকাতরে ঘুমোচ্ছে। বেন পাহারায় রয়েছে, আমাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে না। আমি ক্লান্ত বোধ করছি, ইচ্ছে হচ্ছে সামনের নদীতে গোসল করি, যদিও জানি তা সম্ভব নয়।

অনেকক্ষণ হলো মুখে কুলুপ এঁটেছে রোকা। আমি বালুতে পিঠ ঠেকিয়ে তারা গুনছি। শেষ-রাতের আকাশে নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছে ওদের, যেন আমাদের মতই বিরহকাতর। আমি একলাটি, ভবঘুরে, সম্বল বলতে একরকম কিছুই নেই। বলতে কী, আমাদের সবার এক অবস্থা। নারীর ছোঁয়া নেই আমাদের জীবনে– হিসেব কষলে হয়তো দেখা যাবে সব মিলিয়ে চার-পাঁচ হপ্তাও একছাতের নীচে রাত কাটাইনি।

ট্রেইলে মানুষের জোট বাঁধার ব্যাপারটি ভারি অদ্ভুত; পরস্পরকে চেনে না, কোনওরকম আত্মীয়তা নেই, এইরকম কিছু লোককে তাদের জীবনযাপনের রীতি কাছাকাছি নিয়ে আসে– যেমন ইউমায় আমাদেরকে এনেছে। বর্তমান সমস্যাটি আমার একার, বাকি তিনজন স্রেফ বন্ধুত্বের খাতিরে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। এটা পশ্চিমের লোকদের স্বভাব, ওদের বেলাতেও এমনটা করতাম আমি।

পুব আকাশে গোধূলির আলো ফুটতে আমরা ফের যাত্রা করলাম। অন্ধকার পাততাড়ি গুটোচ্ছে। প্রতিটা জিনিসকে চেনা যাচ্ছে আলাদাভাবে; নিরেট কালো গম্ভীর পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে অটল হয়ে। একসারিতে এগোচ্ছি আমরা,

কারও মুখে রা নেই. তারপর মাথার ওপর ধূসর আকাশ যখন হলুদ বরণ হতে শুরু করল এক নির্জন কোণে থেমে হালকা নাস্তা সারলাম।

একটা পাহাড়ি ফাটলের ভেতরে, মেসকিট ঝোপের নীচে সাবধানে আগুন ধরিয়েছি আমরা। ওপরের ডালপালার ভিড়ে হারিয়ে যাবে ধোঁয়া। আমাদের টাটকা গরমাগরম খাবার খাওয়ার কাল ফুরিয়ে এল প্রায়। কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনা যদি না ঘটে, আমরা আর অল্পক্ষণের ভেতর ব্যাভিসপের তীরে পৌছুব। ওই নদীর ও-পারে মূল অ্যাপাচি ভূখণ্ড। তখন ওরা আমাদের চারদিকে থাকবে।

ঊষর অঞ্চলে, যেখানে ফসলের সম্ভাবনা একেবারেই নেই, অ্যাপাচিরা লুটপাটের দিকে ঝুঁকেছে।

ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে আমি যে-সব পণ্ডিতজনের আলোচনা শুনেছি তারা প্রায় সবাই একমত: জমি কেড়ে নেওয়ার ফলে ওদের এই সর্বনাশা হাল। কথাটা বহুলাংশে সত্যি। কোনও ইন্ডিয়ানের পক্ষে মাপাজোখা দশ বা একশো একর জমিতে নিজের পছন্দমত বাস করা সম্ভব নয়। তার দরকার বিশাল মৃগয়াক্ষেত্র; পঞ্চাশজন ইন্ডিয়ানের ভরণপোষণ করতে পারবে যতটা জায়গা, সেখানে দশ হাজার কৃষিজীবী শ্বেতাঙ্গ মানুষ অনায়াসে খেয়ে-পরে বাঁচবে।

তবে ইন্ডিয়ানরা সত্যিকারের মার খেয়েছে যে-দিন প্রথম ওদের একজন নিজের জন্যে একটা রাইফেল কিনেছে। ওদের সর্বনাশ করেছে ব্যবসায়ীরা, ইন্ডিয়ানরা তৈরি করতে পারবে না এমন জিনিস ওদের হাতে তুলে দিয়ে। সেই থেকে আরও অস্ত্র আর গোলাবারুদের চাহিদায় শ্বেতাঙ্গদের ওপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে ওরা।

ভোরের মিষ্টি সুশীতল আবহাওয়া উপভোগ করছি আমরা। বাতাসে লাকড়ির ধোঁয়া, বেকন ভাজার সুবাস আর কফির সুগন্ধ ভাসছে। জানি ঝুঁকি আছে এতে, তবে আমাদেরও চোখ-কান খোলা।

'বাচ্চার বয়েস কত?' আচমকা জিজ্ঞেস করল বেন।

'পাঁচ... ছয়ের কাছাকাছি।'

'ট্যাম্প, তোমার কী মনে হয়– এখনও বেঁচে আছে ও?' গ্রীনের প্রশ্ন।

কাঁধ ঝাঁকাল রোকা। 'যদি সাহসী ছেলে হয়, একটা সম্ভাবনা আছে। আরেকটু গেলেই ওদের পাব আমরা।'

'সেই রহস্যময় ঘোড়সওয়ারের আর কোনও খবর?' জানতে চাইল গ্রীন। 'সকাল থেকে ওর ট্র্যাক সন্ধান করছি।'

'না,' আমি বললাম, 'আমার চোখে পড়েনি।'

'সামনের অঞ্চলটা কেমন?' প্রশ্ন করল বেন।

'ওক... তারপর পাইন। ঝরনা, পাহাড়। খাবার ছাড়া আর সবকিছু। ওটা ওরা বাইরে থেকে আনে। মেক্সিক্যানদের কাছে পায়, না দিলে খুন করে।' বাতাসে হাত খেলাল রোকা। 'সনোয়ার এই দিকটায় মেক্সিক্যানদের শেষ করে এনেছে, ওরা। অন্তত ধনীদের। গরীবরা তদ্দিন বেঁচে থাকবে যতদিন অ্যাপাচিদেরকে খাবার জোগান দেবে।'

মরুভূমি পেরিয়ে কিটির কাছে ফিরে গেল আমার চিন্তা। সুন্দরী মহিলা, এবং সাহসী..., সন্তানকে হারিয়েও ভেঙে পড়েনি। কিন্তু ওর হাবভাব কেন যেন আমার ভাল ঠেকেনি।

নীরবে বসে রয়েছি আমরা। শব্দ করে ঘাস চিবুচ্ছে ঘোড়াগুলো। রোকা ধূমপান করছে, চোখ কুঁচকে চেয়ে আছে অদূরবর্তী পাহাড়গুলোর দিকে।

সামনে কী রয়েছে আমরা কেউই জানি না। ছেলেটা যদি এখনও বেঁচে থাকে, অ্যাপাচিদের কবল থেকে উদ্ধার করা নেহাত সহজ হবে না। আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনা শতকরা একেরও কম। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে রোকার দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'কী, যাবে এখন?'

বালুতে সিগারেটের শেষাংশ গুঁজে উঠে পড়ল ও।

হঠাৎ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম আমি। মনে হলো এখানে না এলেই ভাল ছিল। নরকে ঢুকতে যাচ্ছি, শুধু নিজের কথা ভাবছি তা নয়– আমার খাতিরে যারা বিপদের মুখে পা বাড়িয়েছে শঙ্কা তাদের জন্যেই। তার ওপর, গোটা ব্যাপারটাই রহস্যজনক, এখনও কিনারা করতে পারিনি।

ব্যাভিসপে অতিক্রম করে একটা সরু ট্রেইল ধরলাম আমরা, বিক্ষিপ্ত ওক ঝাড়ের ভেতর দিয়ে উঁচু-নিচু হয়ে পাইন বনের দিকে চলে গেছে। নিস্তব্ধ চরাচর, পাখির কিচিরমিচির আর খুরের আওয়াজে গা ছমছম করে ওঠে।

এক ঘণ্টার মত চড়াই ভাঙলাম, পথে বার কয়েক থেমে ঘোড়াগুলোকে দম ফেলার সুযোগ দিয়েছি। অবশেষে পাইন বনের ভেতর সমতল একটা জায়গায় উপস্থিত হলাম। অদূরে কিছু ভাঙা দালানকোঠা। কোনও এককালে জমাট লাভা দিয়ে তৈরি হয়েছিল। আপাতত ডজনখানেক দেখা যাচ্ছে; হয়তো সামনে, গাছপালার আড়ালে আরও আছে। একধরনের ধূসর ফেল্‌সপারের দেয়াল। দু-একটার গঠন বাকিগুলোর চেয়ে মজবুত– উন্নত কারিগরের তৈরি।

একটা দেয়ালের কাছে দোমড়ানো ঘাস দেখিয়ে রোকা বলল, 'আমরা এখনও ট্রেইলে রয়েছি।'

একটা মোচাকৃতি পাইন গাছ থেঁতলে রয়েছে, দেখে মনে হয় নালগুলো ধারাল ছিল, কিছু কিছু জায়গায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে পাতা।

বুনো বন্ধুর এলাকা, কোথাও পানির ছায়ামাত্র চোখে পড়ছে না। চারপাশে গাছপালার পরিমাণ দেখে অনুমান করলাম, প্রায় ছহাজার ফুট উঁচুতে রয়েছি, এবং ক্রমশ আরও ওপরে উঠছি। এখানে-সেখানে ট্রেইল কিনার ঘেঁষে চলে গেছে, একটু বেসামাল হলেই অতল খাদে গিয়ে পড়ব। রাইফেল হাতে চলছি আমরা, রেকাবে আলতোভাবে পা রেখেছি, বেগতিক দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত। এ-রকম কিছুদিন থাকলে মাথার সব চুল পেকে যাবে।

একটা পাহাড়ের স্কন্ধদেশের কাছে বেরিয়ে এলাম আমরা। ডানে-বাঁয়ে, সামনে কেবল পাইন আর পাইন। বিক্ষিপ্ত কিছু ঘাস রয়েছে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বরফ-গলা পানি গড়িয়ে পড়ছে। সেই অজানা অশ্বারোহীর ট্র্যাক স্পষ্ট ফুটে আছে ওখানে। ক্ষুদ্রকায় ঘোড়াটা একটা গাছের নীচে বাঁধা ছিল, আর

মেয়েটা আগে বেড়ে জরিপ করেছে।

মেয়ে?

আচমকা শব্দটা বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে। যেন কেউ আমার কানে কানে বলল এবং আমি জোরে পুনরাবৃত্তি করলাম সেটা। 'মেয়েছেলে, ট্যাম্প। বোধহয় কিশোরী।'

পমেলের ওপর হাত রাখল রোকা। 'হ্যাঁ।'

'মেয়েছেলে?' গ্রীনের কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'অসম্ভব।'

'ডিন ক্রীডের স্ত্রী-কন্যা কেউ আছে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

রোকা ঘাড় ফেরাল। 'বলতে পারব না।'

আমি নেমে পড়লাম। 'তোমরা বসো, আমি দেখে আসি ও কী দেখতে গিয়েছিল।'

দু-এক কদম যেতেই ওদের চোখের আড়ালে গাছপালার ভেতর হারিয়ে গেলাম আমি। এখানে-সেখানে বুটের চাপে দোমড়ানো ঘাস, ঝরা পাতা চোখে পড়ছে। সহজ রাস্তা, তবে এঁকেবেঁকে যাচ্ছি বলে সময় লাগছে।

সহসা একটা পাহাড়ের কিনারে হাজির হলাম আমি, সময়মত থমকে দাঁড়ালাম। ঢাল খুব খাড়া নয়– গড়িয়ে নামা যাবে।

প্রায় দুহাজার ফুট নীচে তৃণভূমি, চোখ জুড়ানো। একদিকে গাছপালা-ঘেরা দীঘি। শূন্যোদ্যান বললে মোটেও অত্যুক্তি হয় না, এক বিশাল ক্যানিয়নের মুখে গিয়ে শেষ হয়েছে। তিনটে চুলোতে রান্না হচ্ছে, একধারে বসে খোশগল্প জুড়েছে বারোজন অ্যাপাচি।

চট করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম আমি যাতে আমার নড়াচড়া ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। তারপর একটা কিনার ঘেঁষা ম্যানযানিটা ঝোপের ফাঁক দিয়ে ক্যাম্পটা জরিপ করলাম।

ইন্ডিয়ান মেয়েরা কাজ করছে। বাচ্চারা খেলা করছে। এই ক্যাম্পে নিরাপদ বোধ করছে ওরা। আজ পর্যন্ত কেউ অনুপ্রবেশ করেনি এখানে। ওরা ছাড়া আর কেউ এই আস্তানার খবর জানে না। দীর্ঘদিন ধরে বংশ পরম্পরায় লুটপাট সেরে এখানে জমায়েত হয় ওরা। নিশ্চয়ই কাছেপিঠে এ-ধরনের ঘাঁটি আরও আছে।

অ্যান্ডি এগুলোর কোনও একটায় রয়েছে। নিজের অস্তিত্ব গোপন করে এভাবে আর কতক্ষণ সন্ধান চালাতে পারব আমরা?

ঝেড়ে ফেললাম দুশ্চিন্তা। অ্যান্ডি আমার ভাইয়ের ছেলে, আমার ভাতিজা। আমাদের ওসমান ধমনিতে রক্তের টান গভীর, সুদৃঢ়। এ আমাদের স্বভাব, আবাল্য শিক্ষা।

আরও কয়েক মিনিট ওদের ক্যাম্প পর্যবেক্ষণ করলাম আমি। তারপর ফিরে এলাম বনের ভেতর দিয়ে।

'র‍্যাঞ্চেরিয়া,' বললাম আমি। র‍্যাঞ্চেরিয়া মানে ইন্ডিয়ানদের অস্থায়ী ডেরা। 'তবে অ্যান্ডি আছে বলে মনে হলো না।'

ছয়

পাহাড় বেয়ে আমাদের আগে কে এসেছিল জানি না, প্রচুর সময় নিয়ে ওই ক্যাম্পটা জরিপ করেছে সে। অসংখ্য ট্র্যাক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, বুঝতে কষ্ট হয় না বহুক্ষণ এখানে ছিল মেয়েটা। এবং তারপর স্যাডলে চেপে চলে গেছে।

আমরাও এগোচ্ছি। এখন যে-ট্রেইলে রয়েছি সেটা একটা হরিণ চলাচলের পথ... কিংবা বিগহর্ন ভেড়ার হতে পারে, ওদের ট্র্যাকের চেহারা মোটামুটি এক। এ ছাড়া আরও কিছু ট্র্যাক রয়েছে ওই ট্রেইলে। ছোট্ট একটা ঘোড়ার পায়ের ছাপ, এবং কোথাও কোথাও মেয়েটার বুটের দাগ।

একটুবাদে আমরা একটা বন্ধুর এলাকার দেখা পেলাম। পেছনে বিশাল নুড়িপাথরের স্তূপ আর দুধসাদা ঝরনাধারা ফেলে এসেছি। ঈষৎ তিতকুটে স্বাদ, তবু পানীয় জল হিসেবে মন্দ নয়। প্রায়শ ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটতে হচ্ছে, বড় বড় গাছের ডাল অথবা বিরাট পাথর দাঁড়িয়ে আছে পথ রোধ করে।

একটা গাছের নীচে রাশ টেনে স্যাডল থেকে নামলাম আমরা। চারপাশে পাইনের সারি। ট্যাম্পিকো রোকা উবু হয়ে তীক্ষ্ণ চোখে মাটির দিকে তাকাল। বেন মারফি ঘাড় ফেরাল আমার দিকে। 'ওরিন... তোমার ধারণা অ্যান্ডিকে খুঁজে পাব আমরা?'

'হ্যাঁ।'

ওর মনোভাব বুঝতে পারছি। বিশ্রাম। ক্লান্তি ভর করছে আমাদের ওপর। ইন্ডিয়ান ঘাঁটির মূল অংশে পৌঁছে গিয়েছি আমরা, কম বেশি সবাই স্নায়ুর চাপে ভুগছি। প্রত্যেকেই জানি দেখে ফেললে আমাদের ভাগ্যে কী ঘটবে। তুমুল সংঘর্ষ বাধবে... পালাতে হবে।

একবার আমাদের উপস্থিতি জানাজানি হয়ে গেলে আমরা আর ওই বাচ্চাদের কাছে পৌঁছুতে পারব না। এ-পর্যন্ত ভাগ্য আমাদের সহায় হয়েছে, আর একই সাথে কাজ দিয়েছে রোকার দক্ষতা-- এই অঞ্চল সম্পর্কে ওর জ্ঞান।

এগোচ্ছি আমরা, একটা-দুটো ইন্ডিয়ান ট্র্যাক চোখে পড়ছে। এতক্ষণ পাহাড়ের চড়াইতে ছিলাম, এ-বার নামছি ধীরে ধীরে। নীচের উপত্যকা শিকারের জন্যে আদর্শ স্থান, প্রতি মুহূর্তে ইন্ডিয়ানদের সামনে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

'সামনে আরেকটা র‍্যাঞ্চেরিয়া পড়বে,' খানিক বাদে বলল রোকা।

এটাও ফাঁকা জায়গায় অবস্থিত। পেছনে আকাশ-ছোঁয়া পর্বত। আশপাশে ছোট ছোট টিলা, পাইনে-ছাওয়া ঢাল। ওদের র‍্যাঞ্চেরিয়ার চারপাশে অসংখ্য পাথরচাঁই আর গাছ। কোল ঘেঁষে একটা ক্ষুদ্র ঝরনা। আমরা আসার পরপরই কয়েকজন ঘোড়সওয়ার ধুলো উড়িয়ে ঢুকল ক্যাম্পে। ছজন অ্যাপাচির একটা

দল। চারজনের কাছে তীর-ধনুক, দুজনের হাতে রাইফেল।

দুজন বড় বড় মাংসের টুকরো বইছে, সম্ভবত লুণ্ঠিত গবাদি পশুর। আরেকজন কিছু কাপড়চোপড় নামাল। কোনও মেক্সিক্যান বা তার স্ত্রীর গা থেকে খুলে নিয়েছে হয়তো– এতদূর থেকে বোঝা গেল না কোনটা ঠিক।

হঠাৎ আমার পেটে কনুইয়ের খোঁচা মারল গ্রীন, ইশারা করল। জনাকয়েক বাচ্চা ছেলেমেয়েকে দেখা যাচ্ছে, হাতে কঞ্চির বোঝা। একটা শ্বেতাঙ্গ বালক রয়েছে ওদের মাঝে, মুখ অংশত আমাদের দিকে ফেরানো। বেশ লম্বা, বয়েস বড়জোর বছর নয়েক।

সম্ভবত এটাই আমাদের ঈপ্সিত ক্যাম্প। আর যাই করি, ওই ছেলেটার সাথে কথা বলতে হবে।

বাতাসে সজীব সবুজ পাইনের সুবাস। ক্যাম্প থেকে হালকা ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে আসছে। ইন্ডিয়ানদের কণ্ঠস্বর অস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছি আমি– স্থাণুর মত বসে ভাবছি, অপেক্ষা করছি।

এখানে আরও শ্বেতাঙ্গ শিশু থাকলে, ওই ছেলেটা নিশ্চয়ই তাদের খবর জানবে। কিন্তু ও যদি এরই মধ্যে অ্যাপাচি বনে গিয়ে থাকে, তখন? শৈশবে অ্যাপাচিদের খপ্পরে পড়েছে এ-রকম বহু শ্বেতাঙ্গ পরে আর নিজেদের বাড়িঘরে ফিরে যেতে চায়নি। ওর সাথে কথা বলায় ঝুঁকি আছে, তবু উপায় নেই।

বেন তাকাল আমার দিকে। বলল, 'আচ্ছা ঝামেলাতেই পড়েছি।'

'সহজে হবে আমি তা কখনোই ভাবিনি।' র‍্যাঞ্চেরিয়াটা জরিপ করলাম আমি। অবস্থা সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।

'আমরা খুব কাছে চলে এসেছি,' বলল রোকা। 'সরে যাওয়া দরকার। বাতাস উল্টো দিকে বইলে কুকুরগুলো আমাদের গন্ধ পাবে।'

পিছিয়ে এলাম। সামান্য ঘোরাঘুরি করতেই একটা গাছের নীচে গর্ত চোখে পড়ল। আশপাশে অজস্র পাথরচাঁই আর বড় বড় গাছ। গা ঢাকা দেওয়ার পক্ষে আদর্শ জায়গা, হাওয়া লাগবে না।

আমার অস্থিরতা কাটছে না। যখন একা চলাফেরা করি, বস্তুত অধিকাংশ সময়েই তাই করি আমি, নিজের ভালমন্দ ছাড়া আর কারও ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হয় না আমাকে, এবং যদি বিপদে পড়ি কেবলমাত্র আমারই গর্দান যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা– আমার বন্ধুদের কিছু একটা হয়ে গেলে ভীষণ আঘাত পাব আমি।

তবু এসেছি যখন, কাজটা সারতে হবে আমাদের। 'রোকা,' বললাম আমি, 'ওই ছেলেটাকে কি একা পাওয়া যাবে?'

'সন্দেহ আছে। কতদিন হলো এখানে আছে, এবং অ্যাপাচিরা ওকে কতটা বিশ্বাস করে তার ওপর নির্ভর করছে। আমাদের বরাত যদি ভাল হয়, হয়তো পেয়েও যেতে পারি।'

'অন্যদের কথা তো ওর জানা উচিত?'

'উচিত। এ-সব খবর চাপা থাকে না। অ্যাপাচি ছেলেমেয়েরা জানবেই,

এবং ওরাই বলবে ওকে। ছেলেবেলায় আমি যখন অ্যাপাচি ক্যাম্পে ছিলাম, কী হচ্ছে না হচ্ছে সব জানতাম।

আপাতত করার মত কিছু নেই আমাদের। অন্যরা ঘুমের আশায় হাত-পা লম্বা করে দিল, আমি পাহাড়ের কিনারে ফিরে গেলাম– ক্যাম্পটাকে আরেকনজর ভাল করে দেখব।

নীরব নিথর পরিবেশ। ইন্ডিয়ান মেয়েদের স্বভাব, ঘর-কন্যার কাজে ব্যস্ত। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে খেলাধুলা করছে একধারে। একজন অ্যাপাচি যোদ্ধা নিজের দাওয়ায় পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে। তখন আমরা যাদের ক্যাম্পে আসতে দেখেছিলাম এও তাদের মধ্যে ছিল। লোকটা ঈষৎ কুঁজো তবে পেটা শরীর। বয়েস আমার মতই হবে। একটা নতুন উইনচেস্টার আছে ওর, কক্ষনো সেটা হাতছাড়া করে না। এমনকী এখানে, ওদের এই গোপন ডেরাতেও, সতর্কতায় একটুও ঢিল দেয়নি।

কিছুক্ষণ পর আমি ক্যাম্পে ফিরে এলাম এবং বেন পাহাড়ের কিনারে গিয়ে আমার স্থান দখল করল। একটা নিচু গাছের তলায় বিশ্রাম নিতে বসলাম আমি।

চারদিক নিঝুম। সঙ্গত কারণেই আগুন জ্বালাইনি আমরা। দিনের আলো যাই-যাই করছে, ইতিমধ্যে আঁধার নামতে শুরু করেছে গাছপালার নীচে।

এক মুহূর্ত অনড় হয়ে শুয়ে রইলাম আমি, কান খাড়া। তারপর মাথা জাগিয়ে তাকালাম চারপাশে। দূরে একটা স্যাডল রয়েছে– ওটার পালিশ আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে। আর কিছু চোখে পড়ল না। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই, কেবল গাছের পাতায় বাতাসের কানাকানি।

ডান হাত বাড়িয়ে আমার রাইফেলটা ধরলাম আমি, ট্রিগারের কাছাকাছি আঙুল। গুলির আওয়াজে চাকা-ভাঙা মৌ-মাছির মত ছুটে আসবে অ্যাপাচিরা।

সাবধানে, কম্বলের নীচ থেকে বেরিয়ে হাঁটু ভেঙে বসলাম। জেমস গ্রীন যেখানে শুয়েছিল সে-দিকে তাকিয়ে দেখলাম কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে ও।

রোকার ছায়াটি দেখা যাচ্ছে না কোথাও; বিছানা ফাঁকা। ইচ্ছে করেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়েছিলাম আমরা, ক্যাম্প আক্রান্ত হলে একসাথে মারা পড়ব না সবাই– বাধা দেওয়ার সুযোগ থাকবে।

আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম আমি, তারপর আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে সাঁৎ করে চলে গেলাম একটা গাছের আড়ালে। তবু কোনও নড়াচড়ার আলামত নেই।

আমার উৎকণ্ঠা মিছেমিছি জাগেনি, আমি নিশ্চিত। কেউ একজন চুপিসারে এসেছিল আমাদের ক্যাম্পের কাছে। অথচ অ্যাপাচিরা, সাধারণত, রাতের বেলায় লড়াই করে না। ওদের ধারণা রাতে কোনও লোক নিহত হলে তার আত্মা চিরকাল আঁধারে মাথা কুটে মরে।

সহসা, আমার খুব কাছে একটা কিছু নড়ে উঠল।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে মিটমিটে নক্ষত্রগুলো একটুখানি আলোর আভাস দেয়। মাঝে-মধ্যে গাছের পাতায় তার প্রতিফলন পড়ে চিকচিক করে উঠছে।

ছমছমে পরিবেশ। আমাদের ক্যাম্পটা পাহাড়ের ভেতর দিকে অবস্থিত। চারপাশে নিবিড় বন, পাথরচাঁই। এমনকী দিনের বেলায়ও বড় একটা আলো পৌঁছায় না এখানে। এত অসংখ্য ছায়া পড়েছে যে কিছুই দেখা যায় না স্পষ্টভাবে।

ধীরে ধীরে রাইফেলের কুঁদো মাটিতে নামালাম আমি। একটা বউই নাইফ রয়েছে আমার বেল্টে। কিন্তু এখন আমাকে আমার এই দুখানি হাতের ওপরে ভরসা করতে হবে, কঠোর পরিশ্রমে শক্ত হয়ে গেছে, পেশী জমেছে কাঁধ আর বাহুতে। আরাম-আয়েসের সুযোগ খুব কমই পেয়েছি আমি, একরকম বলতে গেলে পুরোটাই অবিরাম পথ চলা আর খাটুনির যোগফল। নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, হাত দুটো তৈরি।

আবার প্রাণের আভাস পেলাম, তবে এত ক্ষীণ যে পরিষ্কার কিছু বোঝা গেল না। তারপর শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজে সতর্ক হয়ে উঠল আমার স্নায়ু। অন্ধের মত সামনে হাত বাড়ালাম।

ভূতের মত একটা কিছু পিছলে বেরিয়ে গেল আমার মুঠি থেকে। ছুঁলাম, ধরলাম, এবং তারপর যেন মিলিয়ে গেল... মনে হলো একটা চুল লেগে রয়েছে আমার আঙুলে... ব্যস, পরক্ষণেই আর নেই!

গ্রীন উঠে বসল। 'ওরিন? কী ব্যাপার?'

'বোধহয় ভূত,' চাপা স্বরে বললাম আমি। 'যাই হোক, আমাদের শত্রু মনে না করলেই হলো।'

উঁকি-ঝুঁকি মারলাম, দেখতে পেলাম না কিছু।

ঘণ্টা দুয়েক বাদে, যখন ভোরের আলো ফুটল, বহু ট্র্যাক চোখে পড়ল আমাদের। ছোট্ট পা, পাতায় ভর দিয়ে এসেছিল। গায়ে কাঁটা দিল আমার। ব্যাপারটা লক্ষ করল রোকা। 'কী?' বলল ও, 'ভয় করছে?'

'না, একজনের কথা মনে পড়ে গেছে,' জবাব দিলাম আমি। 'এই ট্র্যাকগুলো ওর নয়। যদিও অবিকল ওর মতই ছোট, দ্রুত লয়ে পা ফেলে... কিন্তু সে তো মারা গেছে।'

মাথায়-বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকল রোকা। 'তোমাকে তাড়া করে বেড়ায় বুঝি?'

'না... ও এখন আমার স্মৃতিতে রয়েছে। ওর নাম ছিল ড্রুসিলা। ঠিক এভাবে প্রথম ওর ট্রেইল আবিষ্কার করেছিলাম আমি। আবার হারিয়ে ফেলেছি, এভাবেই। ড্রুসিলা মারা গেছে। খুন হয়েছিল,' বললাম আমি, 'মগলোনের কাছে।'

'আচ্ছা!' বেনের গলা। 'তুমিই তা হলে সেই ওসমান।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ও। 'ঘটনাটা শুনেছি। আমি তখন চেরি ক্রীকে ছিলাম... সবাই জানে, তোমার পরিবারের লোকজন কীভাবে এগিয়ে এসেছিল।'

ওর মুখে জ্বলন্ত সিগারেট, চোখ আমার দিকে। বুঝলাম কী ভাবছে বেন। পশ্চিমে খবর ছড়ায় লোকের মুখে মুখে, ফলে খুব তাড়াতাড়ি কিংবদন্তীতে পরিণত হয় মানুষ, বাস্তবের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে। বেন টম্পসন, ওয়াইল্ড বিল,

মাইক ফিংক, বা ডেভি ক্রকেট সবার বেলায় এটাই ঘটেছে। মূল ঘটনার সাথে ডালপালা গজিয়েছে ক্রমশ।

'আমরা যার খোঁজে এসেছি,' বললাম আমি, 'সে আমার ভাতিজা। অ্যাঞ্জেলের ছেলে। মগলোনে সে-দিন যারা গিয়েছিল তাদের মধ্যে-অ্যাঞ্জেলও ছিল।'

'আমার আপন বলতে কেউ নেই দুনিয়াতে, কোনওকালেই ছিল না,' বলল বেন। 'আমি সব সময় একা।'

পাইপে ঠেসে তামাক ভরল জেমস গ্রীন। 'বেশির ভাগ লোকই একা,' বলল সে। 'আমরা পৃথিবীতে এসেছি একা, সমস্যা মোকাবেলা করি একা– আবার যখন মরব, তাও একা।'

'কাল যে-মেয়েটার ট্র্যাক দেখেছিলাম– তার ছাপ।' বলে আশপাশে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালাম আমি। 'ওর খাবার ফুরিয়ে গেছে।'

তারপর আবার চুপ করলাম আমরা।

নিজের কাজ আমরা ভালই বুঝি। অ্যাপাচিদের এত কাছাকাছি এসে আর সবুর সইছে না, কারণ আমরা কথার চেয়ে কাজে– অ্যাকশনে বিশ্বাসী। আমাদের জীবনধারাই এমন... বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন বড় একটা হয় না। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেই, এবং এর ওপর আমাদের বাঁচা-মরা নির্ভর করে। তাই ধৈর্য ধরা কঠিন হয়ে পড়েছে। পাহাড়ে অযথা ঘোরাঘুরি করলে বিপদ তাতে বাড়বে, আবার এখানে থাকাও ঝুঁকিজনক। তবু আমরা দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিলাম। যত নড়াচড়া করব পেছনে আমাদের ট্র্যাক তত বেশি থাকবে।

চুপিসারে অ্যাপাচি র‍্যাঞ্চেরিয়ার ওপর নজর রাখছি, যদিও জানি এতেও বিপদের আশঙ্কা আছে: বেশিক্ষণ কারও ওপর চোখ রাখা হলে সে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

যে-শ্বেতাঙ্গ ছেলেটাকে কাল দেখেছিলাম আজও বার কয়েক চোখে পড়ল তাকে। তবে ইন্ডিয়ান ছেলেপুলেরা সব সময় ওর কাছাকাছি ছিল। অবশেষে সন্ধ্যের মুখে আমাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হলো। ছেলেটাকে বর্শা হাতে ক্যাম্পের বাইরে যেতে দেখলাম আমি। বেড়ালের মত নিঃশব্দে সরে এলাম, রোকাকে পাশ কাটানোর সময় ইশারায় আসতে বললাম সাথে।

পাহারার দায়িত্ব নিতে বেন ওপরে গেল। জেমস রইল ঘোড়ার কাছে– রোজ সকালে আমরা ওগুলোর পিঠে জিন চড়িয়ে রাখি।

ট্রেইলে ট্যাম্পিকো রোকা ভূতের মত, নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারে। পাথরের আড়ালে আড়ালে এঁকেবেঁকে নীচে নেমে এলাম আমরা, ট্রেইলের পাশে ঝোপের ভেতর অপেক্ষা করতে লাগলাম ছেলেটার জন্যে।

ও কি বদলে গেছে? অ্যাপাচি বনে যায়নি তো? সে-ক্ষেত্রে আমাদের দেখলে চেঁচিয়ে উঠবে।

তবে সে-সুযোগ দেওয়া হলো না ওকে। নিঃশব্দে ওর পেছনে চলে গেল রোকা, এক হাতে মুখ চেপে ধরে টেনে আনল ঝোপের ভেতর।

ওর চোখে স্পষ্ট আতঙ্ক, তারপর যখন দেখল আমরা শ্বেতাঙ্গ, কথা বলার প্রয়াস পেল। ধীরে ধীরে ওর মুখ থেকে হাত সরাল রোকা।

'আমাকে নিয়ে চলো!' ফিসফিস করে বলল ছেলেটা। 'আমার নাম ব্রুক-হ্যারি ব্রুক।'

'কদ্দিন হলো ওদের সাথে?'

'বছর দুয়েক।'

'আরও কজনকে ধরে এনেছে ওরা। দুজনের নাম ক্রীড, অন্যজন অ্যান্ডি ওসমান। ওরা কোথায়?'

'ক্রীড? ওদের কথা শুনেছি। এর পরের র‍্যাঞ্চেরিয়াতে আছে।' আঙুল তুলে ইশারা করল ও। 'ওখানে।'

'আর অ্যান্ডি ওসমান?'

'জানি না। আর কোনও ছেলের কথা শুনিনি। ক্রীডদের সঙ্গে একটি মেয়ে আছে... খুব ছোট, মাত্র পাঁচ বছরের।'

শরীর হিম হয়ে এল আমার, মনে হলো কে যেন সমস্ত শক্তি শুষে নিয়েছে। ওরা কি তবে অ্যাঞ্জেলের ছেলেকে খুন করেছে? রোকা জিজ্ঞেস করল প্রশ্নটা।

'না, কাউকে মারেনি,' বলল হ্যারি। 'ওদেরকে যখন আনা হয় আমি তখন ওখানে ছিলাম।'

হাঁটু গেড়ে বসলাম আমি। জিজ্ঞেস করলাম, 'আবার যেতে পারবে ওদের কাছে? মানে, দেখা হবে তোমার সাথে?'

'তোমরা নিয়ে যাবে না আমাকে?' হ্যারির চোখে অশ্রু।

'এখন না। শোনো, এখন নিলে আমাদেরকে পালাতে হবে, তাই না? আপাতত এখানেই থাকো তুমি– তবে তৈরি থেকো।' আমি হাত তুলে একটা উঁচু টিলা দেখালাম ওকে। 'ক্যাম্প থেকে দেখা যায় ওটা?'

ঘাড় কাত করে সায় দিল ও।

'বেশ, যখন টিলার মাথায় একটা কালো পাথর দেখতে পাবে, চলে আসবে এখানে। আমরা অন্যদের আনতে যাচ্ছি।'

'মারা পড়বে। ওরা কাহ্তেনির র‍্যাঞ্চেরিয়াতে আছে।'

'কাহ্তেনি? ও তা হলে বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ। অ্যাপাচিরা ওকে ভীষণ মানে।'

হ্যারিকে রেখে সরে এলাম আমরা। অ্যাপাচিরা যে-কোনও মুহূর্তে চলে আসতে পারে ওর খোঁজে। বন্দীকে বিশ্বাস করে না ওরা– ওদের রীতি-নীতি মেনে নিলেও না। তবে আশার কথা সিয়েরা মাদ্রেস থেকে কেউ পালাতে পারে... বা ওদের পিছু নিয়ে এখানে আসার সাহস পাবে, এটা চিন্তা করবে না ওরা।

প্রথমেই খুঁজে-পেতে কালো লাভার টুকরো জোগাড় করলাম আমি। একটা ঝোপের নীচে লুকিয়ে রাখলাম, তারপর ফিরে এসে রওনা হলাম স্যাডলে চেপে। বেন, জেমস, রোকা ওরাও আসছে পেছন পেছন।

হ্যারি কি নিজের মনোভাব গোপন রাখতে পারবে? প্রশ্নটা খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল আমার মনে।

অন্যদের কাছে ওকে যেতে দেওয়া হবে এমন সম্ভাবনা কম। তবে অনেকদিন হলো ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে আছে... হয়তো পেয়েও যেতে পারে একটা সুযোগ।

কিন্তু অ্যান্ডি ওসমান– আমার ভাতিজা কোথায়?

সাত

গোধূলি। পুব দিগন্তে সূর্যের রেখা সবে দেখা দিয়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। গাছপালার পাশ দিয়ে পাহাড়ে উঠছি আমরা। আনত মেঘের আর্দ্রতায় লতাপাতা, মাটি ভেজা। একটুবাদে পাইন বনের ভেতর ঢুকলাম। শেষ-প্রান্তে একটা ঝরনা, চুনাপাথরের কারনিস পেরিয়ে গভীর সরোবরে পড়ছে স্বচ্ছ শীতল পানি।

আশপাশে বেশ কিছু প্রাচীন বাড়িঘরের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কোনও কোনও দেয়াল অংশত মাটির তলে বা ঝোপঝাড়ের নীচে চাপা পড়েছে। গিঁট-ধরা বাঁকানো সিডার জন্মেছে এক দেয়ালে। কমপক্ষে হাজার বছর বয়েস হবে ওই গাছের।

আমি রোকাকে জিজ্ঞেস করতে ও কাঁধ ঝাঁকাল। 'কী জানি? ওরাই এ-দেশের আদি অধিবাসী– ইন্ডিয়ানদের আগে এসেছিল। এবং অ্যাপাচিরা আসার বহু আগেই চলে গেছে।'

ওর কণ্ঠে উত্তেজনার রেশ। 'অনেক সভ্যতা জন্ম নিয়েছে এখানে– আবার হারিয়ে গেছে। এটাই পৃথিবীর রীতি। অ্যারিযোনা আর কলর্যাডোর পাহাড়ে পাথরের বাড়ি-ঘর তৈরি করেছিল একদল। নাভাহোরা এসে তাড়িয়ে দিয়েছে ওদের– খুন করেছে অনেককে।

'শ্বেতাঙ্গরা উৎখাত করেছে ইন্ডিয়ানদের, কিন্তু তার আগে ইন্ডিয়ানরা তাড়িয়ে দিয়েছে অন্যদের, এবং তারও আগে ওরা উৎখাত করেছে আর একদলকে। এই হয় সব সময়। আমার ধারণা ইন্ডিয়ানদের সর্বনাশ করেছে ব্যবসায়ীরা, আর্মি নয়।'

'কী রকম?' জানতে চাইল গ্রীন।

'ব্যবসায়ীরা ওদের এমন সব জিনিস ধরিয়ে দিয়েছে যা ওরা কোনওদিন বানাতে পারবে না। স্বভাবতই শ্বেতাঙ্গদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে ইন্ডিয়ানরা। রাইফেল, শৌখিন জিনিসপত্রের জন্যে ওদেরকে এখন শ্বেতাঙ্গদের কাছে হাত পাততে হয়। সুযোগ পেলে লুটপাটও করে।'

আমি নিজেও এই মত পোষণ করি।

আবার শ্রাগ করল রোকা। 'প্রথম যে-শ্বেতাঙ্গ বণিক ইন্ডিয়ানদের কাছে এসেছিল, আমার বিশ্বাস, তার ঝুলিতে ওদের সর্বনাশ বয়ে এনেছিল সে।'

এরপর বেশ কিছুক্ষণ আর কোনও কথা নেই। একটা বিপদসঙ্কুল ঢালের কিনারে এসে সাবধানে আগে বাড়ালাম ঘোড়াগুলোকে, প্রায় পুরো পথটাই পিছলে একটা ভয়াল ক্যানিয়নের তলদেশে নেমে এলাম আমরা। দুরন্ত ব্যাভিসপের পানি ছুটে চলেছে ক্যানিয়নের মাঝ দিয়ে। ভৌতিক, গা-শিউরানো পরিবেশ। স্ট্যালিয়নের পিঠ থেকে নেমে মুহূর্তের জন্যে স্যাডল ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। সগর্জনে ঘূর্ণিবেগে গড়িয়ে পড়ছে পানি, হাওয়ায় দোল খাচ্ছে পাইনের ঝাড়। এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

'ভাল্লাগছে না,' বলল জেমস গ্রীন। 'একদম নরকের কানাগলি।'

অ্যাপাচিদের হাতে আটকে-পড়া বাচ্চাগুলোর কথাই ভাবছি আমি। নিশ্চয়ই ভয়ে সিঁটিয়ে আছে ওরা, আধমরা হয়ে গেছে। তবু এখান থেকে সরতে মন উঠছে না আমার– সিয়েরা মাদ্রের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে।

আমরা ওদের মূল ঘাঁটির খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। হর-হামেশা চোখে পড়ছে অ্যাপাচিদের ট্র্যাক। এইরকম ছমছমে জায়গায় মানুষ মাত্রেরই মনে হবে আড়াল থেকে কেউ তাকে লক্ষ করছে।

একজন-একজন করে পানি খেলাম আমরা, সে-সময় অন্যরা স্যাডলে বসে পাহারায় রইল। তারপর নদী পেরিয়ে শুয়োরের পিঠের মত বাঁকা একটা ট্রেইল ধরে প্রায় একহাজার ফুট ওপরে উঠলাম। ট্রেইলটা সোজা বিশাল এক প্রম্যান্ট্রি বা শৈলান্তরীপের দিকে চলে গেছে।

ঝোড়ো মেঘ জমা হয়েছে আশপাশের চূড়োয়। ক্ষণে ক্ষণে বিজলি চমকাচ্ছে। কাহ্‌তেনির র‍্যাঞ্চেরিয়াটা এর নীচেই কোথাও রয়েছে, ঢাকা পড়েছে আনত মেঘের তলে। নীচের দিকে রওনা হলাম আমরা, কিন্তু অল্পটাক যেতেই ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। সঙ্গে দামাল হাওয়া।

কাছেপিঠে আড়াল বিশেষ নেই, অথচ এখানে অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। অদূরে একটা বিশাল উপড়ে-পড়া পাইন গাছ চোখে পড়তে এগিয়ে গেলাম সে-দিকে। পুরোপুরি ধরাশায়ী হয়নি গাছটা, কাত হয়ে পাহাড়ের গায়ে আটকে রয়েছে। নীচের দিকের ডালপালা কেটে ঘোড়াসহ আশ্রয় নিলাম সেখানে। নিতান্ত অপরিসর জায়গা, ঠাসাঠাসি করে বসলাম, আমার স্যাডলের পমেল গাছের গায়ে ঘষা খেলো।

ছোট করে আগুন ধরিয়ে সুপ আর কফি তৈরি করা হলো। বৃষ্টি আছে বলে এই ঝুঁকি নিতে সাহস করেছি। আমাদের আশা, প্রবল বর্ষণে ধোঁয়া চাপা পড়ে যাবে, নিজেদের কুটির ছেড়ে নড়বে না অ্যাপাচিরা।

খানিকবাদে বৃষ্টির ভেতর রাইফেলহাতে স্কাউটিংয়ে বেরোলাম আমি। গাছপালার গা ঘেঁষে চুড়োর কাছাকাছি উঠে গেলাম। চকচক করছে ভেজা পাহাড়, বৃষ্টির ছাঁট সুচ ফোটাচ্ছে আমার স্লিকারে।

হঠাৎ অদূরে কাহ্‌তেনির র‍্যাঞ্চেরিয়া দেখতে পেলাম স্পষ্ট। গুটিকতক

ছনের কুটির থেকে ধোঁয়া উঠছে। বাইরে সুমসাম– ফাঁকা।

পেছনে নড়াচড়ার আভাস পেলাম আমি, ঘুরলাম পাঁই করে। ট্যাম্পিকো রোকা।

র‍্যাঞ্চেরিয়াটা দেখাল ও। 'ওদেরকে এখন বুদ্ধু বানাতে পারব না আমি,' বলল রোকা। 'আমার গায়ের গন্ধে টের পেয়ে যাবে। শ্বেতাঙ্গদের খাবার খাচ্ছি আমি।'

'কজন আছে বলে মনে হয়?' প্রশ্ন করলাম আমি। 'বিশজন?'

'বেশি হলে পঁচিশ।'

দুই ডজন মানুষরূপী নেকড়ে। ওদের সাথে এমনিতে আমার কোনও বিরোধ নেই। এখন আমার শত্রু, ঠিক... কিন্তু ওদের শ্রদ্ধা করি আমি। লড়াই কিংবা কারও পিছু লাগার ব্যাপারে ওরা নেকড়ের মতই ভয়ঙ্কর এবং অদম্য। এক অর্থে আমরা অনুপ্রবেশকারী: ওদের দুর্ভেদ্য দুর্গ সিয়েরা মাদ্রেসে গোপনে ঢুকে পড়েছি।

'নীচে যাচ্ছি,' বললাম আমি, 'আড়ি পাতব।'

ফ্যালফ্যাল করে তাকাল রোকা। 'পাগল হয়েছ? তোমার উপস্থিতি বুঝে ফেলবে ওরা, কুকুরগুলো গন্ধ পাবে।'

'বৃষ্টিতে নাও পেতে পারে।'

'আচ্ছা,' বলল রোকা, 'চলো, আমরা দুজনেই যাই।'

বিরাট ঝুঁকি নিচ্ছে রোকা। তবে ওর শরীরে অ্যাপাচি রক্ত বইছে, সাবধানতা ওর সহজাত গুণ। চাই কী, রোকা থাকায় অ্যাপাচিদের ওপর টেক্কা মারার সুযোগও পেয়ে যেতে পারি।

হামাগুড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলাম আমরা। মাঝে মাঝে থেমে কান খাড়া করছি, ফের এগোচ্ছি। আমরা নির্বোধ, নিজেকে তিরস্কার করলাম আমি। কাজটা পাগলামি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কী করব? আমি নিরুপায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ্যান্ডিকে খুঁজে বের করতে হবে। এই এলাকায় প্রতিটা মুহূর্ত আমাদের... এবং ওর জন্যে বিপজ্জনক– জীবন-মরণের বাজি।

তুমুল বৃষ্টিতে চুপিসারে আমরা দুজন অ্যাপাচি আস্তানার প্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হলাম। একটা কুটিরের দেয়ালে কান পাতল রোকা, আরেকটায় আমি। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও, ইন্ডিয়ানদের অস্পষ্ট খোশগল্প আর লাকড়ি পোড়ার পট্‌পট্ আওয়াজ ছাড়া কিছু শুনতে পেলাম না। আরেকটা কুটিরের দিকে এগোচ্ছিলাম আমি, রোকা মাথা নেড়ে বারণ করল, থমকে দাঁড়ালাম। ছটফট করছি, ওর পানে চেয়ে আছি একদৃষ্টে, শক্ত মুঠিতে ধরে আছি আমার রাইফেল, ব্যারেল স্লিকারের নীচে ঢোকানো। ঈষৎ ঘাড় কাত করে ইশারা করল রোকা, এগোল। একে একে পাঁচটা কুটিরে আড়ি পেতেছি আমরা। হাল ছেড়ে দিতে বসেছিলাম... এমনও তো হতে পারে বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে? বা আদৌ নেই এখানে?

হঠাৎ হাতছানি দিল রোকা। ওর কাছে গেলাম আমি। মৃদু গুঞ্জন চলছে

ভেতরে– পরিষ্কার ইংরেজিতে কথা বলছে একটা বাচ্চা ছেলে।

রোকার হাত খামচে ধরলাম আমি। 'কাভার দাও,' বলে পর্দা উঠিয়ে পা রাখলাম ভেতরে।

হুঁশিয়ার ছিলাম আমি, চোখ বন্ধ করে ঢুকেছিলাম তবু অন্ধ হয়ে গেলাম মুহূর্তের জন্যে। তারপর গনগনে কয়লার আলোয় দেখলাম একজন ইন্ডিয়ান যুবক হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার পানে, ওঠার প্রয়াস পাচ্ছে। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে স্তূপাকারে পশুছাল রাখা, ওগুলোর ওপর বসে আছে তিনটে শ্বেতাঙ্গ বাচ্চা।

ওদের পাশে একজন ইন্ডিয়ান মহিলা বসে, কোলের শিশুকে মাই খাওয়াচ্ছে। অপলক চোখে আমাকে দেখছে ও, দৃষ্টিতে রাগ বা ঘৃণা কিছু নেই, বরং একধরনের সম্মতি ফুটে উঠেছে। 'চেঁচাবে না,' বললাম আমি। তারপর পাছে আমার দুর্বল অ্যাপাচি জবান বুঝতে অসুবিধে হয়, তাই স্প্যানিশে পুনরাবৃত্তি করলাম।

বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়েছে ইন্ডিয়ান যুবক, তেড়ে এল। রাইফেলের কুঁদো দিয়ে ওর চোয়ালে আঘাত করলাম আমি। ধপ্ করে মেঝেতে নিতম্ব দিয়ে পড়ে গেল ও, জ্ঞান হারিয়েছে।

'চলে এসো তোমরা,' বাচ্চাদের বললাম আমি। 'আমরা এখন বাড়ি ফিরব। ওই চামড়াগুলো দিয়ে তোমাদের গা ঢেকে নাও ভাল করে।'

নিজের জায়গা ছেড়ে একচুল নড়েনি ইন্ডিয়ান যুবতী। 'আমি কাউকে আঘাত করব না। শুধু এদেরকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাব।'

যুবতী নীরব। বাচ্চা তিনটে ছুটে চলে এল আমার কাছে। লক্ষ করলাম ওদের একজন মেয়ে। আমার নির্দেশে একদৌড়ে বাইরে চলে গেল ওরা। তারপর ইন্ডিয়ান রমণীকে আর একনজর জরিপ করে আমিও বেরিয়ে এলাম।

ট্যাম্পিকো রোকা ইতিমধ্যে পিছিয়ে গেছে ওদের নিয়ে, ওর রাইফেল র‍্যাঞ্চেরিয়ার দিকে তাক করা। আমি দৌড় দিলাম ওর দিকে, প্রায় পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি, এমন সময়ে রক্তাক্ত দেহে সেই ইন্ডিয়ানটা কুটির থেকে বেরিয়ে এল।

খোঁড়াচ্ছে লোকটা, টলছে, পাগলের মত তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। প্রথম দফায় কোনও আওয়াজ বেরোল না ওর গলা দিয়ে, তারপর চেঁচিয়ে উঠল। একই সাথে রাইফেল তাক করল ও, এবং রোকা গুলি করল।

বাচ্চাগুলো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে খাড়া ঢাল বেয়ে ওপরে উঠছে। অবাক হলাম আমি, এত অবলীলায় পারবে ভাবতে পারিনি।

আমি অনুসরণ করলাম ওদের। দুড়দাড় করে বৃষ্টির ভেতর ছুটে এল অ্যাপাচিরা। বেশ কিছুদূর এগিয়ে আসার সুযোগ দিলাম ওদের, তারপর দ্রুত লেভার টেনে গুলি করলাম।

লাটিমের মত ঘুরে গেল একজন ইন্ডিয়ান, হাতের রাইফেল খসে পড়ল: বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল আরেকজন, তেড়ে এল। ওকে আসতে দিলাম আমি,

অন্য একজন রাইফেল তুলছিল, তাকে গুলি করলাম। টলে উঠল অ্যাপাচি. পড়ে গেল এবং আবার ওঠার প্রয়াস পেল।

এদিকে সেই ইন্ডিয়ানটা প্রায় আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে. হাতে ছোরা। চট করে রাইফেলের ব্যারেল চেপে ধরলাম আমি, কুঁদো হাঁকালাম ওর পেট বরাবর। বাঁকা হয়ে গেল লোকটা, অঁক করে একটা অব্যক্ত গোঙানি বেরিয়ে এল গলা চিরে. ডালপালা ধরে কর্দমাক্ত পিচ্ছিল খাড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করলাম আমি।

পাহাড়ের মাথায় আচমকা একজোড়া রাইফেলের বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল। গুলির শব্দে আমাদের বন্ধুরা এসে পড়েছে, কাভার দিচ্ছে আমাদের।

অবশেষে খাঁজের মাথায় পৌঁছুলাম আমরা। বাচ্চা মেয়েটা আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল পা হড়কে, আমি হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললাম।

আমরা ক্যাম্পে ফিরে এলাম, আমার বন্ধুরা প্রত্যেকেই একজন করে বাচ্চা তুলে নিল স্যাডলে, তারপর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললাম পাহাড় ধরে। বৃষ্টির ছাঁট তীব্র হুল ফোটাচ্ছে আমাদের মুখে।

সুযোগ পেয়ে তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়েছিলাম আমরা, নীচে নামার সময়ে মন্থর করলাম গতি, ট্রেইল এখানে অসম্ভব খাড়া। বৃষ্টিতে নীচের গভীরতা বোঝা যাচ্ছে না কিছু; সুউচ্চ চুড়োগুলো মেঘে ঢাকা। ঘন ঘন বিজলি চমকাচ্ছে, বজ্রপাতের প্রচণ্ড আওয়াজে মনে হচ্ছে আমরা যেন একটা বিরাট ড্রামের ভেতর রয়েছি। ঝড়ের বেগে পাইন বনে ঢুকলাম আমরা, প্রায় শখানেক গজ ঘোড়া ছোটালাম, তারপর সামনে খাড়া কর্দমাক্ত পথ রয়েছে দেখে আবার কমিয়ে আনলাম গতিবেগ।

কাদায় আছাড় খেলো গ্রীনের ঘোড়া. স্যাডল থেকে ছিটকে পড়ল ও। কিন্তু ঘোড়াটা তেজী, উঠে দাঁড়াল। ওদিকে গ্রীনও ফের স্যাডলে চেপেছে।

টিলার মাথায় কালো পাথর বসানোর সময় পাব না আমি। এই বাদলায় হ্যারিও দেখতে পাবে না ওটা।

আমি বারবার পেছন ফিরে দেখছি ইন্ডিয়ানরা কতদূরে আছে। প্রবল বৃষ্টিতে গোলাগুলির আওয়াজ ঢাকা পড়ে যাওয়ার কথা, সে-ক্ষেত্রে বাকি র‍্যাঞ্চেরিয়াগুলো আমাদের উপস্থিতি টের পাবে না। অল্পক্ষণের জন্যে জঙ্গলের ভেতর থামলাম আমরা। হাত বাড়িয়ে রোকার কাছ থেকে বাচ্চা মেয়েটাকে নিলাম আমি, সামনে স্যাডলের ওপর বসালাম ভাল করে।

'আর কেউ ছিল?' আমি প্রশ্ন করলাম। 'শ্বেতাঙ্গ বাচ্চা?'

'না,' বলল মেয়েটা। জ্বলজ্বল করছে ওর চোখ, খুশিতে।

'অ্যান্ডি ওসমান কার নাম?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

পলক তুলল ও। 'ও নামে কেউ নেই– আমি শুনিনি। ওই দুজন ক্রীডদের ছেলে।'

ধড়াস করে উঠল বুক। 'ট্যাম্প,' বললাম আমি, 'আমার ভাতিজা এখানে নেই।'

'জানি,' বলল ও। 'কখনোই ছিল না। কেবল এই বাচ্চাদেরকেই ধরে এনেছিল অ্যাপাচিরা।'

'তা কী করে হয়।'

'চলো চলো,' তাড়া লাগাল বেন, 'তর্ক করার সময় না এটা।'

রওনা হলাম আমরা। জানি আর ফেরা চলবে না। অ্যাপাচিরা এখন চারদিক তোলপাড় করবে, আমরা যদি প্রাণ নিয়ে পালাতে পারি তবে সেটা হবে আমাদের কপাল।

অবিরাম ছুটে চললাম... পথে কত অজস্রবার চোট পেলাম, ছড়ে গেল হাত-পা, অথচ সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই আমাদের কারও। পুরো ব্যাপারটাই মনে হচ্ছে দুঃস্বপ্নের মত।

অবশেষে, একসময়, দ্বিতীয় র‍্যাঞ্চেরিয়াট্যর কাছে উপস্থিত হলাম। মেয়েটাকে গ্রীনের কাছে চালান করলাম আমি।

'হ্যারিকে আনতে যাচ্ছি,' বললাম।

'পাগলামি কোরো না! পারবে না।'

'তোমরা এগোও,' আমি বললাম, 'আমি কথা দিয়েছি ওকে।'

ওরা তাকাল আমার দিকে, প্রত্যেকের কাছে একজন করে বাচ্চা– তিনজন কঠিন শক্ত পোড়-খাওয়া মানুষ। পৃথিবীতে ওদের আপন বলতে কেউ নেই। সম্বলের মধ্যে আছে শুধু গোটা দুয়েক আগ্নেয়াস্ত্র, আর জরাজীর্ণ স্যাডল। বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজছে সবাই, সঙ্গে বাচ্চা থাকায় আসতে পারছে না আমার সাথে।

'যাও,' বললাম আমি।

'যাত্রা শুভ হোক,' বলল বেন, এবং তারপর বিদায় নিল ওরা।

ক্ষণিকের জন্যে ওদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি, তারপর ঘোড়াকে সেই পাথরচাঁইটার উদ্দেশে পরিচালিত করলাম। মনে হলো পেছনে, বহুদূরের একটা চিৎকার শুনতে পেলাম, গুলি হলো। কিন্তু হ্যারির সাথে যেখানে আমার মিলিত হওয়ার কথা উতরাই ধরে সে-দিকে এগিয়ে গেলাম আমি।

চাঁইটাকে পাশ কাটিয়ে র‍্যাঞ্চেরিয়ার দিকে তাকালাম, হাতে উইনচেস্টার প্রস্তুত। হঠাৎ একটা ভেজা ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল হ্যারি ব্রুক। ভেজা চুপচুপে শরীর, জামাকাপড় সেঁটে গেছে গায়ের সাথে, চোখে আতঙ্ক। 'মিস্টার,' এগিয়ে এসে কান্নাজড়িত গলায় বলল ও, 'মিস্টার, আমার ভয় হচ্ছিল তুমি বোধহয় আর আসতে পারলে না।'

'ওরা জানে তুমি পালিয়েছ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'মনে হয়... এতক্ষণে জেনে গেছে। একজন এসে বলল গোলাগুলির আওয়াজ পেয়েছে সে। কিন্তু বুড়ো ইন্ডিয়ানরা বিশ্বাস করেনি। ওদের ধারণা এই দুর্যোগে কেউ আসতেই পারে না এখানে। আমি অনুমান করেছিলাম তুমিই হবে– তাই প্রথম সুযোগেই পালিয়ে এসেছি।'

আমরা রওনা হলাম ওপর পানে। খাঁজের মাথায় অন্যদের কর্দমাক্ত ট্র্যাক চোখে পড়ল। ঘোড়া ঘুরিয়ে পিছু নিলাম কিন্তু খানিকটা গিয়েই রাশ টানলাম

আচমকা। ওদের ট্রেইল মাড়িয়ে বেশ কয়েকটা ঘোড়া চলে গেছে ওইদিকে—নালবিহীন ঘোড়া।

'অ্যাপাচি,' বললাম আমি। 'আর কোনও ট্রেইল আছে?'

'ওখানে,' তর্জনী উঁচিয়ে ক্যানিয়নের দিকে নির্দেশ করল হ্যারি। 'প্রাচীন ট্রেইল। এক অ্যাপাচি ছেলে আমাকে দেখিয়েছে ওটা। সনোরার ভেতর দিয়ে সমুদ্র অবধি গেছে।' আমার দিকে চোখ তুলল হ্যারি, বৃষ্টির পানিতে ওর মুখ চকচক করছে। 'ঠিক জানি না, তবে ও তাই বলেছিল।'

ছটফট করছিল স্ট্যালিয়ন, এখানকার হালচাল একটুও পছন্দ করছে না. হ্যারির কথামত আমি ওর মুখ ক্যানিয়নের দিকে ঘোরালাম। প্রথমে মৃদু আপত্তি জানাল ও, তারপর দুলকি চালে এগিয়ে গেল।

ঝড়-জলের কথা বাদ, ভাল আবহাওয়াতেও এ-দিকে আসা বিপজ্জনক। বাজ পড়ল, বিজলির আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক। হ্যারি যাকে ট্রেইল বলেছিল সেটা আসলে পাহাড়ের গা-ঘেঁষা সুতোর মত চিকন একটা পথ; কাদায় পিচ্ছিল হয়ে গেছে।

তবে আমার ঘোড়াটা সাহসী, সংগ্রামী। এমনভাবে এগোচ্ছে যেন মাটি নয় পা ফেলছে ডিমের খোসার ওপর। দম বন্ধ করে বসে আছি আমি। আমার ডান দিকে, দূর-নীচে পাইন বনের মাথা দেখতে পাচ্ছি, কম করে হলেও পাঁচশো ফুট নীচে। সাবধানে পায়ে পায়ে করে এগোচ্ছি আমরা। যখন তলদেশে পৌঁছুলাম, ট্রেইলটা চওড়া হয়ে গেল।

দেখেই বোঝা যায় বহুকাল এ-পথ মাড়ায় না কেউ। অসংখ্য পাথর পড়ে আছে, আগাছা জন্মেছে পথের মাঝখানে। ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোলাম আমরা। অনবরত পেছনে তাকাচ্ছি আমি। নিঃসন্দেহে আমরা ফাঁদে পড়তে যাচ্ছি, তবু এই মুহূর্তে সামনে এগোনো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

রাত নামছে, এই মেঘ-বৃষ্টিতে অচিরেই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাবে সবকিছু। অথচ মাথা গোঁজার মত ঠাঁই চোখে পড়ছে না।

প্রায় হাজার ফুট নীচে নেমে এসেছি আমরা। ঝরনার পাশ দিয়ে যাচ্ছি। পপলার, ম্যাপ্‌ল্, বিশালকায় অগাভি আর কচি ফার্ন ঝোপের ভেতর দিয়ে বইছে ঝরনাটা।

সহসা, আমাদের বাঁয়ে, একটা ভাঙা দেয়াল চোখে পড়ল আমার। প্রাচীন দেয়াল, একটা বিরাট ম্যাপ্‌ল্ গাছের চাপে ভেঙে পড়েছে অর্ধেকটা। কাছেই একটা নালা, বড়জোর কয়েক ইঞ্চি গভীর। ঘোড়া ঘুরিয়ে মন্থর গতিতে ওইদিকে রওনা হলাম আমি, ভাঙা দেয়ালের পাশ দিয়ে পেছনে, ম্যাপ্‌ল্ গাছের গোড়ায় এসে থামলাম।

ছোট্ট উঠোনের মত জায়গা। একদিকে দেয়ালের আড়াল, আরেক প্রান্ত শেষ হয়েছে অপেক্ষাকৃত বড় একটা নালার কাছে গিয়ে। চারদিকে গাছ। ম্যাপ্‌লের শাখাগুলো খুব মোটা, দেয়ালের ওপর পড়ে চমৎকার ছাত সৃষ্টি করেছে। গাছের নীচে দোল খেয়ে স্ট্যালিয়নের পিঠ থেকে নামলাম আমি।

তারপর হ্যারিকে নামালাম। 'এখানেই থাকো– নড়বে না, বললাম ওকে। 'আমি দেখি পেছনটা ঢাকার মত কিছু পাই কিনা।'

এ-রকম অবস্থায় কীভাবে কী করতে হয় আমার দীর্ঘ যাযাবর জীবনে আমি তা ভালই শিখেছি। বহুবার ভেজা জায়গায় ক্যাম্প করতে হয়েছে। তাই কাজে লাগতে পারে এমন জিনিসের খোঁজে চোখ খোলা রাখি সর্বদা।

প্রথমেই লক্ষ করলাম জমিটা কীভাবে বড় নালার দিকে ঢালু হয়ে গেছে ক্রমশ। দেয়াল থাকায় একদিক মোটামুটি সুরক্ষিত। ম্যাপ্ল্ গাছটা জীবিত, তবে কোনও এক ঝড়ে ডালপালাসহ্ একটা বড় শাখা ভেঙে পড়েছে মাটিতে। জ্বালানি হিসেবে ম্যাপ্ল্ কাঠের তুলনা হয় না, জোর আগুন হয়।

বড় গাছটা চলনসই আড়াল দেবে, দেয়াল আমার আগুনের প্রতিফলক হিসেবে কাজ করবে। দেয়ালের এককোণে ডাল বিস্তার করেছে একটা শাখা, ওটার নীচে উবু হয়ে মাটি থেকে দুটো পাথর কুড়িয়ে আনলাম আমি। ভাঙা শাখা আর তার ডালপালা অংশত আড়াল তুলেছে ওই কোণে। আমি লতাপাতাসহ কয়েকটা পাইনের ডাল কেটে আনলাম, গুঁজে দিলাম ম্যাপ্লের ফাঁকে ফাঁকে। এতে করে জায়গাটা আরেকটু সুরক্ষিত হলো।

বড় গাছটার নীচে ঘোড়া বেঁধে স্যাডল আর গিয়ার ক্যাম্পে এনে রাখলাম আমি। যথেষ্ট লম্বা রেখেছি স্ট্যালিয়নের দড়ি, ঘেসো জমিতে চরতে পারবে। হ্যারি ইতিমধ্যেই বসে পড়েছে কোণে।

দুটো উপড়ে-পড়া গাছের তলা থেকে খানিকটা বাকল খসিয়ে আনলাম আমি, ভাঙা ম্যাপ্ল্ শাখা থেকে ছোট ছোট ডাল ভেঙে নিলাম কয়েকটা, তারপর চকমকি পাথর ঠুকে আগুন ধরালাম।

দেয়ালের পাশে আগুন ধরিয়েছি। এর ফলে তাপ বিকীর্ণ হয়ে জায়গাটা গরম হবে। আগুন পোয়াতে ওখানে গুটিসুটি মেরে বসলাম আমরা। দেয়াল আর ম্যাপ্ল্ গাছ বৃষ্টির ঝাপটা আটকে রাখছে। মিনিট কয়েক পর, হ্যারি ঘুমিয়ে পড়ল।

আরেকবার অস্ত্রশস্ত্র পরখ করলাম আমি, নিশ্চিত হলাম রাইফেলে সবগুলো টোটা পোরা আছে কি না, তারপর ঘোড়াটা হুঁশিয়ারি জানাবে এই ভরসায় আগুনের উল্টো দিকে দেয়ালে হেলান দিলাম এবং অল্পক্ষণের ভেতর হারিয়ে গেলাম ঘুমের অতলে।

আট

গিরিপথে কেঁদে ফেরে রাতের বাতাস। পট্‌পট্‌ শব্দ হচ্ছে ছোট্ট অগ্নিকুণ্ড থেকে। পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে কাঠগুলো, জ্বলছে মিটমিট করে, কেবল মাঝে মাঝে যখন হাওয়া পাচ্ছে গন্‌গন্‌ করে উঠছে। বৃষ্টি থেমে গেছে, তবে প্রতিনিয়ত বড়

বড় ফোঁটা ঝরে পড়ছে ম্যাপ্‌ল্‌ পাতা থেকে।

সময়ে সময়ে চোখ খুলছি আমি, তাকাচ্ছি এদিক-ওদিক, এবং আবার ঘুমিয়ে পড়ছি। এ আমার মজ্জাগত অভ্যাস... এক নাগাড়ে ঘুমিয়েছি এ-রকম একটা রাতের কথা চেষ্টা করলেও মনে পড়বে কিনা সন্দেহ।

বৃষ্টি ছেড়ে যাওয়ায় স্ট্যালিয়ন এখন ঘেসো জমিতে চরছে। খাঁজের ওপর দিকে ঘাস খুব কম; বিক্ষিপ্ত, মরাটে। কিন্তু এখানে, ছড়ানো-ছিটানো পাথরের আশপাশে যেগুলো গজিয়েছে সেগুলো বেশ সতেজ, সবুজ।

সহসা কান খাড়া করলাম আমি। মনে হলো ট্রেইলে এগিয়ে আসছে অনেকগুলো ঘোড়া। অস্পষ্ট ফিসফিস জাতীয় শব্দের মত শুনতে পেয়েছি... মুহূর্তে সচল হলো আমার স্নায়ু। জানি এখন পঞ্চেন্দ্রিয়ের ওপর ভরসা করে বিশেষ লাভ হবে না: আঁধারে ওরা আসে ভূতের মত, পা টিপেটিপে, ওদের শিকার সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে।

সন্দেহ নেই বোকা হয়ে গেছে ওরা। এবং ভয়ও পাচ্ছে, কারণ আমি প্রাচীন অধিবাসীদের ট্রেইল ধরেছি। এ-পথে কেউ আসে না।

এটাকে ভূতের ট্রেইল বলে মনে করে ওরা। সে-জন্যেই এর ছায়া মাড়ায় না– বিশেষ করে রাতে। ওদের ঘোড়াগুলো পাহাড়ি, নিশ্চয়ই চেনে এই উপত্যকাটা, বুনো জীবনে ঘাস-পানি খেতে আসক্ত।

এই অশ্বারোহীরা, বোধ হয়, তাদের র‍্যাঞ্চেরিয়া থেকে পরে বেরিয়েছে, আমার বন্ধুদের যারা তাড়া করছে নিশ্চয়ই তাদের ট্রেইল চোখে পড়েছে ওদের। এইসময় আমার একক ট্র্যাকও দেখতে পেয়েছে, এবং খুন করার সঙ্কল্পে পিছু নিয়েছে।

ধোঁয়া বিশেষ হয়নি আমার আগুনে, অন্তত কারও চোখে পড়ার মত নয়। এর ঈষৎ লাল আভাও গাছ আর দেয়ালের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। তবু আমাকে খুঁজে পেয়েছে ওরা। সম্ভবত আমার ঘোড়ার ঘাস চিবোনোর আওয়াজ শুনতে পেয়েছে।

নীরব ক্যাম্প। এক ফোঁটা পানি আগুনে পড়ে ছ্যাঁৎ করে উঠল। ঘাস খাওয়া থামিয়ে মাথা তুলল স্ট্যালিয়ন, ঘোঁৎ শব্দে নাক ঝাড়ল।

এক মুহূর্ত ওখানে শুয়ে রইলাম আমি, কান খাড়া, তারপর কম্বলের নীচ থেকে বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপ দিলাম অন্ধকারে। ঠিক ওইসময়ে একটা তীর আমার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল শিস্‌ কেটে। পেছনে ফিরে দেখলাম তীরটা কম্বল ভেদ করে মাটিতে বিঁধেছে।

ধেয়ে এল ওরা, অল্পের জন্যে রেহাই পেল নিকটতম হামলাকারীর মাথা, আমার উইনচেস্টারের কুঁদো ওর কাঁধে আঘাত করল, বেসামাল হয়ে পড়ল সে। তারপর রাইফেলটা পড়ে গেল আমার হাত থেকে।

পাহাড়ে থাকতে মুষ্টিযুদ্ধে যথেষ্ট হাত পাকিয়েছি আমরা। মেয়েরা নাচের আসরে যোগ দিত নাচ আর ছেলেদের সাথে ফষ্টিনষ্টির আশায়। আর ছেলেরা যেত লড়াই আর মেয়েদের লোভে।

কিন্তু আমার নাচের চেয়ে লড়াই ভাল লাগত বেশি। তারপর আর্মিতে, এবং পরে জাহাজে– প্রচুর মারামারি করেছি। তাই রাইফেলটা হাতছাড়া হওয়ায় এক অর্থে সুবিধেই হলো– হাতাহাতি করার মওকা পেলাম।

একটা অ্যাপাচি আমার গায়ের ওপর এসে পড়েছিল, ওর মুখে ঘুসি মারলাম আমি, দুই উরুর সংযোগস্থলে হাঁটু বাধিয়ে শূন্যে তুললাম ওকে, তারপর একপাক ঘুরে ছুঁড়ে দিলাম দূরে। একটা কিছু এগিয়ে আসছিল আমার দিকে, চোখের কোণে লক্ষ্য করে সাঁৎ করে সরে গেলাম। দেখলাম ওটা একটা ছোরা, ঘুসি মারলাম ওর থুতনিতে, মট করে হাড় ভাঙল একটা।

তুমুল লড়াই চলছে– কিল চড় ঘুসি। অ্যাপাচিরা কুস্তিতে পটু, কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধে একদম আনাড়ি। গাট্টাগোট্টা এক অ্যাপাচি আমার হাত আর কোমর পেঁচিয়ে ধরল, ছুঁড়ে ফেলবে, আমি সবেগে বুটের গোড়ালি নামিয়ে আনলাম ওর পায়ের পাতার ওপর, ঢিলে হয়ে গেল বন্ধন, একঝটকায় নিজেকে মুক্ত করলাম আমি, কনুই দিয়ে আঘাত করলাম ওর কানের পাশে।

হাতাহাতি আর হট্টগোলে জীবন্ত হয়ে উঠল কয়েকটা মুহূর্ত। ওরা তিনজন, কিন্তু আমি গায়ে-গতরে ওদের চেয়ে বড়, শক্তিশালী। একজন আমার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল, সাঁড়াশির মত করে এক হাতে গলা চেপে ধরল পেছন থেকে। আমি ওর হাত আর কনুই জাপটে ধরলাম, হ্যাঁচকা টানে কাঁধের ওপর দিয়ে উড়িয়ে আনলাম সামনে, একটু সময় নিয়ে আছাড় মারলাম দেয়ালের ওপর। বুকফাটা চিৎকার করল ও। এবং ওইসময়ে একটা গুলির শব্দ হলো।

গুলিটা ক্যাম্পের বাইরে থেকে এসেছে, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম আমরা; একজন অ্যাপাচি লুটিয়ে পড়ল, রাতের অন্ধকারে চকিতে হাওয়া হলো অন্যরা। একঝলক দেখলাম আমি যাকে দেয়ালের গায়ে ছুঁড়ে মেরেছিলাম ওরা টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। তারপর সমুদ্রে বুদ্বুদের মত মিলিয়ে গেল। এই ছিল, এই নেই।

গুলিবিদ্ধ লোকটা আগুনের ধারে পড়ে আছে। হ্যারি জেগে গেছে, কম্বল মুড়ি দিয়ে দেয়ালের কোণে বসে কাঁপছে ঠকঠক করে, চোখজোড়া ভয়ে বিস্ফারিত।

একটা চাপা গলা ভেসে এল। 'আসতে পারি!'

'বুকের পাটা থাকলে এসো,' বললাম আমি, এবং পরক্ষণে একজন যুবতী দেখা দিল– দেহের প্রতিটি বাঁকে উপচে-পরা যৌবন, অপরূপা।

পাঁচ ফুটের চেয়ে সামান্য কিছু লম্বা, গায়ে বাকস্কিনের হান্টিং শার্ট। এত চমৎকার কাপড় আমি দেখিনি কখনও। মেয়েটা বেশ চটপটে এবং সাহসী. লাগামে ধরে মাদি ঘোড়াটা টেনে আনছে, আরেক হাতে উইনচেস্টার।

হাত বাড়িয়ে দিল ও। 'নোরা পিটার,' মিষ্টি গলায় বলল। 'আমার বেশভূষা দেখে কিছু মনে কোরো না।'

'ম্যাম,' আন্তরিক গলায় জবাব দিলাম আমি, 'তোমার যা সাহস আর হাতের টিপ– তাতে পোশাকে কিছু যায়-আসে না।'

তারপর নিজের পরিচয় দিলাম, 'আমি উইলিয়ম ওরিন ওসমান, আর ওর নাম হ্যারি ব্রুক, অ্যাপাচিদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছি,' বললাম হ্যারিকে দেখিয়ে।

কথা বলতে বলতে আমরা দুজনেই পিছিয়ে এসেছি অন্ধকারে, উৎকর্ণ হয়ে আছি আমি। আমার বিশ্বাস আপাতত একটা শিক্ষা হয়েছে অ্যাপাচিদের, তবে সাবধানের মার নেই– দলে ভারি হয়ে আবার হামলা করতে পারে।

'অন্যরা কোথায়? পালাতে পেরেছে?'

'হ্যাঁ– দুটো ছেলে আর একটা মেয়ে।'

'মেয়েটা আমার বোন। ওর কারণেই আমি এসেছি।'

নোরা এতক্ষণ ছায়ার সাথে কথা বলছিল, ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাতে সরে এসেছি আমি। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়– যতটা সম্ভব ব্যবধান বাড়াতে হবে অ্যাপাচিদের সাথে। ঘণ্টাখানেকের ভেতর বাসা-ভাঙা পিঁপড়ের মত এই পাহাড় ছেয়ে ফেলবে ওরা।

নোরা আর হ্যারি আমার সঙ্গে এল, আগের ট্রেইল ধরে প্রায় ঘণ্টাখানেক উত্তরে এগোলাম আমরা, তারপর পশ্চিমে বাঁক ঘুরে অন্য একটা পথে উঠলাম। দীর্ঘদিন হলো ব্যবহৃত হয় না এই ট্রেইল, কোনও ট্র্যাক নেই। মাঝে-মধ্যে বিচ্ছিন্ন মেঘের ফাঁক গলে আকাশ উঁকি দিচ্ছে, তখন তারা দেখা যাচ্ছে গুটিকতক। নিরেট কালো দেয়াল জড়াজড়ি করে দুপাশে দাঁড়িয়ে, অসংখ্য পাথরচাঁই ছড়ানো ছিটানো। আমরা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি ওগুলো। একে দুর্গম প্রান্তর, তার ওপর ঝড়-বাদল, প্রতিটি মুহূর্ত জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বাস করছি আমরা। কতটা পানি ওঠে এখানে দেখার জন্যে দেয়ালের দিকে তাকানোর প্রয়োজন হয় না। বোঝা যায় ঘণ্টা দুয়েকের প্রবল বৃষ্টিতে অন্তত ত্রিশ ফুট পানি দাঁড়িয়ে যাবে। তবে এখন নেমে গেছে... কামনা করলাম কিছুক্ষণের মধ্যে যেন আবার বৃষ্টিপাত না হয়।

এই ট্রেইল যাদের সৃষ্টি তাদের কোনও ঘোড়া ছিল না; পায়ে-চলা পথ। খানিক দূর এগোনোর পর নেমে হাঁটতে বাধ্য হলাম আমরা। সামনের ট্রেইল আরও খারাপ, তবে হ্যারি স্ট্যালিয়নের পিঠেই রইল।

এখন আমি এই পাহাড় থেকে উল্টো দিকের সমভূমিতে বেরোতে চাইছি। কোনও বাথান পেলে উত্তম। তবে এ-মুহূর্তে নোরার সঙ্গ উপভোগ করছি পুরোপুরি।

আকারে ছোট হলে কী হবে স্নায়ুতে জোর আছে। নইলে ছোট বোনের খোঁজে এমন জায়গায় কেউ আসে!

আলাপের সুযোগ নেই, কারণ আমরা একসারিতে চলছি– অবিরাম। অচেনা ট্রেইল, কোথায় গিয়ে শেষ হবে জানি না। হয়তো কোনও অ্যাপাচি ডেরায় গিয়ে, সে-ক্ষেত্রে কোনও সাহসী যোদ্ধা হয়তো আমার করোটি-ছাল ঝুলিয়ে রাখবে তার কুটিরের সামনে। এ-ব্যাপারে অ্যাপাচিরা পটু।

দীর্ঘ ঢালের মাথায় আমরা দম নিতে থামলাম। ঘাড় ফিরিয়ে নোরার দিকে

তাকালাম আমি। আমার ঠিক পেছনেই রয়েছে ও, মাদী ঘোড়াটা টেনে আনছে। ওর প্রতি দুকদম আমার একটার সমান। হ্যারি ব্রুক স্ট্যালিয়নের পিঠে বসে, মুখে কথা নেই।

ওখানে একটুক্ষণ দাঁড়ালাম আমরা। নোরা বলল, 'আকাশের রঙ বদলাচ্ছে।'

ঠিক, ধূসর আলো ফুটছে, শিগগিরই ভোর হবে। তারপর আবার সব চুপচাপ, প্রয়োজন বোধ করছি না কথা বলার, অন্ধকারে ভাবের আদানপ্রদান হচ্ছেঃ পরস্পরের উপস্থিতি অনুভব করছি আমরা। অন্ধকার, নিজেদের চারপাশের বিপদ, বৃষ্টির পর ক্যানিয়নের ভ্যাপসা গন্ধ– সবকিছুই টের পাচ্ছি। পাইনের সুরভি ভেসে আসছে... তারপর আরেকটা গন্ধ পেলাম।

ধোঁয়ার গন্ধ।

গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট। এই পরিবেশে আমরা কোনও বন্ধুকে আশা করতে পারি না। আমার সঙ্গীরা উত্তরে পালিয়ে গেছে, ফলে যেই থাকুক এখানে সে নিশ্চয়ই অ্যাপাচি। ধোঁয়ার গন্ধ আসছে সামনে থেকে।

ফিরে যাওয়ার সাহস হলো না, ওপরে ওঠার পথ নেই। স্ক্যাবার্ড থেকে উইনচেস্টার বের করলাম আমি, দেখাদেখি নোরাও বের করল ওরটা।

'নিঃশব্দে এগোব,' ফিসফিস করে বললাম আমি। 'যদি পাশ কাটাতে পারি, ভাল– নইলে ঘোড়া ছুটিয়ে পালানোর চেষ্টা করব। তুমি আর হ্যারি একটা ঘোড়ায় ওঠো, যদি বিপদ দেখো, পালিয়ে যেও।'

'তুমি?'

হাসলাম। 'ম্যাম, আমার হিরো হওয়ার একটুও শখ নেই। দু-চারটে গুলি ছুঁড়েই তোমাদের পিছু নেব।'

রওনা হলাম। ভোরের মুখে লক্ষ করলাম ক্রমশ চওড়া হচ্ছে ক্যানিয়ন। খানিকবাদে মোকাসিনের ছাপ চোখে পড়ল আমার। গাছের ছালবাকল, কয়েকটা শুকনো ডাল পড়ে আছে, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করছিল কেউ। এবং তারপর সামনে শোরগোলের আওয়াজ পেলাম। ওই শব্দ আমার চেনা।

'বোধহয়,' বললাম আমি, 'কেটে পড়তে পারব। ওরা এখন নিজেদের কাজে ব্যস্ত।'

পলক তুলল ও। জিজ্ঞেস করল, 'কী এমন কাজ যে আর কোনওদিকে হুঁশ নেই?'

ওই নিষ্পাপ চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে মিছে কথা বলা কঠিন। এমনিতেও অনুমান করে নেবে ও। 'কাউকে বন্দী করেছে,' বললাম আমি। 'এখন বোঝার চেষ্টা করছে লোকটা কতখানি সাহসী। সে যদি নির্যাতন সইতে পারে, অ্যাপাচিরা গর্বিত বোধ করবে, ভাববে তাদের বন্দী একজন সাহসী লোক ছিল।'

এগোলাম আমরা, সতর্ক রয়েছি ঘোড়াগুলো যেন বেমক্কা শব্দ না করে।

অবশ্যি এর দরকার ছিল না, ভাল জাতের জানোয়ার, নিজেরাই যথেষ্ট সাবধানী। সহজাত অনুভূতি ছাড়াও আমাদের সতর্কতা সংক্রমিত হয়েছে ওদের মাঝে। কুকুরের মত ঘোড়াও তার মনিবের মনোভাব বুঝতে পারে।

পশ্চিমের মানুষ তার ঘোড়ার ইন্দ্রিয়ের ওপর আস্থা রাখে। ওর সাথে নিজের পানি, এবং সময়ে খাবারও ভাগাভাগি করে খায়।

নিঃশব্দে অথচ একলয়ে এগোচ্ছি, কিছুক্ষণের ভেতর ওদের ক্যাম্পের দেখা পেলাম– ঝরনার পাড়ে অবস্থিত, অংশত ঝোপঝাড়ে ঢাকা। ঝরনাটা বেশি হলে চার ফুট চওড়া, ইঞ্চি কয়েক গভীর।

রাইফেলহাতে আগে বাড়লাম আমি, চোখের কোণে লক্ষ্য করছি ক্যাম্পটাকে।

ক্যানিয়ন এখানে কমপক্ষে পঞ্চাশ ফুট চওড়া। সাদা বালুতে পাথরের ফুটকি, এখানে-সেখানে ঘন উইলো।

ঠাণ্ডা সকাল, অথচ আমার মেরুদণ্ডে ঘামের স্রোত। পাছে পাথরে খুরের ধাক্কা লাগে এই আশঙ্কায় তটস্থ রয়েছি সর্বদা। একসময় আমরা ক্যাম্পের পাশে চলে এলাম।

ইন্ডিয়ানদের সমস্ত মনোযোগ বন্দীর প্রতি, তীর ছুঁড়ছে ওর দিকে, এক চুলের জন্যে গায়ে বিঁধছে না, গাছের গায়ে গেঁথে দিচ্ছে বন্দীর শার্ট। ও যখন মাথা তুলল কপালে ক্ষীণ রক্তের ধারা চোখে পড়ল আমার। এবং অ্যাপাচিদের গলা ছাপিয়ে লোকটার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম আমি, গান গাইছে।

বন্দী আমাদের বেন মারফি।

একটা কটনউড গাছের সাথে বাঁধা হয়েছে বেনকে এবং অ্যাপাচিরা অনবরত তীর ছুঁড়ছে, ধীরে ধীরে বাড়ছে নির্যাতনের মাত্রা... অথচ বেন গান গাইছে!

ওর গানে খেপে উঠছে ওরা কিন্তু আমার বিশ্বাস শুধু এই কারণেই ভালও বাসছে ওকে: ওদের বন্দীর স্নায়ু মজবুত, নির্যাতনের মুখেও অবিচল... গানের ভেতর দিয়ে নিজের সাহস জিইয়ে রাখছে বেন।

সন্দেহ নেই ওকে মেরে ফেলবে ওরা। কাউকে নির্যাতন করার ব্যাপারে অ্যাপাচিদের তুলনা চলে একমাত্র শয়তানের সাথে। যতক্ষণ সম্ভব বন্দীকে বাঁচিয়ে রাখে ওরা, নরক-যন্ত্রণা দেওয়ার নিত্যনতুন কৌশল উদ্ভাবন করে, এবং বন্দীর শক্তি ও সাহসের জন্যে সমীহ করে তাকে।

বেন পুরোনো-গানের পাগল, পশ্চিমের পাহাড়ি সঙ্গীত ভালবাসে। যখন আমরা ওকে দেখতে পাই 'জেব্রা ডান' গানটা গাইছিল ও। তারপর মাথা তুলে আমাদের দিকে চোখ পড়তে 'জন হার্ডি'র সুর ধরল।

'জন হার্ডি ওয়াজ আ ডেসপারেট ম্যান, হি ক্যারিড হিজ
টু গানস এভরি ডে।
হি কিল্ড আ ম্যান অন দ্য ওয়েস্ট ভারজিনি লাইন, বাট ইউ অট

টু সি ওরিন ওসমান গেটিন' অ্যাওয়ে,
আই ওয়ান্ট টু সি ওরিন ওসমান গেটিন' অ্যাওয়ে!'

হুঁশিয়ার করছে আমাকে। ওর নিজের জীবন বিপন্ন, অথচ আমাদের নিরাপত্তার কথা ভাবছে। আমারও থামার দুঃসাহস হলো না, সঙ্গে একজন মহিলা আর বাচ্চা রয়েছে। আমার ওপর নির্ভর করছে ওরা। তবে চলে যাওয়ার আগে আর একনজর ক্যাম্পটা জরিপ করলাম। জনাদশেক ইন্ডিয়ান; প্রত্যেকেই সশস্ত্র।

এগিয়ে চললাম আমরা, বেন মারফি এবং আমাদের নিজেদের বিপদের কথা ভেবে কাঁটা দিচ্ছে গায়ে। ওদের ক্যাম্প ছাড়িয়ে এসেছি, তবু প্রতিমুহূর্তে অ্যাপাচি হামলার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে আছি।

সম্ভবত অ্যাপাচিরা আঁচ পায়নি কাছেপিঠে আর কেউ আছে। হয়তো ইতিমধ্যে বধ করেছে অন্যদের, কিংবা তাড়া করছে এখনও। ওদের ক্যাম্প থেকে পঞ্চাশ গজ সামনে বাঁক নিয়েছে ক্যানিয়ন, ওখানে পৌঁছে ধড়ে কিছুটা প্রাণ ফিরল আমাদের।

বুঝতে পারছি আমার হাতে সময় বেশি নেই, এক্ষুণি হস্তক্ষেপ না করলে বেন মারফি মারা পড়বে। অথচ তা হতে দিতে পারি না আমি।

কিছুদূর এগিয়ে আমি রাশ টানলাম। 'আমাকে বিদায় দিতে হবে,' নোরা পিটারকে বললাম আমি। 'সনোরা চেনো?'

'না।'

'উত্তরের বাথানগুলোতে লোকজন বিশেষ নেই– অ্যাপাচিরা মেরে ফেলেছে। যারা এখনও আছে, তাদের কাছে সাহায্য আশা করা বোকামি। আমার পরামর্শ, সোজা পশ্চিমে যাবে, সব সময় লক্ষ্য রাখবে ট্রেইলের দিকে। যদি বাথান পাও, বলবে তোমাদেরকে যেন লুকিয়ে রাখে।'

নোরাকে ইতস্তত করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি এলে কেন?'

'আর কেউ ছিল না। আমি চাইনি আমার বোন অ্যাপাচিদের মত মানুষ হোক।' একটু দ্বিধা দেখা দিল ওর মাঝে। 'অবশ্যি খুব যে একটা ভাল ছিলাম তাও না। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে বাথানটা আমিই দেখাশোনা করছিলাম– কিন্তু এখনও সুখের মুখ দেখতে পাইনি।'

'পশ্চিমে যাবে,' পুনরাবৃত্তি করলাম আমি। 'আশা করি নতুন করে বলার দরকার নেই– নিশ্চয়ই এতদূর চোখ বন্ধ করে আসোনি তুমি।'

হ্যাটের কারনিসে একটা আঙুল ছুঁয়ে, ঘোড়া ঘোরালাম আমি। 'বিদায়, নোরা।'

'বিদায়, উইলিয়ম ওরিন,' বলে বিদায় নিল নোরা। আমি ফিরতি পথ ধরলাম।

কী করব সে-ব্যাপারে এখনও কোনও পরিকল্পনা আঁটিনি আমি। রক্ত-পিপাসু অ্যাপাচিদের কবল থেকে একজন বন্দীকে উদ্ধার করা চাট্টিখানি কথা নয়। গুলি ছুঁড়তে পারব না। মুহূর্তে সতর্ক হয়ে যাবে ওরা, ছড়িয়ে পড়ে খুঁজে

টোপ

বের করবে আমাকে, ঘেরাও করবে। অথবা হয়তো তক্ষুণি মেরে ফেলবে বেনকে।

তবে ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে একটি সত্য আমি জানি। স্বেচ্ছায় কেউ যদি ওদের ক্যাম্পে ঢোকে, ওরা সচরাচর তার কোনও ক্ষতি করে না।

কিন্তু এখন এতে ঝুঁকি রয়েছে, কারণ আমরা পরস্পরের শত্রু। এ-বার হয়তো আমাকে দেখামাত্র চিনে ফেলবে। তবু আর কোনও বুদ্ধি আসছে না আমার মাথায়। কিন্তু ক্যাম্পে ঢোকার পর কী করব? বেনকে উদ্ধার করব কীভাবে?

ওদের ভাষা জানি। ট্যাম্পিকো রোকার মত অতটা সাবলীল না হলেও কাজ চালাতে পারব।

আমার সঙ্গে আসার ফলেই বেন মারফি বিপদে পড়েছে। অতএব আমার দায়িত্ব ওকে উদ্ধার করা, আর তা যদি সম্ভব না হয়– একসাথে মরা।

আগ্নেয়াস্ত্রের অভাব নেই আমার কাছে। উইনচেস্টারের চেম্বার ভরা, হোলস্টারে ঝুলছে সিক্স-শূটার। পিস্তলে আমার হাত চালু এটা সবাই স্বীকার করে। কোমরের বেল্টে আরেকটা সিক্স-শূটার রয়েছে।

আমি বালিয়াড়ি ভেঙে সোজা ওদের ক্যাম্পে ঢুকলাম।

বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল ওরা। নেৎজাহি গোত্রের অ্যাপাচি। ওদেরকে খুনে যোদ্ধাও বলে অনেকে কারণ শত্রুর প্রতি ওরা ভয়ানক নির্মম।

আগেই বলেছি, ইন্ডিয়ানরা কৌতূহলী স্বভাবের মানুষ। যুদ্ধের জন্যেই ওদের জন্ম। আর অ্যাপাচিদের মধ্যে নেৎজাহিরাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, বাছাই-করা সব লোক রয়েছে এই খুনে-সংঘে। সাহসীর কদর জানে। কিন্তু আমি কী করি দেখার জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠেছে, এ-মুহূর্তে বোধ হয় তাই বিনা আমন্ত্রণে ওদের ক্যাম্পে ঢোকা সত্ত্বেও আমাকে আক্রমণ করল না কেউ।

অভিব্যক্তিহীন চোখে সবাইকে জরিপ করলাম আমি। গোলমালের শুরুতে যাদেরকে খতম করব তাদের চিহ্নিত করলাম। লড়াই একবার বাধলে আর নিশানা করার অবকাশ পাব না, পয়লা চোটে দু-একটাকে মারতে পারলে...

'হ্যালো!' অ্যাপাচি ভাষায় অভিবাদন জানালাম ওদের। 'আমি আমার বন্ধুকে নিতে এসেছি!'

নয়

খাঁচায়-পোরা বাঘের মত রুখে দাঁড়াল সবাই। নিকষ কালো চোখগুলো জ্বলছে। মোট নজন। একজনের পরনে পুরোনো আর্মি কোট, আর একজনের রঙ-জ্বলা লাল-শার্ট। অন্যদের উদোম গা। কোমরে গাছের বাকল বা পশুছাল জড়ানো। পায়ে হাঁটু-সমান মোকাসিন।

একজনের কাছে রাইফেল আর দুজনের কাছে পিস্তল রয়েছে। আর একজনের তীর-ধনুক। অন্যরা বউই নাইফ হাতে দাঁড়িয়ে। আগ্নেয়াস্ত্র আর তীর-ধনুক আগুনের পাশে রাখা।

সিদ্ধান্ত নিলাম যে-দুজনের কাছে রাইফেল আর তীর-ধনুক রয়েছে প্রথমেই তাদেরকে মারব। উইনচেস্টারের লেভার টানতে যতক্ষণ লাগে তার চাইতে কম সময়ে একজন অ্যাপাচি তীর ছুঁড়তে পারে...এবং তার আঘাত আরও মারাত্মক।

'তোমাদের বন্দী আমার বন্ধু। ওকে নিয়ে যাব আমি।'

আমার আকস্মিক আবির্ভাবে হকচকিয়ে গেছে ওরা, দ্বিধায় পড়েছে। আমি একা? না আর কেউ এসেছে সঙ্গে? চোরাচোখে আশপাশের পাহাড়গুলো জরিপ করছে।

ওদের ক্যাম্পে একাকী এসেছি, এটা বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি যে-পথে এসেছি সেখানে ঝরনার দুই তীরেই ঝোপঝাড়। এখানকার পাহাড়গুলো নিচু, পাথরচাঁইয়ে ঢাকা।

ইন্ডিয়ানরা এখন আমার সামনে রয়েছে। ওদের দিকে এগোনোর দুঃসাহস হলো না আমার। শান্তির চিহ্ন হিসেবে এক হাত ওপরে তুলে রেখেছি আমি, তালু অ্যাপাচিদের দিকে ফেরানো। ওরাও ঠিক তাই করছে। এ-বার অনেক সময় নিয়ে রাইফেল উঁচু করলাম আমি, তাক করলাম বেনের দিকে, মাযলটা সামান্য নিচু করে ট্রিগারে চাপ দিলাম।

বুলেটের আঘাতে মারফির বাঁধন কেটে গেল। গা ঝাড়া দিল ও, ঢিলে হয়ে গেল দড়িটা, আবার নড়াচড়া করল মারফি।

হঠাৎ এক অ্যাপাচি এগিয়ে এল। 'কিল হিম!' তারস্বরে চিৎকার করল সে।

ধনুকধারীকে গুলি করলাম আমি, স্পারের খোঁচা মারলাম স্ট্যালিয়নের পেটে, গুলির মত ওদের দিকে ছুটে গেল ও। আবার ট্রিগার টিপলাম, লক্ষ্যভ্রষ্ট হলাম, কাছেই দাঁড়িয়েছিল আরেক অ্যাপাচি, কুঁদোর ঘায়ে ফাটিয়ে দিলাম ওর মাথা। আমার ঘোড়া পথ কেটে বেরিয়ে গেল, ঘুরে দাঁড়াল চকিতে, আবার ধেয়ে এল।

একটা গুলি ছুটে এল পাহাড়ের দিক থেকে, তারপর আর একটা। বেন ইতিমধ্যে নিজের হাত-পা মুক্ত করেছে, ঘোড়াগুলো যেখানে বাঁধা আছে সে-দিকে দৌড়ে যাচ্ছিল ও।

ভয়াল-দর্শন এক ইন্ডিয়ান পিছু নিল, লোকটার শিরদাঁড়ায় লক্ষ্য স্থির করলাম আমি, গুলি করলাম। একটা বিশাল পাথরচাঁইয়ের দিকে ছুটে গেল ও, ধাক্কা খেলো চাঁইটার সাথে, তারপর ছিটকে পড়ল হাত-পা ছড়িয়ে।

ছুটন্ত অবস্থায় একজন অ্যাপাচি যোদ্ধা আমার স্ট্যালিয়নের উদ্দেশে ঝাঁপ দিল, দুহাতে আঁকড়ে ধরল স্যাড়ল, আমার পেছনে উঠে বসার চেষ্টা করছে।

হাঁটু দিয়ে ঘোড়ার পেটে গুঁতো মারলাম আমি, এক হাত ঘুরিয়ে সজোরে আঘাত করলাম ওর মাথায়, বাউলি কাটল ইন্ডিয়ান, আমাদের দুজনের মরিয়া

হাতাহাতি শুরু হলো। কিন্তু ওর চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছি আমি, পা দুটোই রেকাবে, ফলে হার মানতে বাধ্য হলো ও।

নিজের স্যাডলে উঠে বসেছে বেন, ঝড়ের বেগে উড়ে এল। ঝরনায় নামলাম আমরা দুজন, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম পাশাপাশি। ওদিকে পাথর গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে অ্যাপাচিরা, গুলি ছুঁড়ছে আশেপাশের টিলাগুলোর দিকে।

কিছুদূর গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম আমরা, পাল্টা জবাব দেব, হঠাৎ চোখের কোণে লক্ষ করলাম ট্যাম্পিকো রোকা আর জেমস গ্রীন নেমে আসছে ঢাল বেয়ে।

প্রায় আধ-মাইলের মত জোর কদমে ছুটলাম আমরা, তারপর ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিতে গতি কমালাম, ঠিক তক্ষুণি চোখে পড়ল একটা চওড়া ট্রেইল– ঝরনা থেকে উত্তর দিকে চলে গেছে। ট্রেইলটা ধরলাম আমরা, নিচু পাহাড় পেরিয়ে আগের সেই ঝরনাবক্ষের আরেক অংশে গিয়ে নামলাম।

এরপর আবার এগিয়ে চললাম দ্রুত, তীক্ষ্ণ নজর রাখছি পেছনে। কারও মুখে শব্দটি নেই। আমার চোখ ট্রেইলে, নোরা আর হ্যারির ট্র্যাক খুঁজছি, কিন্তু দেখতে পেলাম না কিছু।

এখন আমরা সিয়েরা মাদ্রের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছি। মাথার ওপরে খাঁজগুলো পাইনে ছাওয়া, নীচে ম্যাপ্ল্, জুনিপার, ওক আর উইলোর ঝাড়। মাঝে মাঝে গোলাপ আর হ্যাকবেরি। ছোটখাট ঝরনা অসংখ্য।

অনেকটা কপালজোরে ওদের চোখে ধুলো দিতে পেরেছি আমরা। তবে এটা সাময়িক স্বস্তি মাত্র। আচমকা আক্রমণে অ্যাপাচিরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে, ঠিকই খুঁজে বের করবে আবার।

মাঝারি কদমে এগোচ্ছি, ঘন ঘন তাকাচ্ছি পেছনে, একটা চোখ রয়েছে আশপাশের খাঁজগুলোর দিকে। জায়গাটা বন্ধুর হলেও তুলনামূলকভাবে খোলামেলা। ঝরনার পাড়ে বৃক্ষসারি, এখানে-সেখানে ঝোপ। বৃষ্টি হওয়ায় ট্রেইলে ধুলো নেই, খুরের আওয়াজ তেমন জোরাল হচ্ছে না।

দুবার ঝরনা পেরোলাম আমরা, তিনবার পানির ভেতর দিয়ে যাওয়া-আসা করলাম উজান-ভাটিতে। এর ফলে হারিয়ে যাবে আমাদের ট্র্যাক।

একবার বিশাল একটা গাছের নীচে থেমে বিশ্রাম নিলাম মিনিটখানেক। ওই ফাঁকে নোরা পিটার আর হ্যারির কথা বন্ধুদের জানালাম আমি। 'আমার যদি কিছু হয়ে যায়,' বললাম, 'ওদেরকে উদ্ধার করো।'

চুপ করে আছে বাচ্চাগুলো, মুখ শুকিয়ে গেছে– ভয়ে, খিদেয়। একা থাকলে এই অবস্থায় খাবার তৈরি করার ঝুঁকি নিতাম না, কিন্তু বাচ্চারা খিদে সইতে পারবে না, তাই বাধ্য হলাম থামতে। রোকা পাহারায় রইল, রান্নার ভার নিল বেন। গ্রীন আর আমি একটা গাছের তলায় ঘুমোলাম।

যখন ঘুম ভাঙল আমার গলা শুকিয়ে গেছে, উঠে বসলাম, রাইফেলের কুঁদোয় হাত রেখে তাকালাম চারপাশে। শান্ত বনভূমি। দূরের পাইন জঙ্গলে বাতাসের স্রোত। কাছেই পাথরের ফাঁকে ফাঁকে কুলকুল শব্দে বইছে ঝরনা।

মাঝে-মধ্যে ভেসে আসে একটা-দুটো পাখির কুহু।

ট্যাম্পিকো রোকা আর বেন আমার কাছে এল। গ্রীন পাহারায় আছে, অবস্থান নিয়েছে কতগুলো পাথরের আড়ালে। সবার অলক্ষ্যে ওখান থেকে চারদিকে নজর রাখতে পারবে। বাচ্চারা ঘুমোচ্ছে।

'আমরা এখন কোথায়?' আমি জিজ্ঞেস করলাম রোকাকে।

'আমিও ভাবছিলাম কথাটা।' আঙুল দিয়ে বালুতে একটা ঢেউ-খেলানো রেখা আঁকল ও। 'এইখানে ব্যাভিসপে,' বলে পশ্চিমে নির্দেশ করল রোকা। 'ওইদিকে গেছে। নদীর ও-পারে বাথান আছে কিছু। মানুষজন আছে কিনা জানি না, থাকলেও খুব কম, অধিকাংশই নিহত হয়েছে অ্যাপাচি হামলায়। আপাতত লুকোনোর পক্ষে মন্দ নয়। গা ঢাকা দেওয়ার মত প্রচুর জায়গা আছে। পানি, ঘাস মিলবে।

এরপর আমরা স্যান্তা মারগারিতাসে যাব...আমার চেনা একটা পুরোনো মাইনিং ক্যাম্পে... তারপর সিনাপায়, প্রায় সনোরা নদীর তীরে।'

'শুনতে ভালই।'

একটা ঘাস চিবোচ্ছিল বেন। 'তবু একটা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে,' বলল ও। 'যে-কারণে আমাদের আসা তা এখনও সফল হয়নি। তোমার ভাতিজাকে খুঁজে পাইনি আমরা।'

রোকা তাকিয়েছিল আমার দিকে, আমার মনোভাব বোঝার চেষ্টা করছিল। 'এই বাচ্চারা ওর ব্যাপারে কিছু জানে না,' বলল ও। 'অথচ ইন্ডিয়ানরা এনে থাকলে ঠিকই জানত।'

'মেয়েদের আমি একটুও বিশ্বাস করি না,' বলল বেন। 'রাগ কোরো না, ওরিন, তোমার ভাই-বউয়ের সাথে তোমার কোনও শত্রুতা...'

ওর চোখে চোখ রাখলাম আমি। 'এতে রাগের কিছু নেই, বেন– তুমি আমার ভালর জন্যেই বলছ। সত্যি বলতে কী, টুসানেই ওর সাথে আমার পরিচয়। অ্যাঞ্জেলের সাথে ওর ব্যাপারে আগে কোনও আলাপ হয়নি আমার। অনেকদিন পর দেখা হয়েছিল আমাদের– ফলে পুরোনো দিনের কথাতেই মশগুল ছিলাম।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সবাই। তারপর গ্রীন, ইতিমধ্যে ও এসে যোগ দিয়েছে আমাদের সাথে, বলল, 'ওসমান, আমার ধারণা ও তোমাকে ধাপ্পা দিয়েছে।'

'কিন্তু এর কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না আমি।'

'তোমাকে কোনও কারণে মেরে ফেলতে চায় না তো? বুঝে দেখ... এখান থেকে ফিরতে পারে না কেউ। আমরা পারব তা বলা যাচ্ছে না এখনও।'

'আর কোনও ছেলের কথা বাচ্চারা শোনেনি,' ফের বলল রোকা। 'থাকলে ওরা ঠিকই জানত। হ্যারি ব্রুকও শোনেনি। ও অ্যাপাচি ভাষা বোঝে– চাপা থাকে না এ-সব কথা'।'

যাই হোক, এখন এ-নিয়ে আর জল্পনা-কল্পনা করে লাভ নেই। আমাদের

সামনে বিস্তৃত পথ। আমি ওদের বললাম সে-কথা, তারপর স্যাডলে চেপে ক্রীকের ভাটিতে রওনা হলাম।

রোকা বারবার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। উৎকণ্ঠায় ভুগছে ও। এ-রকম পরিবেশে যখন কেউ অ্যাপাচিদের দেখতে পায় তার দুশ্চিন্তা বাড়ে, কিন্তু যখন তা পায় না, তখনই ঘটে আসল বিপদ। যে-কোনও জায়গায় ওদের ওত পেতে থাকার আশঙ্কা থাকে।

সন্ধ্যের একটু আগে, ছায়ারা যখন নেমে আসছে পাহাড়-পর্বত থেকে, আমরা একটা বাথানে এসে হাজির হলাম। কাছাকাছি গিয়ে ছড়িয়ে পড়লাম আমরা। আমার হাতে উইনচেস্টার প্রস্তুত, হ্যাটের কপাল-ঢাকা কারনিসের তলা দিয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে জরিপ করছি সবকিছু।

কোনও ধোঁয়া নেই... নড়াচড়া নেই। কোথায় যেন একটা নীলকণ্ঠ পাখি ডাকছে, পাশাপাশি দুটো গাছে বসে প্রেমালাপ করছে দুই কোয়েল। এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

নীরবে উঠোনে ঢুকলাম আমরা। গ্রীন মূল ফটক দিয়ে ঢুকল, আমি ভাঙা দেয়ালের পাশ দিয়ে। বেন ডানে চলে গেল, রোকা বাঁয়ে।

একটা জনপ্রাণী নেই বাথানে। আগুনে পুড়ে গেছে, ধসে পড়েছে কোনও কোনও পাথরের দেয়াল। গরাদ-বিহীন জানালাগুলো শূন্যকোটর চোখের মত তাকিয়ে আছে ফাঁকা দৃষ্টিতে। দুটো গোলাবাড়ি। দুটোই ভস্মীভূত। দগ্ধ কড়ি-বরগা আর পাথরের দেয়াল ভেঙেচুরে স্তূপ হয়ে আছে একজায়গায়। কোরালের প্রবেশপথে পড়ে আছে কয়েকটা মেসকিট গাছ।

তবু উঠোনটা মোটামুটি ছায়াচ্ছন্ন। লোহার পাইপের ভেতর দিয়ে চৌবাচ্চায় পানি গড়িয়ে পড়ছে। ওকের শাখা গজিয়েছে একটা খোলা জানালার ভেতর দিয়ে। শান-বাঁধানো আঙিনার দখল নিয়েছে একটা বিরাটকায় সাইক্যামোর গাছ– বহুদূর বিস্তৃত শেকড়।

একসময় বাথানটা মানুষের কলকোলাহলে মুখরিত ছিল। লাগোয়া ফসলের মাঠ ছিল শস্যে পরিপূর্ণ। সুখে ছিল এখানকার লোকেরা।

উঠোনে পুরু হয়ে ঘাস জন্মেছে। রাশ টানলাম আমরা। বাগানে বাতাসের দোলা... চৌবাচ্চায় পানি গড়িয়ে পড়ছে টুপ্ টুপ্ টুপ্।

ঘাড় ফিরিয়ে চারদিক জরিপ করল জেমস গ্রীন, কথা নেই মুখে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল বেন মারফি, তারপর বলল, 'মরুযাত্রার পর এ-রকম জায়গায় এলে ভাল লাগে– কলজেটা ঠাণ্ডা হয়।'

'আমাদের একবার ঘুরে-ফিরে দেখা উচিত ভাল করে,' আমি বললাম। 'ট্যাম্প, তুমি ও-পাশের দেয়ালটা দেখ। বেন বাচ্চাদের পাহারা দেবে।'

আমরা এগিয়ে গেলাম। একটা খরগোশ লাফিয়ে উঠল আমার গোড়ালির কাছ থেকে, ছুটে পালাল। ঘুরে ঘুরে সবই দেখলাম আমরা, উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়ল না।

উঠোনের এককোণে ওআচ টাওয়ার, বড় বড় গাছের মগডালের আড়ালে

ঢাকা পড়েছে। প্রথম পালায় পাহারার দায়িত্ব নিলাম আমি। গ্রীন বসল রান্নার জোগাড়ে।

সুন্দর মিষ্টি রোদ্দুর। কিন্তু আমার অসুবিধে হচ্ছে, পশ্চিমে তাকাতে পারছি না। ইন্ডিয়ানরা পুবের পথে আসাই স্বাভাবিক, তবে সূর্যকিরণকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার সুযোগ পেলে সেটা হাতছাড়া করবে না ওরা। বরাত নেহাত ভাল, বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না সমস্যা– পশ্চিম দিগন্তে, পর্বতমালার পেছনে হারিয়ে গেল সূর্য। সন্ধানী চোখে আমি তাকালাম চতুর্দিকে, সব ফাঁকা– কেবল ধু-ধু মরু আর বালুপাহাড়।

নোরা পিটার এখন কোথায়? আমরা যেভাবে পরিকল্পনা করেছিলাম, সেভাবে এগিয়ে থাকলে খুব একটা দূরে নেই। কারণ নানা পথ ঘুরে আমরাও পশ্চিমেই চলে এসেছি।

পুরো এলাকা দেখা যায় টাওয়ার থেকে। লুকোনো সম্ভব এমন জায়গাগুলো জরিপ করলাম আমি। বাথানের জমিটা চিন্তাভাবনা করে বাছাই করা হয়েছিল। বেশ সুরক্ষিত, প্রচুর জ্বালানি কাঠ রয়েছে। কিন্তু কপালের লিখন, ইন্ডিয়ান হামলা থেকে বাঁচতে পারেনি এখানকার মানুষ, নিপাত হয়েছে ঝাড়ে-বংশে।

বিশজন লোক হলেই এখানে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। বোধ হয় ওদের লোকবলের অভাব ছিল তখন।

দিনের শেষ-রশ্মিটুকু মুছে যাচ্ছে, এমন সময় আমি ওদের দেখলাম– দুজন ঘোড়সওয়ার, আসছে এইদিকে।

মারফি একটা ভাঙা দেয়ালের পাশে হাঁটু গেড়ে অবস্থান নিয়েছিল। ওকে হুঁশিয়ার করলাম। তবে গোড়াতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, অশ্বারোহী দুজন আরেকটু কাছে এলে নিশ্চিত হলাম।

টাওয়ার থেকে গলা চড়িয়ে ডাকলাম আমি, 'নোরা! নোরা পিটার! ভেতরে এসো!'

দশ

কিটি হার্স্ট ওসমান চতুর মহিলা। শীতল নির্লিপ্ত। তবে ওই আপাত-পাথর প্রতিমার নীচে যে এক আগ্নেয়গিরি সুপ্ত, জেগে ওঠার অপেক্ষায় রয়েছে, তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকে ওর হাবভাবে। কিটির মনে আবেগের কোনও বালাই নেই। কিন্তু যৌবনের শুরুতেই ও শিখেছে, শান্ত চালচলনের সাথে গভীর প্রেমাবেগ আর যৌনাবেদনের এক-আধটু চকিত ইশারা সময়ে কাজে দেয়: ব্যবহার করা যায় হাতিয়ার হিসেবে।

বাবার প্রতি কিটির ভক্তি অচলা। তাই যারা জোনাথনের সামান্যতম বিরোধিতাও করেছে তাদেরকে ও ঘৃণা করে।

ওরিন ওসমান মেক্সিকোতে যাওয়ার পর কয়েকটা হপ্তা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও যখন কোনও সংবাদ এল না ওখান থেকে, কিটির উদ্বেগ বেড়ে গেল। অ্যাপাচিরা যদি ওরিনকে মারতে ব্যর্থ হয়ে থাকে? যদি ফিরে আসে সে, তার বানোয়াট কাহিনি ফাঁস হয়ে যায়? অবশ্যি কিটি থোড়াই পরোয়া করে তার। টুসানে সে তো আর থাকছে না। উঠতে-বসতে কিটির এখন একটা কামনা— ওরিন ওসমানের মৃত্যু।

ও জানে চরম বিপদেও ওসমানরা ধৈর্য হারায় না, কী এক অলৌকিক উপায়ে যেন নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে পরিস্থিতি। হঠাৎ, মন স্থির করে ফেলল সে।

টুসান ত্যাগ করবে। অবিলম্বে ফিরে যাবে পুবে। এই গরমে খামোকা অজ পাড়াগাঁয়ে বসে থাকার অর্থ হয় না, সনোরার ঘটনা জানতে পারবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। পুবে ওর সামান্য কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে, ফিরে গিয়ে ওখানেই বসবাস করবে। তবু তার আগে, ভাবল কিটি, একটা শেষ-চেষ্টা করবে সে।

শূ-ফ্লাই রেস্তোরাঁয় বসে এই সিদ্ধান্তে পৌছুল ও। কোয়ার্টয রক স্যালুনের গান ফাইটের কথা, আর সকলের মত, কিটিও জানে। ইতিমধ্যে লোগানদের বার কয়েক দেখেছে শহরে। ওরিন আর ট্যাম্পিকো রোকাকে যদি আবার দেখতে পায়, ওদের ভাগ্যে কী ঘটবে লোগানরা সেটা জাহির করে বেড়াচ্ছে। কিটিও শুনেছে।

হঠাৎ দোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল ক্যাপ্টেন জনসন, সঙ্গে লেফটেন্যান্ট জ্যাক ডেভিস। এই তরুণ লেফটেন্যান্টের সাথে একই স্টেজে করে কিটি টুসানে এসেছিল।

অফিসার দুজন সোজা ওর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। 'মিসেস ওসমান,' বলল ডেভিস, 'ইনি ক্যাপ্টেন জনসন।'

কিটির দীঘল নীল চোখজোড়া ক্যাপ্টেনের দিকে ঘুরল। শীতল দৃঢ়সংযত চেহারা। একনজরেই ও বুঝল এই লোককে ডেভিসের মত আঙুলের ইশারায় যেমন ইচ্ছে নাচানো যাবে না। 'কেমন আছেন, ক্যাপ্টেন,' বলল কিটি। 'বসবেন না?'

চেয়ার টেনে বসল দুই অফিসার, কফির ফরমাস দিল। 'আপনার আনন্দ মাটি করলাম, কিছু মনে করবেন না, মিসেস ওসমান,' বলল ক্যাপ্টেন জনসন। 'আচ্ছা, ওরিন ওসমান এখন কোথায় আছেন আপনি জানেন? উনি তো আপনার আত্মীয়।'

'আমার স্বামীর বড় ভাই,' বলল কিটি। 'এখানেই আমাদের প্রথম পরিচয়— এই ঘরে। ওর সাথে আরও কয়েকজন ছিল। না, আমি জানি না। বিপদ?'

ইতস্তত করল জনসন। 'হ্যাঁ এবং না,' শেষ-পর্যন্ত বলল সে। 'আমাদের

খবর উনি অ্যাপাচি এলাকায় গেছেন। সত্যি হয়ে থাকলে বিপদের আশঙ্কা আছে বৈকি।'

ভয় পাওয়ার ভান করল কিটি। ঠোঁট কাঁপাল বার দুয়েক। 'ও... ও মারা যায়নি তো? ওসমানরা খুব সাহসী, বেপরোয়া...' ইচ্ছে করেই কথাটা ঝুলিয়ে রাখল ও।

'আমরা কিছু শুনিনি,' জবাব দিল জনসন। 'খুব শিগগিরই অ্যাপাচিদের মূল ঘাঁটিতে হামলা করতে যাচ্ছি আমরা। এ-সময়ে বাইরের কেউ উটকো ঝামেলা বাধাক– তা চাই না।'

'আ... আমি কিছু জানি না। মি. ওসমানের খারাপ কিছু একটা হয়ে গেলে আমার স্বামী খুব আঘাত পাবেন।'

'মিসেস ওসমান, শুনলাম আপনি মি. ওসমানকে একটা ঘোড়া জোগাড় করে দিয়েছেন? সত্যি?'

'হ্যাঁ। ওর ঘোড়াটা মারা গিয়েছিল, আর একটা কিনতে পারছিল না। আমি একটু সাহায্য করেছি মাত্র।' হাসল কিটি। 'এ ছাড়া আমার আর কী করার ছিল, বলুন?'

জনসন সন্তুষ্ট হতে পারল না। মহিলার বক্তব্যে কোনও খুঁত পায়নি সে, তবু মন খচ খচ করতে লাগল। তা ছাড়া, ওরিনকে তার ভাল লেগেছে, চিন্তিত বোধ করছে ওর জন্যে।

পরে ডেভিসকে নিজের সন্দেহের কথা জানাল জনসন। 'কী বলছেন, ক্যাপ্টেন!' ডেভিস অবাক। 'কিটি ওসমান জানলে নিশ্চয়ই বলতেন আপনাকে। মিথ্যে বলে তাঁর লাভ?'

'কী জানি। কিন্তু মহিলা টুসানে কেন? তার নিকটজন কেউ নেই এখানে, আর এটা বেড়ানোর সময় না। মানে জায়গাটা ভাল, কিন্তু কিটি ওসমানের মত পুবের মহিলারা থাকতে চাইবে বলে মনে হয় না।'

ডেভিসেরও মনে হয়েছে কথাটা। টুসান ছোট্ট মরুশহর। ধুলো, গরম। কিটির দু-চারটে হালকা মন্তব্য থেকে যতটুকু বুঝেছে, ওর মত সম্ভ্রান্ত মহিলার কাছে এই জায়গা ভাল না লাগাই স্বাভাবিক। পথের ক্লান্তি দূর ক তে দু-একদিন থাকা চলে, কিন্তু এর মাঝে কয়েক হপ্তা কেটে গেছে– অথচ ওর নড়বার লক্ষণ নেই। এখানে ওর চেনাজানা লোক থাকলে সন্দেহের কিছু ছিল না, কিন্তু সে-রকম কেউ নেই, বা কারও সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টাও করেনি– সর্বদা একলাটি।

অন্যের ভাবনা নিয়ে কিটির বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। টুসান এবং এর অধিবাসীদের ওপর আর বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। সে এল প্যাসো হয়ে নিউ অরলিন্স যাবে, এবং তারপর পুবে। এখন ওরিন ওসমানের মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারলেই রওনা হয়।

কী করতে হবে কিটি তা ভালই জানে। তিন হপ্তা হলো ওরিন ওসমান মেক্সিকোয় গেছে, সম্ভবত আর বেঁচে নেই, তবু এই মুহূর্তে যে সনোরার ভেতর

দিয়ে উত্তরের পথে ফিরে আসছে না হলফ করে তা বলা যায় না। অতএব আর একটা কাজ করা বাকি আছে তার। অ্যাপাচি ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে আসলেও, ওরিন যেন টুসানে ফিরতে না পারে, সেটা পাকাপোক্ত করতে হবে। যেভাবেই হোক টম বা উলফ লোগানের সাথে কথা বলতে হবে তাকে।

শূ-ফ্লাইতে ওরা কৃচিৎ আসে। ওদের মত লোকদের খাওয়া-দাওয়ার আরও অনেক জায়গা আছে। গুণ্ডা কিসিমের লোকদের সাথে লোগান ভাইদের রাস্তায় ঘোরাফেরা করতে দেখেছে সে। বিভিন্ন সময়ে নানাজনের কথাবার্তা থেকে জেনেছে লোগানরা ঘোড়া কেনাবেচাও করে– ওদের কাছে এখন কয়েকটা ঘোড়া রয়েছে, বিক্রি করবে।

মামুলি আলাপের ছলে কথাটা মিসেস ওয়ালেনের কাছে পাড়ল ও। 'লোগান নামে এক লোক এসেছে শহরে,' বলল কিটি, 'ওর সাথে দেখা করব। শুনলাম একটা সোরেল গেল্ডিং আছে ওর কাছে– বেচবে।'

দোনোমনো করল মিসেস ওয়ালেন, কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল। 'ম্যাম, লোগানরা কোনও ভদ্রঘরের মেয়ের সাথে কথা বলার উপযুক্ত নয়। আমি বরং মি. ওয়ালেনকে বলব আলাপ করতে।'

'আমি নিজেই বলব,' ঠাণ্ডা গলায় কাটা কাটা জবাব দিল কিটি ওসমান। 'আমার বাবার অনেক কাঠখোট্টা কর্মচারী ছিল, তাদেরকে খাটিয়েছি– এদের কীভাবে চালাতে হয় আমি জানি। তা ছাড়া ঘোড়া কেনাবেচার অভিজ্ঞতা আছে আমার।'

'বেশ,' আড়ষ্ট স্বরে জবাব দিল মিসেস ওয়ালেন। 'আপনার যা মর্জি।'

মনে মনে হাসল কিটি। মিসেস ওয়ালেন সুনজরে দেখছে না তাকে। অবশ্যি অন্যের পছন্দ-অপছন্দকে সে মোটেও আমল দেয় না। খোদ স্যালুন মালিকের সাথে বাঁকা সুরে কথা বলতে পেরে একধরনের পুলক অনুভব করল ও। নিজেকে মিসেস ওয়ালেনের জায়গায় কল্পনা করে উপলব্ধি করল কেমন লাগছে তার।

চা পান শেষ করে উঠে দাঁড়াল কিটি, দস্তানা-আবৃত হাত দিয়ে স্কার্টের একদিক সামান্য উঁচু করে ধরে বেরিয়ে এল ফুটপাতে। খোলা ফার্নেসের হলকার মত বাইরের গরম ঝাপটা মারল ওর মুখে। এক মুহূর্ত থেমে রাস্তার ডানে-বাঁয়ে তাকাল ও, তারপর বাসার পথ ধরল।

সিঁড়ির ধাপে বসেছিল টম লোগান। কিটিকে আসতে দেখে গাত্রোত্থান করল সে। 'ওয়ালেন বলল,একটা ঘোড়া কেনার ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলতে চাও তুমি।'

কিটির মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল। বেয়াদপ লোক– একজন ভদ্রমহিলার সাথে কীভাবে কথা বলতে হয় জানে না। তবু অতিকষ্টে নিজেকে সংযত রাখল ও, এ-সময়ে মাথা গরম করা চলবে না– বড় স্বার্থের খাতিরে ছোটখাট ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

স্থির চোখে লোগানকে মাপল কিটি। 'ঘোড়া,' বলল ও, 'এবং আরও কিছু

ব্যাপারে। কাল সকালে সোরেলটা নিয়ে এসো, চড়ে দেখব আমি। যদি পছন্দ হয় কিনব।'

পরদিন সকালে ঘোড়ায় চেপে দুজন বেরোল একসাথে। সোরেলটা মোটামুটি ভালই, কিন্তু ঘোড়ার ব্যাপারে কিটির এতটুকু আগ্রহ ছিল না। একটা ঘন ক্যাকটাস ঝোপের ভেতর রাশ টানল ও, টম লোগান ওর পাশে এসে থামল।

কামুক চোখে তাকাল লোগান, ঠোঁটের কোণে ইঙ্গিতময় হাসি। 'তুমি ঠিক লোকের কাছেই এসেছ, মেয়ে। এখন ঘোড়া থেকে নেমে আমরা দুজন...'

কিটির হাতে দো-নলা ডেরিঞ্জার। 'এক পা-ও নড়বে না, লোগান,' বলল ও। 'তোমাকে এখানে এনেছি কথা বলব বলে। আমার নাম জানো?'

লোগান চেয়ে আছে, বিস্মিত তবে সতর্ক। 'না। ওয়ালেন লিভারি স্ট্যাবলে এসে বলল ওই বাসার স্বর্ণকেশী মহিলা কথা বলতে চায়। আমার বিশ্বাস শহরের সবাই তোমাকে তোমার ওই চুলের কারণে চেনে, ম্যাম।'

'আমি কিটি হার্স্ট ওসমান।'

আচমকা শক্ত হয়ে গেল ওর মুখ যেন গালের চামড়ায় টান পড়েছে। জায়গায় জমে গেছে। পুলকিত কিটি দিব্যি অনুভব করছে কী তোলপাড় চলছে লোগানের মনে। একে ও মহিলা, তায় হাতে পিস্তল। বিনা দ্বিধায় খুন করতে পারে ওকে। বলবে, সে আক্রমণ করেছিল, কেউ দোষ ধরবে না: কিন্তু যদি সে মারে, নির্ঘাত হত্যার দায়ে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে তাকে।

'ভয় পেয়ো না, লোগান, মারব না। আমি চাই আমার হয়ে আর একজনকে খুন করো তুমি– আমাদের দুজনেরই লাভ হবে এতে।'

'মানে?'

'এক লোক মেক্সিকোতে গেছে। হয়তো অ্যাপাচিরা মেরে ফেলেছে তাকে, তবু যদি বেঁচে গিয়ে থাকে, সে টুসানে আসার আগেই তুমি তাকে খুন করবে।'

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল লোগান। 'খুন আমি করেছি,' বলল, 'তবে লড়াইতে। ম্যাম, আমি পেশাদার খুনী নই।'

'লোকটা যদি ওরিন ওসমান হয় তাও না?'

চোখ পিটপিট করল লোগান। 'বুঝলাম না? একজন ওসমান হয়ে...?'

'আমি ওসমান নই, লোগান। ওটা ছিল একটা দুর্ঘটনা। আমার বাবাকে সাহায্য করার আশায় বিয়ে করেছিলাম একজনকে, অথচ শেষ-পর্যন্ত ওরা সবাই মিলে বাবার পেছনেই লাগে। যাক সে-সব কথা, ওরিন ওসমান ওদের বড়ভাই। আমি চাই তুমি ওকে খুন করো, লোগান।

'পঞ্চাশটা ডলার খরচা করলেই এ-শহরে ভাড়াটে খুনের অভাব হবে না, লোগান। বর্ডারেও পাওয়া যাবে অনেককে। তুমি যদি আমাকে প্রমাণ এনে দেখাতে পারো ওরিন ওসমান মারা গেছে– আমি তোমাকে দুশো ডলার দেব। কাজটা কে করল তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই, প্রমাণ পেলেই হলো।'

স্যাডল হর্নে হাত রাখল লোগান, গোঁফ চুষছে। ওসমান দক্ষিণে গেছে, ও

জানে, সঙ্গে বেন মারফি রয়েছে। মারফি তার মেক্সিক্যান বন্ধুদের বলে গেছে দু-চার হপ্তার মধ্যেই ফিরে আসবে সে।

টম লোগান কঠিন লোক। বদমেজাজি। টুসানে এসেছে ওর জাতশত্রু জেমস গ্রীনের খোঁজে। ট্যাম্পিকো রোকা সম্পর্কে কিছু না জেনেই ওকে খুন করতে চেয়েছিল কারণ রোকা গ্রীনের বন্ধু, এবং এর ফলে গ্রীন বদলা নিতে বেরিয়ে আসবে। চেনা দূরের কথা, ওরিন ওসমানের নাম পর্যন্ত শোনেনি সে। কিন্তু লড়াইয়ের পর, যাতে তার চরম পরাজয় ঘটেছে, মারা গেছে এক সঙ্গী, মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে আরেকজন, ওসমানদের ব্যাপারে অনেক কিছুই জেনেছে ও। ওরিনকে সে খুন করতে চায়, কিন্তু সামনাসামনি মোকাবেলায় পারবে সে-ভরসা নেই। অন্যদিকে, দুশো ডলারের প্রস্তাবটা লোভনীয়, ক্যাটল রেঞ্জে ছমাস হাড়ভাঙা খাটুনির রোজগার।

ধীরে-সুস্থে, পকেটে হাত ঢুকিয়ে মসলা বের করল ও, সিগারেট বানাল। হাবভাবে মনে হয় না কিটি ওসমানের আদৌ তাড়া আছে– টমও ব্যাপারটা ভাবতে চায় ভাল করে।

'তোমার কোনও অসুবিধে হবে না, লোগান,' ব্যাখ্যার ভঙ্গিতে বলল কিটি। 'আগে একবার মারামারি হয়েছে তোমাদের। এ-বার যদি আরেকটা হয় এবং তুমি ওকে খুন করো– কেউ প্রশ্ন তুলবে না।'

'আমার কাছে এলে কেন?'

'সেটাই স্বাভাবিক বলে। তোমাকে ধোলাই দিয়েছিল ও। তুমি ওকে পাল্টা মার দিতে চাও। এ-ক্ষেত্রে কারও কিছু সন্দেহের অবকাশ নেই।'

'টাকাটা কীভাবে পাব?'

'এখন একশো ডলার দেব। বাকিটা ওয়েলস-ফার্গো অফিসে জমা থাকবে। আমার নির্দেশ পেলেই তোমাকে দিয়ে দেবে ওরা।'

'আমাকে টাকা দিলে সন্দেহ জাগবে না লোকের মনে?'

'না। সবাই জানবে আমার জন্যে চারটে ঘোড়া ধরে আনতে গেছ তুমি। এল প্যাসোতে তুলে দেবে আমার হাতে।'

ভীষণ চোখে তাকিয়ে রইল টম লোগান। ডেরিঞ্জারটা এখনও রয়েছে ওর হাতে, এখন সে উপলব্ধি করছে প্রয়োজনে খুন করতে কুণ্ঠিত হবে না কিটি। তার অবশ্যি দরকার পড়বে না; তবু, মনে মনে স্বীকার করল লোগান, এই মেয়ে সাক্ষাৎ ডাইনী।

'যদি টাকা মেরে দেই?' হালকা চালে বলল ও।

কিটি হাসল। 'লোগান, নিউ মেক্সিকোর খাসমহাল দাঙ্গায় বাবার সাথে আমিও ছিলাম। সে-সময় অনেক বন্দুকবাজকে ভাড়া করেছিলাম আমরা। আগেই বলেছি, পঞ্চাশ ডলার দিলে বর্ডারে ভাড়াটে খুনীর অভাব হবে না। তুমি বেশি চালাকি করলে– আমি চারজন লোককে তোমার পেছনে লাগাব, লোগান।'

খিকখিক করে হাসল টম। 'না, এমনি বলছিলাম। ঠিক আছে, ম্যাম। করব

তোমার কাজ। আমিও চাই ওসমানকে খুন করতে, ভালই হলো– খরচাটা পুষিয়ে যাবে।'

ঘোড়া ছুটিয়ে শহরে ফিরে এল ওরা। কিটি সামনে, পেছনে লোগান। লিভারি স্ট্যাবলের সামনে সবাইকে শুনিয়ে কিটি বলল, 'সোরেলটা আমার পছন্দ হয়নি, লোগান। তবে আমাকে চারটে ঘোড়া জোগাড় করে দেবে তুমি– এল প্যাসোতে। এখন একশো ডলার দিচ্ছি, বাকিটা আমার নির্দেশ পেলে ওয়েলস-ফার্গো তোমাকে পরিশোধ করবে।'

আস্তাবলে ঘোড়া তুলে বাইরে এল টম লোগান। আরেকটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল, আয়েশ করে টান দিল একটা। এই টাকাটা কামাতে আনন্দ লাগবে তার। এদিক-ওদিক তাকাল টম, দেখল উলফ হেঁটে আসছে ওর দিকে। 'উলফ, কাজ পেয়েছি,' বলল টম, 'দারুণ কাজ।'

এগারো

ঘটনাবিহীন একটা রাত পাড়ি দিলাম আমরা। গোধূলির শেষ চিহ্নটুকু মুছে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কোয়েলের ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম আমি। মেক্সিকোর নীল কোয়েল, ওড়ার চাইতে মাটিতেই বিচরণ করে বেশি, একেক ঝাঁকে ত্রিশ-চল্লিশটা করে থাকে।

ছোট্ট ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে সবাই আরেক দফা গোটা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলাম। অ্যাপাচি রাজ্যে হামলা চালিয়ে আমরা ওদের বন্দী কেড়ে নিয়েছি, সুতরাং পিছু নেবে ওরা, প্রয়োজনে নরক অবধি ধাওয়া করবে।

ঘোড়াগুলোর বিশ্রাম দরকার। বিয়ান বাথানে দানাপানি আছে, জ্বালানি কাঠের অভাব নেই। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আপাতত কিছুদিন থাকব এখানে। আমি এতে আপত্তির কিছু পেলাম না। জীবনে কখনও এত সুন্দর দেশ দেখিনি আমি, কথাটা জানালাম নোরাকে।

'সত্যি সুন্দর,' একমত হলো নোরা। 'এবং শান্ত। আমার বিশ্বাসই হয় না এ-জায়গা ছেড়ে কেউ চলে যেতে পারে।'

'অ্যাপাচি। এ-দিককার সবকিছু ধ্বংস করেছে ওরা। বারবার মানুষ এখানে বসতি করেছে– কিন্তু টিকতে পারেনি।'

'আবার যখন রওনা হব,' বলে চললাম আমি, 'আর কোনও থামাথামি নেই।'

'ও এমন করল কেন, ওরিন?' নোরার আচমকা প্রশ্ন। 'তোমাকে খুন করে ওর কী লাভ?'

'কথাটা সত্যি, আমি এখনও নিশ্চিত নই।'

'অ্যান্ডি ওসমান নামে কেউ নেই, ওরিন। বুঝতে পারছ না তুমি? ও

তোমাকে ধাপ্পা দিয়েছে। যে-কজন বাচ্চা ছিল সবাইকেই আমরা উদ্ধার করেছি। ক্রীডের দুই ছেলে আর আমার বোন। হ্যারিকে চুরি করেছিল আরও আগে।'

অ্যান্ডির ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলেছে আমাকে। একটু খতিয়ে বিচার-বিবেচনা করা দরকার, কিন্তু নোরার বক্তব্যে আরেকটা কুইঙ্গিত মেলে: ওই নামে যদি কেউ না-ই থাকবে বিপদের মুখে আমাকে ঠেলে দিল কেন? নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু কামনা করেছিল কিটি। কথাটা সত্যি হয়ে থাকলে, ও কি এত অল্পে ক্ষান্ত হবে? যদি প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারি এখান থেকে, তখনও তো আরেকটা চেষ্টা করতে পারে?

জটিল সমস্যার মীমাংসা আমার মগজে কুলোয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিই। হাতে-কলমের কোনও কাজ বা লড়াই, আমি সহজেই সামলাতে পারি– কিন্তু মানুষ কেন অসৎ হয় তার সমাধান ভেবে পাই না।

'নোরা,' আমি বললাম, 'আমাকে খুন করতে চাওয়ার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে বুঝতে পারছি না। এতগুলো লোকের মৃত্যুর কারণ হয়ে ওর কী লাভ?'

'হয়তো তোমার ভাইয়ের ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়। ওসমান নামটাকেই ঘৃণা করে।'

কথাটা বিশ্বাস করতে মন উঠছে না, তবু একটা সত্যি কিছুতেই অস্বীকার করার জো নেই, এমন এক ছেলের খোঁজে মেক্সিকোতে আমাকে পাঠিয়েছে ও যার কোনও অস্তিত্ব নেই বাস্তবে।

অ্যাপাচিদের রগ আমার চেনা, তাই বুঝতে পারছি অ্যান্ডি ওসমানের অস্তিত্ব কাল্পনিক: অ্যাপাচিরা কখনও নিজেদের ভেতর লুকোচুরি খেলে না। ওদের কারও কাছে যদি একজন শ্বেতাঙ্গ বন্দীও থাকে, অন্যেরা জানে সে-খবর। কাজেই সন্দেহ নেই, জেনেশুনেই আমাকে মৃত্যুগুহায় পাঠানো হয়েছে।

ফিরে গিয়ে যে এর একটা বিহিত করব তাও সম্ভব নয়। টুসানে কিটি এখনও আছে বলে মনে হয় না– আর থাকলেও মুখের ওপর অস্বীকার করবে।

ও ভাল করেই জানে কোনও মহিলার গায়ে হাত তুলব না আমি। মেয়েদের সঙ্গে আমরা, ওসমানরা, ভদ্র ব্যবহার করি– এমনকী যখন ওরা তা পাওয়ার যোগ্য নয় তখনও।

আমি একা হলে তবু না হয় একে আমার ভাগ্য বলে মেনে নিতাম। কিন্তু ও আমার বন্ধুদেরকেও ফাঁসিয়েছে।

তিনটে দিন ওই পরিত্যক্ত বাথানে কাটালাম আমরা। শুধু যে বিশ্রাম তা নয়– ট্রেইল গোপন করাও আমাদের লক্ষ্য ছিল। পথে নামলেই ট্রেইল থাকবে, এবং অ্যাপাচিরা তার পূর্ণ সুযোগ নেবে। ওরা ভাববে আমরা সীমান্তের দিকে গিয়েছি। সুতরাং বিভিন্ন পথে ওরাও এগোবে সে-দিকে। সারা মুল্লুকে খবর পাঠাবে ধোঁয়ার সঙ্কেত দিয়ে। তাই ওদেরকে ধোঁকা দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা আত্মগোপন করে রইলাম।

চতুর্থ দিন ভোরে রওনা হলাম। সতর্ক চোখে খেয়াল রাখছি চারদিকে, রাইফেল আড়াআড়িভাবে স্যাডলের ওপর রাখা। একুশ মাইল পশ্চিমে ট্যাম্পিকো রোকার পরিচিত একটা বাথান, আমরা সেখানে যাচ্ছি। নিজেদের ট্র্যাক গোপন রাখার যথাসম্ভব চেষ্টা করছি, এড়িয়ে চলছি পাহাড়ি খাঁজগুলো।

তবু সাবধানের মার নেই। ঝড়ের বেগে এগোচ্ছি, পেছনের সাথে ব্যবধান যত বাড়ানো যায় ততই মঙ্গল।

রুক্ষ ঊষর অঞ্চল। স্বচোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। পানি কমে আসছে, কেবল যেখানে আছে নদী সেখানে দুই পাড়ে বিক্ষিপ্ত গাছপালা, বেশির ভাগ ক্যাকটাস। হরহামেশা অ্যান্টিলোপের দেখা পাচ্ছি, একবার মরুঅঞ্চলের কিছু বিগহর্ন চোখে পড়ল। এ-এলাকায় ওর চেয়ে ভাল মাংস আর হয় না, কিন্তু আমরা গুলি ছোঁড়ার সাহস পেলাম না।

বাথানটা বেশ বড়। খোলা প্রান্তরে ঝরনার পাড়ে অবস্থিত। ঝরনার ওপরে বাঁধ, এবং তার পেছনে বিরাট পুকুর। কটনউড এবং আরও নানাধরনের গাছে ঘেরা। মাঝখানে স্প্যানিশ ঢঙের বিশাল র‍্যাঞ্চ হাউস। মানুষ আছে।

একটু নিচু খাঁজের মাথায় রাশ টানলাম আমরা, অকোটিও ঝোপের আড়াল থেকে জরিপ করলাম গোটা এলাকাটা। আগেভাগে না জেনে অন্ধের মত কোথাও যেতে চাই না।

সুতোর মত ধোঁয়া উঠছে চিমনি থেকে, কপিকলে দড়ি টানার শব্দ ভেসে আসছে, কুয়োর পানি তুলছে কেউ একজন। খিড়কি পথে দুজন ভ্যাকুয়েরো বেরিয়ে গেল, ওদের গন্তব্য আমাদের দক্ষিণ-পশ্চিমের কোনও এক পাহাড়। নিতান্ত ঢিলেঢালাভাবে স্যাডলে বসেছে– ভাবখানা বিপদের সাথে কখনও পরিচয় ঘটেনি।

ঢাল বেয়ে নেমে এলাম আমরা, প্রথমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তারপর, সবজি খেতে পৌঁছে, একসারিতে।

'নজর রাখছে।' মাথা ঝাঁকিয়ে নিচু একটা টাওয়ার দেখাল রোকা। ফিল্ডগ্লাসে রোদের প্রতিফলন চোখে পড়ল আমাদের।

টাওয়ারে যে-ই থাকুক, নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছিল বাচ্চাদের, বোধ হয় বুঝেছিল আমাদের বিশ্বাস করা যায়, বিরাট কাঠের ফটক খুলে গেল, যদিও দেখতে পেলাম না কাউকে। কিন্তু আরেকটু এগোতে রাইফেলের কালো কালো নল চোখে পড়ল, আমাদের দিকে তাক করা।

আমরা ভেতরে ঢুকতে পেছনে বন্ধ হয়ে গেল ফটক। জনাছয়েক ভ্যাকুয়েরোর উপস্থিতি টের পাচ্ছি এখন। বারান্দায় দীর্ঘদেহী পক্বকেশ এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে। চেহারায় অভিজাত্য, ব্যক্তিত্বের ছাপ। দাঁতের ফাঁকে একটা ঢাউস অথচ চিকন কিউবান চুরুট।

অভ্যর্থনা জানাতে দুসিঁড়ি নেমে এলেন ভদ্রলোক, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিতে জরিপ করলেন। আমার বিশ্বাস আমরা কেউ মুখ খোলার আগেই পথশ্রমে ক্লান্ত ঘোড়া আর বাচ্চাদের দেখে যা বোঝার বোঝা হয়ে গেল তাঁর।

'বুয়েন্স ডায়াস, সিনরস,' বললেন বৃদ্ধ, তারপর ইংরেজিতে যোগ করলেন, 'বাছারা, এটাকে তোমরা নিজেদের বাড়ি বলে মনে করো।'

'সব জানার পর আপনি বোধহয় চাইবেন না আমরা থাকি,' বললাম আমি। 'অ্যাপাচিদের কাছ থেকে এই বাচ্চাদের ছিনিয়ে এনেছি আমরা। ওরা আসবে।'

'এর আগেও বিনা কারণে বহুবার এসেছে। তোমরা আমার মেহ্মান। আমি ডন লুই সিস্নেরস।'

'আমি ওরিন ওসমান,' বলে অন্যদের পরিচয় দিলাম তাঁকে।

হাসি মুখে কুশল বিনিময় করলেন তিনি, তারপর চোখ আমার দিকে ফিরল। 'তোমার নামটা পরিচিত,' বললেন ডন। 'আমার এক বন্ধুর নাতনীর সাথে এক ওসমানের বিয়ে হয়েছে।'

'আমার ছোট ভাই, ও'নীল। আলভার্দো পরিবারে বিয়ে করেছে।'

'ভেতরে এসো,' বললেন ডন। তারপর ঘরে গিয়ে যোগ করলেন, 'আলভার্দোদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব বহুদিনের। তোমার পরিবারের অনেক কথা আমি শুনেছি, অ্যামিগো। দাঙ্গার সময়ে তোমার ভাই আলভার্দোকে সমর্থন করেছিল।'

কয়েক ঘণ্টা বাদে, যখন নাওয়া-খাওয়া সারা হলো, আমরা ডনের সাথে আলোচনায় বসলাম। নিজের বাক্স খুলে সবাইকে কিউবান সিগার অফার করলেন তিনি। ধূমপানের নেশা আমার নেই, মাঝে মাঝে করি, যেমন এখন।

নোরা বাচ্চাদের নিয়ে ডনের মেয়েদের সাথে অন্দরমহলে গেছে।

'সামনের রাস্তা খুব ভয়ঙ্কর,' বললেন ডন লুই। 'ইচ্ছে করলে আমার দু-একজনকে নিতে পারো।'

'না। আপনার দরকার হবে ওদের। আমরা অ্যাদ্দূর যখন আসতে পেরেছি, আশা করি বাকিটুকুও পারব।' গরুর চামড়ায় আচ্ছাদিত বিরাট চেয়ারে বসে পুরো কাহিনি খুলে বললাম আমি। নীরবে শুনলেন তিনি। সব শোনার পর চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন:

'তোমার ভাইদের কিছু কিছু খবর আমি জানি। তুমি জানো না, নইলে এ-বিপদে পড়তে না। যে-মেয়েটার কথা বলছ, অ্যাঞ্জেলের সাথে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। ওর বাবা, জোনাথন হার্স্টই ছিল সব নষ্টের গোড়া। আলভার্দোকে ও-ই উৎখাত করতে চেয়েছিল। তোমার ভাই, ও'নীল রুখে দাঁড়ানোয় ওর পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। তারপর অ্যাঞ্জেল যখন জানল তার স্ত্রী এতে জড়িত, চলে এল ওর কাছ থেকে। ওসমান পরিবারের সবাইকে ঘৃণা করে কিটি। তোমাকে খুন করার মতলবেই ছিল ও, অ্যামিগো।'

একটা মেয়ের পক্ষে এতটা হিংস্র হওয়া অস্বাভাবিক, বিশেষ করে যে-মানুষের সঙ্গে তার কোনও শত্রুতা নেই, ক্ষতি করেনি কোনও, তবু সেই অসম্ভবকেই এখন সম্ভব বলে বিশ্বাস করতে হচ্ছে— পুরো পরিকল্পনা ছকে সাজানো, নিখুঁত। অথচ আমি এর প্রতিকার করব তার অস্ত্র নেই আমার হাতে।

প্রতিশোধ নেওয়ার সেরা উপায়, বোধ করি, প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া: সে-ক্ষেত্রে মাঠে মারা যাবে ওর চক্রান্ত।

চমৎকার ঘরোয়া পরিবেশ। কোলাহলের নামগন্ধ নেই। কিন্তু আমরা স্বস্তি পাচ্ছি না। আসন্ন বিপদের চিন্তায় সারা মন আচ্ছন্ন।

অ্যাপাচিদের মাঝে বাস করার সমস্যা কত, বৃদ্ধ ডন প্রাঞ্জল ভাষায় আমাদের ব্যাখ্যা করলেন। সীমান্তের উত্তরে পিট কিচেন যেমন টিকে আছে, তেমনি দক্ষিণে রয়েছেন তিনি। তাঁর নিজস্ব একটা ছোটখাট বাহিনী রয়েছে। পোড়-খাওয়া ভ্যাকুয়েরোদের দল, প্রত্যেকেই দুর্দান্ত লড়ুয়ে।

কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে তাঁর চোখ রোকার ওপর স্থির হলো। 'কখনও যদি চাকরি লাগে, সিনর,' বললেন ডন, 'সোজা এখানে চলে এসো। তোমার মত আমারও দুজন ভ্যাকুয়েরো ছোটবেলায় অ্যাপাচিদের মাঝে মানুষ হয়েছে।'

'সুন্দর জায়গা,' বলল রোকা। 'তেমন মনে করলে নিশ্চয়ই আসব।'

একসময় শোয়ার আয়োজন করতে বিদায় নিল আমার বন্ধুরা, ডনের সঙ্গে তাঁর স্টাডিতে বসে গল্প করতে লাগলাম আমি। ঘরে দেয়ালজোড়া শেলফ, থরে থরে বই সাজানো, চামড়ার মলাটে বাঁধাই। এত বই আমি ইতিপূর্বে কোনও বাসায় দেখিনি। ডন জানালেন কী ধরনের বইপত্র আছে তাঁর লাইব্রেরিতে।

'আমার পৃথিবী,' বললেন তিনি। 'অন্য কোথাও জন্ম নিলে আমি হয়তো পণ্ডিত হতাম। বাবার সাহায্য দরকার ছিল এখানে, তাই স্পেন থেকে চলে এলাম আমি। ভালই কাটে সময়। আমার ফসল বাড়ছে, অগুনতি গবাদি পশু। আমার ইচ্ছে অনুযায়ী কাগজের পাতায় শব্দ সাজাতে পারিনি, সত্যি– কিন্তু জীবনের বিস্তৃত পটে বহু কিছু লিখেছি।

'এতে আনন্দ আছে।' হাতের ইশারায় বাইরের মাঠ দেখালেন ডন। 'দোয়াত-কলমের বদলে আমি লাঙল আর উইনচেস্টার ব্যবহার করেছি। ডাকাবুকোর মত বেঁচে থাকায়, কোনও কিছু গড়ার মাঝে জীবনের আমেজ উপভোগ করা যায়।

'অ্যাপাচিদের মনোভাব কী আমি বুঝি। আমার মতই নিজেদের মাটিকে ওরা ভালবাসে। ওরা দেখছে অন্য এক জীবনধারা ওদের রীতিনীতিকে গ্রাস করছে। ওদের ভেতর যারা বুদ্ধিমান তারা জানে এই লড়াইয়ে তাদের জেতার আশা নেই। তবে ওদের ধ্বংসের মূল কারণ আমরা নই– সময়।

'সবকিছু বদলায়। দুর্বল প্রজাতি সবলকে জায়গা ছেড়ে দেয়। ওদের পৃথিবী শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যখন প্রথম এসেছিল তখন ওরাও ধ্বংস করেছে অন্যদের। একদিন আমাদেরকেও এভাবে সরে দাঁড়াতে হবে। এটাই দুনিয়ার নিয়ম; এখানে একটা কথাই শাশ্বত... সময়ে সব পাল্টে যায়।

'আমরা সবাই যে-যার কায়দায় এই পরিবর্তন রোখার চেষ্টা করি। এমনকী যারা নিজেদেরকে অত্যন্ত প্রগতিশীল বলে ভাবে, তারাও ভিন্ন ধরনের প্রগতিকে

বাধা দেয়। কারণ আমরা ভাবতে ভালবাসি আমাদের নিজেদের ধারাই সবচেয়ে উন্নত।

'এখানে আমি মান-সম্মানের সাথে আছি। আমি চাই এই বাথান টিকে থাকুক, কারণ এগুলো আমার নিজের হাতে গড়া— অথচ জানি তা হওয়ার নয়। এমনকী আমার বইগুলোও হয়তো অক্ষত থাকবে না, তবে ধ্যান-ধারণা রয়ে যাবে ঠিকই। একটা বই ধ্বংস করা সহজ, কিন্তু কোনও আদর্শ একবার শেকড় গাড়লে তাকে সমূলে বিনাশ করা যায় না।'

কথা থামিয়ে আমার দিকে তাকালেন ডন। 'তুমি বোধহয় এই বুড়োর কথায় বিরক্ত হচ্ছ, বাবা।'

'না-না, আপনি বলুন। আমি শিখছি। ডন লুই, জ্ঞানের ব্যাপারে আমাদের খুব আগ্রহ, যদিও শেখার সুযোগ বিশেষ পাইনি। দেশে জমিজমা যা ছিল তাতে নুন আনতে পান্তা ফুরোত। এই পশ্চিমে এসে তবু কিছুটা সচ্ছলতার মুখ দেখেছি।'

লজ্জারক্ত মুখে বৃদ্ধের দিকে তাকালাম। 'আমি সামান্য এক-আধটু পড়তে পারি। অর্থ বুঝতে কষ্ট হয়। নেকড়ে যেভাবে খরগোশ শিকার করে, অনেক সময়ে সেইভাবে মানে বুঝি। এই বইগুলো দেখে আমার বুক টনটন করছে, না জানি ওদের কতকিছু বলার ছিল আমাকে।'

সহসা অবসাদ ঘিরে ধরল আমাকে, উঠে পড়লাম। 'আমার বই আমার পাহাড় মরুভূমি,' বললাম আমি। 'আমার যা কিছু জ্ঞান সব ওদের দেয়া।'

উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ডন লুই, হাত বাড়ালেন। 'আমাদের প্রত্যেকেরই জ্ঞান আহরণের নিজস্ব কায়দা রয়েছে। আমার এক রকম, তোমার আরেক। এ-দুইয়ের যোগাযোগ ঘটাতে পারলে ভাল হত... শুভরাত্রি, সিনর।'

বাইরে এসে উঠোনে নামলাম আমি, বাতাসের গন্ধ নেব, উপভোগ করব রাতকে। অনতিদূরে, দেয়ালের কাছে একটা সিগারেটের আভা দেখতে পেলাম, হাতের মুঠিতে আড়াল করা।

'কেমন বুঝছ?' স্প্যানিশে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ভালই, সিনর।' অন্ধকারে দেয়ালের গায়ে সেঁটে সিগারেট খাচ্ছে ও, মাথা নুয়ে সুখটান দিল; ক্ষুদ্র আগুনটা উজ্জ্বল হয়ে মিইয়ে গেল আবার। 'আমরা একা নই, সিনর। বন্ধুরা এসে পড়েছে। বাইরে... অপেক্ষা করছে।'

তা হলে আমাদের হদিস জেনে ফেলেছে ওরা। এখন সনোরা অবধি রাস্তায় নরক ভেঙে পড়বে।

গোড়ালির ওপর ঘুরে বাসার ভেতরে ফিরে গেলাম আমি। বৃদ্ধ ডন তখন বেরিয়ে আসছেন স্টাডি থেকে।

'ঘোড়া দিতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'যা লাগবে নিয়ে যাও।'

'মাথা পিছু তিনটে করে হবে? এখন দাম দিতে পারব না, তবে—'

'দামের কথা ওঠে না,' বাধা দিলেন তিনি। 'তোমার ভাই এক অর্থে আমারও নাতনীজামাই। আলভার্দো আমার খুব কাছের মানুষ ছিল। ঘোড়া নিয়ে যাও।' চোখ কুঁচকে তাকালেন ডন। 'কী ভাবছ?'

'পাহারাদার বলল অ্যাপাচিরা এসে পড়েছে। আমার ধারণা ওর অনুমান ঠিক। তাই একটা ঝুঁকি নেব। থামব না কোথাও, ঘোড়া বদলে বদলে এগিয়ে যাব এক নাগাড়ে। এভাবে হয়তো হারাতে পারব ওদের।'

ডন লুই সিস্‌নেরস কাঁধ ঝাঁকালেন। 'হয়তো,' বললেন তিনি। 'ভোরে তৈরি থাকবে ঘোড়া।'

'এক ঘণ্টা আগে,' বললাম আমি। 'গ্রেসিয়াস।'

বারো

ঘোড়ার পিঠে জিন চাপানো ছিল, আমরা উঠে বাচ্চাদের সামনে তুলে নিলাম। দেয়ালে অবস্থান নিয়েছে ডনের লোকেরা, আমাদের কাভার দেবে। অস্থির হয়ে উঠেছে আমার ঘোড়া, আর এক মুহূর্ত থাকতে চাইছে না এখানে, আড়চোখে নোরার দিকে তাকালাম আমি। ম্লান আলোয় ঈষৎ পাণ্ডুর দেখাচ্ছে ওর মুখ, চোখজোড়া অস্বাভাবিকরকমের বড়। অনুমান করলাম আমাকেও ওইরকম দেখাচ্ছে।

'ওই লম্বা পাইনটা দেখছ,' বলে দূরের একটা গাছ দেখালাম আমি, 'সোজা ওইদিকে ছুটবে, জোরে। ওরা নিশ্চয়ই ওদের ঘোড়া পেছনে কোথাও রেখে এসেছে। আমাদের কপাল যদি ভাল হয়, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারব আমরা।'

ষোলোজন লোক প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে, গুলি ছোঁড়ার অপেক্ষায় রাইফেল প্রস্তুত। অন্যরা ফটকের কাছে রয়েছে, নির্দেশ পাওয়ামাত্র খুলে দেবে।

ডন লুই আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন, হাত বাড়ালেন করমর্দনের ভঙ্গিতে। 'ভায়া কন দাইওস, অ্যামিগো,' ধরা গলায় বললেন তিনি, তারপর ফটকের লোকদের উদ্দেশে হাত তুলতে ওরা হাট করে খুলে দিল পাল্লা।

দুরন্ত বেগে বেরিয়ে গেলাম আমরা, এবং একই সাথে গর্জে উঠল ষোলোটা রাইফেল। অ্যাপাচিদের উঁকিঝুঁকি দিতে দেখে নিশানা করেছিল কেউ কেউ, অন্যরা এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ল।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্রেইলে উঠলাম আমরা, বেন মারফি আর আমি পুরোভাগে। আমার ঠিক সামনেই ভূতের মত উদয় হলো এক অ্যাপাচি, আমি পিস্তল তুললাম, কিন্তু তার আগে লোকটাকে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারল স্ট্যালিয়ন, পড়ে গেল ও, একটা খুরের চাপে গুঁড়িয়ে গেল পাঁজরের হাড়। তারপর সামনে

এগোলাম, পেছনে অবিরাম গুলি বর্ষণ করছে ভ্যাকুয়েরোরা।

মাইলখানেক দূরে সেই লম্বা পাইন, ভোরের আলো আঁধারিতে ছুটছি জোর কদমে ওইদিকে। পেরিয়ে এলাম এক মাইল পথ, গাছের কাছাকাছি এসে শ্লথ করলাম গতি। চকিতে চারপাশে নজর বোলালাম আমি।

'কী অবস্থা? সবাই এসেছে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি সবার শেষে ছিলাম,' বলল গ্রীন। 'হ্যাঁ, এসেছে সবাই।'

'কারও কোনও চোট?'

'আমার কাঁধে,' বলল রোকা। 'মারাত্মক কিছু নয়।'

একতালে আরও কিছুদূর এগোলাম আমরা, তারপর আধমাইলের মত আবার ঝড়ের বেগে, ফের গতি কমিয়ে হাঁটার পর্যায়ে নামিয়ে আনলাম, তারপর আবার ছোটা।

দুপুর নাগাদ একটা ক্ষুদ্র নালার ধারে রাশ টানলাম। নালাটার উৎস একটা ঘাস-ছাওয়া বালিয়াড়ি। ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়ালাম ওখানে, স্যাডল বদলে এগিয়ে চললাম।

বেশ দ্রুত ছুটছি আমরা, অ্যামবুশের আশঙ্কা আছে এ-ধরনের জায়গা এড়িয়ে চলছি, ধুলোর মেঘ দেখার জন্যে চোখ সজাগ। ইন্ডিয়ান ছাড়াও খুনে-ডাকাতের কমতি নেই এ-অঞ্চলে। সরকারি সেনা রয়েছে, আমাদের উপস্থিতি ওদের পছন্দ হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এতকিছু ঘটছে অথচ বাচ্চারা দিব্যি নির্বিকার। কোনওরকম চিৎকার বা কান্নাকাটি করছে না। আর কিছু না হোক, অ্যাপাচিরা এই শিক্ষাটুকু দিয়েছে ওদের।

বিকেলের দিকে একটা পরিত্যক্ত পল্লীতে ঢুকলাম আমরা। বিশাল এক দালানের বিধ্বস্ত কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে এখনও। রোদে-পোড়া ইটের তৈরি। অর্ধসমাপ্ত গির্জা আছে একটা। সেচ নালায় পানি বইছে।

নরকঙ্কাল পড়ে আছে একটা বাড়ির কোণে। মেক্সিক্যান। জামাকাপড়ের কিছু অবশিষ্ট এখনও রয়েছে গায়ে, যুদ্ধাবস্থায় মারা গেছে। কঙ্কালের বাঁ-হাতটা ভাঙা, কনুইয়ের কাছে বাঁকা; ফলে ছোট দেখাচ্ছে স্বাভাবিক মাপের তুলনায়।

ট্যাম্পিকো কঙ্কালটা দেখল একনজর, তারপর চামড়ার হোলস্টারের দিকে তাকাল। একটা বড় অক্ষরের 'বি' খোদাই করা।

'বেনিটো, তা হলে এখানেই পটল তুলেছ তুমি,' বলে আমার দিকে ঘুরল রোকা। 'আমি চিনি ওকে। আউট ল ছিল, তবে সাহসী।'

কফি বানালাম আমরা। আগাছা পরিপূর্ণ শস্যখেতে আলু, ভুট্টা, আর পেঁয়াজ পাওয়া গেল। সুপ রাঁধলাম ওগুলোর সাথে গরুর জার্কি মিলিয়ে। তারপর দ্রুত আহার করলাম, তবে পেট পুরে।

খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত মুছে বেন তাকাল আমার দিকে। 'চলো, যাই,' বলল ও, 'এখানে কেমন যেন মৃত্যুপুরীর গন্ধ।'

ইতিমধ্যে জিনে উঠে বসেছিল জেমস গ্রীন, অপেক্ষা করছিল। আমরাও যে-

যার স্যাডলে উঠে রওনা হলাম, কাউকে বেশি খাটাব না বলে আবার তাজা ঘোড়া ব্যবহার করছি।

পড়ন্ত বেলা। গুমট আবহাওয়া। ধুলো উড়ছে না। সহসা দিগন্তের একদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল মারফি। নীলচে-ধূসর ধোঁয়া উঠছে এঁকেবেঁকে। পর্বতমালার পটভূমিতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকল। জায়গাটা আমাদের সামনে, পুবে। ওই প্রশ্নের অর্থ কী বুঝতে অসুবিধে হলো না, ধ্রুবতারা লক্ষ্য করে দ্রুত এগিয়ে চললাম আমরা।

মাঝরাতের দিকে গুটিকতক উইলো গাছের ফাঁকে ক্যাম্প করলাম। পাছে আমাদের অবস্থান টের পেয়ে যায় শত্রুপক্ষ এই ভয়ে আগুন জ্বালালাম না।

ভোরের সামান্য আগে ফের যাত্রা, একটা পরিত্যক্ত গ্রামকে ডানে রেখে এগিয়ে গেলাম আমরা।

'ট্রেস আলমোস,' বলল রোকা। তিন কটনউড... এ-এলাকায় এই নামে অনেক গ্রাম রয়েছে। কিছুক্ষণ পর আরেকটা গ্রাম পেরিয়ে এলাম, ইচ্ছে করেই ঢুকলাম না, ফালতু প্রশ্নে দেরি করিয়ে দেবে। তা ছাড়া, ওরা চাইবে না আমাদের কারণে অ্যাপাচিরা ওদের ওপর বিরূপ হোক। এই গাঁয়ের নাম সেনোকিপে– ফাঁপা গাছ।

নামগুলো বেশ, কানে সঙ্গীতের মূর্ছনা সৃষ্টি করে। স্যান্তা রোসালিয়া... সোল্ড্যাড... রেমেদিওস... সয়ওপা... নাকোরি... চিমালা... কিবুরি। ওকিতোয়া, বা বাজপাখির বাসা; বাতুকো, ওঅটর হোল; কুমুরিপা, ইঁদুরের গর্ত; ম্যাতাপে, লাল পাহাড়; এবং ব্যাকার্দে ওয়াত্যি, অর্থাৎ 'শ্বেত পাহাড়ে'। প্রথম যারা এসেছিল এ-অঞ্চলে তারা জায়গার বৈশিষ্ট্য অনুসারে সব নামকরণ করেছিল। সে-জন্যেই কোনও গ্রামের নাম কটনউড, কোনওটির উইলো, বা অকোটিও।

পুবের পাহাড়ে কমলা রঙের আলো ছড়িয়ে ভোর হলো। মরাটে আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল পাহাড়ি ঢালগুলো।

'লক্ষণ ভাল ঠেকছে না,' বিষণ্ণ সুরে বিড়বিড় করল রোকা। 'রক্তের মত লাগছে।'

পরবর্তী ঘণ্টায় তিনটে ধোঁয়ার প্রশ্ন গুনলাম... এবং একটা জবাব।

একটা ক্ষুদ্র ক্রীকের ধারে থেমে ঘোড়াদের পানি খাওয়ালাম আমরা, জিন বদল করলাম।

'বিপদ বুঝলে,' নোরাকে বললাম আমি, 'বাচ্চাদের নিয়ে তুমি সীমান্তের দিকে চলে যেও। হ্যারি ঘোড়া চালাতে পারবে, ওর কাছে একটা বাচ্চা দিও।'

স্যাডলের ওপর ঘুরল রোকা। 'অ্যাপাচিদের গন্ধ পাচ্ছি। অল্পক্ষণ আগে এ-পথে গেছে।'

মারফির গালে ভাঁজ পড়ল। 'খোয়াব দেখছ, বাছা। অতটা ঘ্রাণশক্তি মানুষের হয় না।'

'বলছি এখানে ছিল,' রোকা অটল। 'এবং আবার আসবে।'

আমরা এখন আরও উত্তরে চলে এসেছি। ঘাস খুব কম, অধিকাংশই ন্যাড়া বেলেপাহাড় আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মেটে রঙের পাথর, গায়ে সাদা স্ফটিকের ছোপ। দুপুর হতে ঘণ্টা দুয়েক বাকি আছে, অথচ আগুন ঢালছে সূর্য। থমথমে পরিবেশ; কোথাও কোনও জনপ্রাণীর আভাসমাত্র নেই। তাপতরঙ্গের নাচে মৃত্যুর বিভীষিকা।

আমার চামড়া কুঁচকে গেছে গরমে। বারবার রাইফেল নামিয়ে তালুর ঘাম মুছছি। বন্ধুদের মুখে ধুলোবালুর ওপর ঘামের বিচিত্র নকশা। শিরদাঁড়া বেয়ে ঘাম নামছিল, মৃদু বাতাসে শীত শীত করে উঠল। আমাদের বাঁচার আশা কতটুকু অনুমানের চেষ্টা করলাম আমি, মাথা কাজ করল না।

হঠাৎ মুখ খুলল জেমস গ্রীন।

'কদ্দিন বুনোহাঁসের ডাক শুনি না, আমার খুব লাল-সোনালি গাছের পাতা দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'উত্তরাঞ্চলে হয়,' বলল বেন মারফি। 'ওয়াইওমিংয়ে একবার দেখেছিলাম। অরিগন থেকে পুবে যাচ্ছিলাম গরুর পাল নিয়ে।'

নোরা আমার গা ঘেঁষে সরে এল। 'ওরিন,' মৃদু গলায় বলল ও, 'তোমার কি মনে হয়, আমরা পারব?'

কথা বলার মত মনের অবস্থা নেই আমার, এটা শোনার সময়। 'এখন পর্যন্ত ভাগ্য সহায় হয়েছে,' এড়িয়ে গেলাম জবাব।

আবার ঘোড়া বদলে ছুটতে শুরু করলাম আমরা– চারজন নিঃশঙ্ক অথচ নিঃসঙ্গ পুরুষ, একজন মেয়ে, সবে পা দিয়েছে যৌবনে, এবং চারটে বাচ্চা। মাথাপিছু তিনটে করে বাড়তি ঘোড়া আর একটা প্যাক হর্স– সব মিলিয়ে বেশ নির্ভরযোগ্য একটা দল।

সীমান্ত আরও অনেকটা পথ। মানচিত্রের মাথার দিকে চিকন একটা রেখা টানা, ওই সরু রেখার ওপরেই নির্ভর করছে আমাদের জীবন। এর উত্তরে সাহায্য পাওয়ার আশা আছে। এবং তারও উত্তরে নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

আমরা দুলকি চালে এগোচ্ছি। গায়ে ফোস্কা-পড়া গরম। তামাটে আকাশ, পুরোটাকেই মনে হচ্ছে একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড।

অ্যাপাচিরা আসবে, এটা একরকম নিশ্চিত। কয়েকজনকে ফাঁকি দিতে পারলেও সবাইকে সম্ভব নয়। ঘোড়ার প্রতি অ্যাপাচিদের এতটুকু মমতা নেই। প্রায়শ খাটিয়ে মেরে ফেলে, পরে ওদের মাংস খায়। দূর-আকাশে বাঙময় ধোঁয়ার কুণ্ডলী বলে দিচ্ছে আমাদের অবস্থান ওরা জানে।

অ্যাপাচিদের আমি ঘৃণা করি না। পরিস্থিতির ফেরে আজ আমরা পরস্পরের শত্রু; কিন্তু ওদের সাহস, কর্মদক্ষতার তুলনা হয় না– এই রুক্ষ প্রাণহীন এলাকায় টিকে আছে এটাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ধরতে পারলে আমাদের হত্যা করবে ওরা। নির্বিচারে নির্যাতন করবে সবাইকে। এ-জন্যে ওদের দোষ

দেয়া চলে না: এ ওদের জীবনের রীতি। যে-কোনও মানুষকে তার সময় আর জীবনযাপন পদ্ধতির মাপকাঠিতেই বিচার করতে হয়।

হন্টন গতিতে যাচ্ছি আমরা। খসখস আওয়াজ উঠছে স্যাডলের। চোখ পিটপিট করছি বারবার, লোনা ঘামে জ্বালা করছে। শার্টে তেলচিটে দাগ। শুধু ক্যান্টিনের পানি খেয়ে বেঁচে রয়েছি।

সামনে একটা ওঅটর হোল পড়বে। রোকা, মারফি আর আমি জায়গাটা চিনি। কাছাকাছি গিয়ে ছড়িয়ে পড়লাম আমরা, ট্র্যাকের খোঁজে তাকালাম এদিক-ওদিক, কিছুই চোখে পড়ল না। অদূরে কটনউড আর উইলো ঝোপ। পুবে, ওঅটর হোল থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে, একটা নিরেট পাথরের স্তূপ। আধ-মাইল উঁচু, চওড়া বড়জোর একশো গজ।

রাশ টেনে পাথরগুলো জরিপ করলাম আমি। 'এখানে যদি কেউ লুকিয়ে থাকে,' স্তূপ দেখিয়ে বললাম, 'ওঅটর হোলের ধারেকাছে আর যেতে হবে না। একদম সহজ নিশানা।'

'আমাদের পানি দরকার,' বলল মারফি।

ঘাড় ফিরিয়ে জায়গাটা আমি দেখলাম ভাল করে। খাঁজের একদিকে একটা পাথর-দ্বীপ, মূল পাহাড়ের সাথে এর কোনও সংযোগ নেই। 'তোমরা ওখানে গিয়ে দাঁড়াও, বললাম, 'আমি পানি ভরে আনছি। তোমরা কাভার দেবে।'

তিনটে ঘোড়াসহ আমি ওঅটর হোলের উদ্দেশে রওনা হলাম। উইলো ডালে বসে একটা মরু-কোকিল গান গাইছে। কটনউডের পাতায় মর্মর, সামান্য বাতাসেই এভাবে কাঁপে ওরা। আমি এগোতে কয়েকটা কোয়েল উড়ে পালাল, ঘোড়াগুলোর গতি বেড়ে গেল পানির গন্ধ পেয়ে।

কাছেপিঠে যদি অ্যাপাচিরা থাকেও, নিশ্চয়ই দেখেছে আমার বন্ধুরা রাইফেল হাতে অবস্থান নিয়েছে। বুঝবে সহজে ডাল গলবে না এখানে। তবু আমার গায়ের সব লোম দাঁড়িয়ে গেছে, একটা অতর্কিত গুলি এসে জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দিতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে।

একটুবাদে মাটিতে নামলাম আমি, ঘুরে ওঅটর হোলের অপর তীরে গিয়ে ক্যান্টিনে পানি ভরতে শুরু করলাম। আসার পথে প্রথম সুযোগে আশপাশের জমি পর্যবেক্ষণ করেছি। বন্য জীবজন্তুর ট্র্যাক রয়েছে, কোনও মানুষের চিহ্ন দেখতে পাইনি। অবশ্যি এতে আশ্বস্ত হওয়ার কিছু নেই। কোনও অ্যাপাচি যদি তার ধারেকাছে শ্বেতাঙ্গ লোকের উপস্থিতি টের পায়, পিপাসায় একেবারে মুমূর্ষু না হলে পানির কাছে যাবে না। কাছাকাছি কোথাও ওত পেতে অপেক্ষা করবে।

একে একে ক্যান্টিনগুলো ভরলাম আমি, নিজেও পানি খেলাম কয়েক আঁজলা, তারপর স্যাডলে চেপে ফিরে গিয়ে বাকি ঘোড়াদের নিয়ে এলাম।

নাক ডুবিয়ে পানি খাচ্ছে ঘোড়াগুলো, কোকিলের ডাক ভেসে আসছে ঝোপ থেকে– আমার গায়ে কাঁটা দিল। একটা ঝোপের পাশে কতগুলো হ্যাভেলিনার

ট্র্যাক চোখে পড়ল, শুয়েছিল। মরুভূমির বুনো শুয়োরকে হ্যাভেলিনা বলে।

শেষ ঘোড়াটা যখন নিজের গলকম্বল ভরে নিল, স্ট্যালিয়নের লাগাম গুছিয়ে আমি এক পা রেকাবে রাখলাম। উঠব, হঠাৎ চোখের কোণে একটা কিছু ধরা পড়তে, পমেল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়লাম মাটিতে।

গাছের পাতা ফুটো করল বুলেটটা। ঠিক আমার স্যাডলে ওঠার ক্ষণটিকেই বেছে নিয়েছিল আততায়ী। ভাগ্যিস রাইফেলের ব্যারেলে রোদের প্রতিফলন দেখে হুঁশিয়ার হয়েছিলাম, নইলে এতক্ষণে আমার খুলি উড়ে যেত।

এক হাঁটুতে ভর রেখে গুলি ছুঁড়লাম আমি, আমার বন্ধুরাও গুলি করছে, প্রতিধ্বনিতে তোলপাড় মুহূর্ত। চকিতে স্যাডলে উঠে পাহাড়ের উদ্দেশে তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম ঘোড়াগুলোকে। আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল বন্ধুরা, তারপর আবার ট্রেইলে।

'একজন,' বলল রোকা। 'এখনই ধোঁয়ার সঙ্কেত পাঠাবে।'

'দেখ, মরে গেছে হয়তো,' মন্তব্য করল বেন।

'দোয়া করো তাই যেন হয়।'

পেছনে তাকালাম আমরা, পরক্ষণে চোখে পড়ল সরু ধোঁয়ার রেখা, তবে কেউ কোনও মন্তব্য করলাম না। আপাতত হাঁটছে ঘোড়া– পরে ছোটার প্রয়োজন হতে পারে। পুরু নরম বালিয়াড়ি মাড়িয়ে যাচ্ছি আমরা, খুরের চাপে গর্ত সৃষ্টি হচ্ছে বালুতে, দেখে বোঝার উপায় নেই কীসের ট্র্যাক ওগুলো।

একটা সমতল মরুপ্রান্তর পেরিয়ে আবার পাহাড়ি রাজ্যে এসে পড়লাম। দুপাশে সমান্তরাল খাঁজ, ঢাল অংশত বালুতে ঢাকা, বাতাসে ভেসে এসেছে। খাঁজ থাকায় খানিকটা আড়াল পেলাম আমরা, গতি বাড়ালাম।

বাচ্চারা এখন ভীষণ ক্লান্ত। অবিরাম ছোটার ফলে এমনভাবে নেতিয়ে পড়েছে যে কেবল বিশ্রামের ইচ্ছে ছাড়া আর কোনও বোধশক্তি নেই। আমাদের দশা ওদের মতই, তবে এ-সব পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত বলে গায়ে মাখছি না কোনও কষ্ট, জানি সামনে আরও কঠিন বিপদ আসতে পারে।

নোরা আমার কাছে সরে এল, নীরবে কিছুক্ষণ পাশাপাশি ছুটলাম আমরা। হঠাৎ আমাদের ডানে, আধ-মাইল দূরে, একজন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেলাম। অ্যাপাচি, ব্যবধান কমানোর লক্ষণ নেই, আমাদের সমান্তরালে এগোচ্ছে। কয়েক মিনিট পর আরেকজন উদয় হলো, বাঁয়ে।

'জাল গুটাচ্ছে।' সিগার ধরাল গ্রীন, ধোঁয়ার জ্বলুনিতে চোখ কোঁচকাল। 'সামনেই কোথাও আটকাবে।'

রেকাবের ওপর দাঁড়াল ট্যাম্পিকো, চারদিক জরিপ করল। 'পশ্চিমে চলো,' বলল ও।

চকিতে ঘুরে ওইদিকে ছুটলাম আমরা, ক্রমাগত স্পারের গুঁতো মারছি ঘোড়ার পেটে। হঠাৎ সামনে একজন অ্যাপাচি পড়ল। হকচকিয়ে গেল ইন্ডিয়ানটা, তারপর উত্তর-পশ্চিমে হাওয়া হলো নিজের টাট্টু নিয়ে।

দুরন্ত বেগে পশ্চিমে এগোচ্ছি, যাতে আমাদের আচমকা দিক্-পরিবর্তনের সাথে সহজে তাল মেলাতে না পারে অ্যাপাচিরা। নাবাল জমিতে নেমে গেলাম আমরা, এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্ত কিছু অকোটিও আর মরাটে ঘাস, প্রায় মাইল খানেক আর অ্যাপাচিদের পাত্তা নেই, তারপর একটা অগভীর বালিয়াড়ি পেরিয়ে উঁচু সমভূমিতে উঠে এলাম। ডান দিকে জনাবারো অ্যাপাচি ঘোড়সওয়ার, সামনে কোনও এক জায়গায় আমাদের মুখোমুখি হবে। পেছনে আসছে একদল, বাঁয়ে দেখলাম আরেকটা দলকে।

ত্রস্ত চোখে সবকিছু লক্ষ করছিলাম আমি। কোণঠাসা হয়ে পড়েছি। 'ঠিক আছে,' আমি বললাম; 'আমরা ছুটব।'

এবং শুরু হলো ছোটা।

বেশ বুঝতে পারছি সবাই উপলব্ধি করছে কী ঘটবে এরপর। এতক্ষণ বারবার স্যাডল বদলেছি আমরা, ইন্ডিয়ানরা জানে, এ-বার তার সুযোগ দেবে না। তাড়া করবে আমাদের, দৌড় প্রতিযোগিতায় বুনো ঘোড়াকে ওরা যেভাবে ছোটায়। যদি থামি বন্দী হব, সুতরাং আমাদের ছুটতে হবে। আমরা কোথায় যাচ্ছি, আমার বিশ্বাস, তাও জানে ওরা।

অ্যাপাচিরা দারুণ চালাক, ধূর্ত– নেকড়ের মত। হঠাৎ সামনে এক ক্যানিয়নের প্রবেশপথ পড়ল। চওড়া কিন্তু অগভীর, অনেকটা পশ্চিম টেক্সাসের ক্যানিয়নগুলোর মত। দুপাশে খাড়া পাথুরে দেয়াল, কমপক্ষে চল্লিশ ফুট উঁচু। ওদের সাঁড়াশি আক্রমণে আমরা ফাঁদে পড়তে যাচ্ছি। নিশ্চয়ই কানা ক্যানিয়ন, সামনে বেরোনোর পথ নেই।

'আস্তে,' বললাম আমি, 'রোকা, যে করেই হোক ঢালের ওপর উঠতে হবে।'

গুলির শব্দ, মুখ থুবড়ে পড়ল আমাদের একটা ঘোড়া। খিস্তি করলাম আমি। এত ভাল জিনিসের অকাল মৃত্যু কেউই চায় না; তবে অ্যাপাচিরা খুশিই হবে, খোরাকের ভাবনা ভাবতে হবে না কিছু সময়ের জন্যে।

এখন ওরা পিছিয়ে পড়লেও প্রায় ক্যানিয়নের মুখে এসে পড়েছে। এই জায়গায় ক্যানিয়নটা চওড়ায় চারশো গজের ওপর। তলদেশে একটা শীর্ণ ঝরনা, পুবদিকে।

কপালগুণে আমরা আশ্রয়ের সন্ধান পেলাম– ওপরে, কিনারের কাছে একটা গর্ত, মূলত পাথরধসে মাটি বসে গেছে। রাশ টেনে জায়গাটা দেখালাম আমি। 'ওখানে চলো।'

'ওটা একটা ফাঁদ,' বলল রোকা। 'আমরা আর বেরোতে পারব না।'

'অন্তত মোকাবেলা তো করা যাবে,' ও-দিকে তাকিয়ে জবাব দিল গ্রীন। ঘোড়া ঘুরিয়ে ঢালের ওপরে রওনা হলো ও।

বাঁয়ে প্রায় পঞ্চাশ কদম এগোল, হাতে প্যাক হর্সের লাগাম, তারপর ডানে একটা ঢেউ-খেলানো ট্রেইল ধরল।

ইতিমধ্যে পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে ট্যাম্পিকো রোকা। আমি ওর পাশে গিয়ে বসলাম। 'তুমি যাও,' বললাম নোরাকে। 'একদম মাথায় হাঁটিয়ে পার করতে হবে ঘোড়া, তবু থেমো না।'

অহেতুক প্রশ্ন করার মেয়ে ও নয়। জানে কেন রোকা আর আমি বসেছি ওখানে, একটা মুহূর্ত অপচয় করল না। ওদিকে অর্ধেক পথ উঠে গেছে জেমস গ্রীন, এখন পদব্রজে যাচ্ছে ও, ভীতচকিত ঘোড়াগুলোকে পথ দেখাচ্ছে। ওর পাশে হ্যারি ব্রুক, সঙ্গে ক্রীডদের এক ছেলে। দুজনেই হালকা বলে, স্যাডলে বসে রয়েছে।

বেন মারফি রাইফেল হাতে দাঁড়িয়েছিল, নোরা ওকে পাশ কাটাতে বাকি ঘোড়াগুলো নিয়ে রওনা হলো। ট্রেইলে একসারিতে এগোচ্ছে ওরা, অনেকটা ঘোড়ার শোভাযাত্রার মত দেখাচ্ছে।

'ট্যাম্প,' বললাম আমি, 'ওদের বাঁয়ে একটা খাড়া ঢাল, দেখেছ, সম্ভবত একসময় নালা ছিল। ওটা আরও খাড়া, তবে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে।'

'বুয়েনো,' বলে চারপাশে নজর বোলাল ও। 'ভালই জমেছে দৌড়।'

এগিয়ে আসছে অ্যাপাচিরা– কম করে হলেও ত্রিশজন। আবার ঢালটার দিকে পলক ফেললাম আমি, কোথায় কী আছে না আছে খুঁটিয়ে দেখছি। যা মনে হয়েছিল গর্তটা তার চাইতে উঁচুতে। এখনই ওদের অনেক ছোট দেখাচ্ছে, আরও কিছু পথ যেতে হবে।

এক অ্যাপাচি আমাদের পেছন দিকে ওঠার চেষ্টা করছিল। কাঁধে উইনচেস্টারের কুঁদো ঠেকাল রোকা, নিশানা করল এক মুহূর্ত, তারপর টান দিল ট্রিগারে। কাত হয়ে গেল অ্যাপাচিটা, পড়ে যাচ্ছিল, কোনওমতে সামলে পিঠটান দিল।

অপেক্ষা করছি আমরা। ইন্ডিয়ানরা ছড়িয়ে পড়ছে। টার্গেট বেছে বেছে গুলি করলাম আমরা, তবে ঠাওর করতে পারলাম না লক্ষ্যভেদ হলো কি না। একসময় সব অ্যাপাচি নেমে গেল মাটিতে।

পিছিয়ে গেল রোকা, উবু হয়ে একটার পর একটা পাথর টপকাচ্ছে। ওর ভেতরের অ্যাপাচিটা ফের জেগে উঠেছে; ক্ষিপ্র সাহসী, অথচ আত্মবিশ্বাসী। ঝট করে দাঁড়াল একবার, গুলি করল পেছন ফিরে, তারপর আবার ছুটল।

দুহাতে আমার উইনচেস্টার আঁকড়ে ধরলাম আমি, ত্রিশ ফুট দূরের একটা ঝোপ আর পাথরের দিকে তাকালাম একবার, দৌড়ে গেলাম ঝোপটার উদ্দেশে। আমার সামনে ধুলো ওড়াল একটা বুলেট...আরেকটা পাথরে প্রতিহত হয়ে ক্রুদ্ধ গর্জন তুলে বেরিয়ে গেল কানের পাশ দিয়ে।

বারো ফুট বুকে হেঁটে এগিয়ে গেলাম আমি, ঝোপ পেরিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আবার, একটা পাথরচাঁইকে পাশ কাটাতেই পরিষ্কার দেখতে পেলাম ওদের। দ্রুত রাইফেল তাক করলাম। আমি যখন আড়াল ছেড়ে বেরোই, এক অ্যাপাচি সোজা আমার দিকে ছুটে আসছিল। থামার সুযোগ পেল না, আমি গুলি করলাম।

মোটে সত্তর গজ দূরে ছিল লোকটা, সরাসরি আমার দিকে মুখ করে, ব্যর্থ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ছুটন্ত অবস্থায় ওর বুক ভেদ করল বুলেট, টলমল পায়ে দুকদম এগোল আরও, তারপর ঢালের নুড়িপাথরের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল।

ওপরে, পানির নালায় পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি। ও-দিকে ছুটলাম আমি। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোচ্ছি, পাহাড়ি ছাগলের মত লাফিয়ে পড়ছি এ-পাথর থেকে ও-পাথরে। অবিরাম সীসে উড়ছে আমার চারপাশে। একবার ভারসাম্য হারিয়ে ফেললাম, শ্যাওলা-পড়া পাথরচাঁইয়ে আমার গোড়ালি পিছলে গেল, বালুর ওপর চিত হয়ে পড়লাম। চকিতে উঠেই গুলি করলাম আমি, এবং তখুনি টের পেলাম বুলেটের আঘাতে উড়ে গেল আমার টুপির একটা কোণ...লক্ষ্য নড়ে গেল।

যে-অ্যাপাচিকে দেখেছিলাম সে পালিয়েছে। একটু আগে খুন করলাম যাকে সে এখনও পড়ে আছে ধুলোয়।

হাঁপাচ্ছি কুকুরের মত জিভ বের করে, তবু ওঠার বিরাম নেই, একটু একটু করে টেনে তুলছি নিজেকে। মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছি ওদের চোখের আড়ালে।

হঠাৎ রোকাকে আমার ঠিক সামনে দেখতে পেলাম। কিছু বলার জন্যে ঘুরল ও, গুলি লাগল। এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল ওর বুক, নিতম্ব দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল রোকা, রক্তে ভিজে যাচ্ছে শার্ট।

রাইফেলটা হাত থেকে ছেড়ে দিল, পড়ে যাচ্ছিল টাল হারিয়ে, আমি ধরে ফেললাম ওকে।

আমাদের সামনে ভাঙাচোরা ঢাল, ষাট গজের মত, তারপর সেই ঈপ্সিত গর্ত।

পতন রোধ করার পরপরই রোকাকে কাঁধে তুলে নিয়েছি আমি, ডান হাতে ধরে আছি কলার। বাঁ-হাতে আমার উইনচেস্টার, নিচু হয়ে ওর রাইফেলের ট্রিগার গার্ডের ভেতর একটা আঙুল ঢোকালাম, তারপর উঠতে শুরু করলাম সোজা হয়ে।

আমার দম নিঃশেষিত প্রায়, কাঁধে রোকা, তার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসছে পেছন থেকে, ভীষণ হিমশিম খাচ্ছি উঠতে।

দৈব সহায়, কোনওমতে পেরিয়ে গেলাম ঢালটা, হুমড়ি খেয়ে পড়লাম গর্তের ভেতর। আমার কাঁধ থেকে রোকাকে নামাল কেউ একজন, দেখলাম একাধিক গুলি লেগেছে।

চারপাশে নজর বোলালাম আমি, শ্বাস নিচ্ছি হাঁ করে। সবাই রয়েছে—নোরা, বাচ্চা চারজন, মারফি, গ্রীন, এবং আমাদের ঘোড়া।

'আমরা ফাঁদে পড়েছি,' বলল জেমস্ গ্রীন। 'বেরোনোর রাস্তা নেই।'

তেরো

গর্তটা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সত্তর ফুট। আমরা যে-পথে এসেছি সেই ঢালটা এবড়োখেবড়ো, নুড়িপাথরে পরিপূর্ণ। বাকি তিনদিকের ঢাল খাড়া, সোজা নীচের বালুতে গিয়ে শেষ হয়েছে। ওখানে ছড়ানো-ছিটানো পাথর আর গুটিকতক ঝোপ। ওপরের দেয়াল ভীষণ খাড়া, একমাত্র কীট-পতঙ্গের পক্ষেই ওঠা সম্ভব, জায়গাভেদে আট থেকে ষোলো ফুট উঁচু।

নীচের ক্যানিয়নটা এখন আমাদের রাইফেলের আওতায়। এখানে বসে দুজন লোক অনায়াসে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে অ্যাপাচিদের। কিন্তু ওরা যদি ওপরের ওই মেসায় উঠতে পারে, আমাদের দশা হবে ডানা-ভাঙা পায়রার মত।

পাহাড়ের কিনারে চোখ বোলালাম আমি। ভাঙাচোরা, চেষ্টা করলে একজন লোক হয়তো ওপরে যেতে পারবে, কিন্তু ঘোড়ার পক্ষে ওঠা অসম্ভব।

রোকার ক্ষতস্থান পরিচর্যা করছে নোরা; যথাসম্ভব আরাম দেওয়ার চেষ্টা করছে ওকে, রক্তপাত বন্ধ করে এনেছে। কারও নির্দেশের অপেক্ষায় বসে নেই হ্যারি ব্রুক, গর্তের পেছন দিকে, রাইফেলের আওতার বাইরে, জড়ো করছে আমাদের ঘোড়াগুলো। গুটিসুটি মেরে এক জায়গায় বসেছে বাচ্চারা, চোখ ভয়ে বিস্ফারিত। কারও মুখে রা নেই, সবাই অনুভব করছে আমাদের অবস্থা সঙ্গিন। মাত্র দিন দুয়েক চলার মত পানি আছে আমাদের।

আস্তে আস্তে, উঠে দাঁড়ালাম আমি। মেসা দেখিয়ে বললাম, 'বেরোনোর পথ খুঁজতে যাচ্ছি।'

'ডানা লাগবে,' নোরার-দেয়া জ্বলন্ত সিগারেটটা দাঁতে চেপে বলল রোকা।

'বেন,' ডাকলাম আমি, 'তুমি আর গ্রীন ওদের ঠেকিয়ে রাখো– আমি দেখে আসছি।'

দেয়ালটা জরিপ করল ওরা। 'যা মনে হয় তার চেয়ে কঠিন চড়াই,' বলল বেন। 'তবু আমাদের কারও থাকা দরকার ওখানে।'

ঢাল বাইতে শুরু করলাম আমি, সহজে ওঠার জন্যে কোনাকুনি এগোচ্ছি। চড়াইয়ের গোড়ায় পৌঁছুতে ঝাড়া দশ মিনিট লাগল।

পাথুরে দেয়ালে একটা ফাটল, সেখানে এসে থামলাম আমি। নীচ থেকে দেখেছি এ-রকম আরও ফাটল রয়েছে এখানে। গোড়ায় এক ফুট চওড়া, ওপর দিকে তিন ফুটের মত। ফাটলের এখানে-সেখানে ভাঙা শিলাখণ্ড পড়ে মই সৃষ্টি করেছে। ঝাড়া হাত-পায়ে একজন মানুষ উঠতে পারবে, কিন্তু কোনও আহত লোককে বয়ে নেওয়া যাবে না। পাশ কাটালাম।

প্রথমে চোখে পড়ল একটা সিংহের ট্র্যাক, জাগুয়ারেরও হতে পারে। সনোরায় হরহামেশা এই জাতীয় বেড়াল দেখা যায়। মাঝে-মধ্যে অ্যারিযোনা বা ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলেও চোখে পড়ে।

দিন কয়েক আগের ট্র্যাক। অনুসরণ করলাম আমি। পথে যে-ফাটলই পড়ছে পর্যবেক্ষণ করছি। বেসিনের প্রায় উল্টো দিকে চলে এসেছি, হঠাৎ মিলিয়ে গেল ট্র্যাক।

মাথা খাটালাম, বেড়াল যত চতুরই হোক বাতাসে মিশে যেতে পারে না।

নীচের ক্যানিয়ন থেকে উঠে এসেছিল ও, ফিরে যায়নি নিশ্চয়ই। শেষ দুজোড়া ট্র্যাকের পেছনের পা দুটো একটু বেশিমাত্রায় দেবে গিয়েছিল মাটিতে, সম্ভবত লাফ দিয়েছিল বেড়ালটা। ওপরে একটা পাথর রয়েছে, মনে হয় ওখানেই নেমেছিল। এখন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে পাহাড় সেখানে খাড়া ও মসৃণ। ছয় ফুট ওপরে কিনারা, ভাঙা, ফাটলের ভেতর অসংখ্য ছোট ছোট পাথর।

হাজার লাফ দিলেও, নাগাল পাব না কিনারা, আরেকটা ছোট পাথরের ওপর দাঁড়াতে বড় পাথরটায় আঁচড়ের দাগ চোখে পড়ল। বেড়ালটা বহুকাল ধরে নিয়মিত ব্যবহার করে ওই ট্রেইল।

নাগালের ভেতর দুটো গর্ত পেয়ে ওখানে পা রেখে পাথর-চাঁইয়ে উঠলাম আমি। এখানেও ফাটল, মেসায় গিয়ে শেষ হয়েছে। একটুবাদে মেসার মাথায় পৌঁছে গেলাম, যোজনবিস্তৃত। এখানে-সেখানে ঘাস আর বিক্ষিপ্ত আগাছা। বেড়ালের ট্র্যাক উত্তরপশ্চিমে হারিয়ে গেছে।

গর্তটা দেখা যায় না এখান থেকে, ক্যানিয়নের অপর প্রান্ত আর নীচের কিছু অংশ চোখে পড়ছে। অ্যাপাচিদের ছায়াটি নেই কোথাও, বোধ করি ওরাও দেখতে পাচ্ছে না আমায়।

পিছিয়ে ফাটলের ধারে গেলাম আমি। জরিপ করলাম ওটা। খাড়া চড়াই, কিন্তু এর চেয়ে দুরারোহ পথে ঘোড়া তুলেছি আমি। কোনওমতে যদি পাথরচাঁইয়ে পৌঁছুতে পারি...

একটু একটু করে নেমে আসছিলাম যাতে অ্যাপাচিদের চোখে ধরা না পড়ি, রাইফেলের গর্জন শুনলাম নীচে। ঘাবড়ালাম না আমি। ওই ঢাল বেয়ে ওপরে আসার উৎসাহ দেখাবে না কোনও অ্যাপাচি; ওরা অত বোকা নয়। সম্ভবত আমাদের পরখ করতে উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল কেউ, বেন অথবা গ্রীন তাকে জানান দিল আমরা জেগে রয়েছি।

এখন আমাকে এই ফাঁদ থেকে বেরোনোর একটা উপায় ঠাউরাতে হবে। দায়িত্বটা আমারই। নোরা বাচ্চাদের কথা না হয় বাদ, অন্যরা আমার বন্ধু বলেই সঙ্গে এসেছে, জানত আমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে।

কাজে লাগাতে হবে ওই পাথরটাকে। ফাটল আছে, তবে গভীর নয়। আরও ভাল করে দেখতে এগিয়ে গেলাম আমি। একদিক ফাটা এবং ভাঙা, খুঁড়তে শুরু করলাম, অন্তত দুটো ঘোড়া ওপরে তোলার মত একটা রাস্তা তৈরি করতে চাইছি।

ফাটলের ভেতর থেকে বেশ কিছু পাথরখণ্ড টেনে বের করলাম প্রথমে, পঞ্চাশ-ষাট পাউন্ড ওজন একেকটার। সাবধান করলাম নীচের লোকজনকে, তারপর গড়িয়ে দিলাম ওগুলো। পরবর্তী একটা ঘণ্টা ওই কাজে ব্যয় করলাম আমি।

অ্যাপাচিরা আমাদের বিরুদ্ধে কোনওরকম তৎপরতা না চালানোয় আমার আশা বেড়ে গেছে। মেসায় ওঠার চেষ্টা করেনি কেউ; এই অঞ্চল যখন ওদের পরিচিত, বোধহয় জানে কয়েক মাইলের ভেতর এমন কোনও পথ নেই যেখান দিয়ে পালানো সম্ভব।

মাঝে মাঝে গুলির শব্দ হচ্ছে নীচে, অ্যাপাচিরা উত্তর দিচ্ছে কখনও কখনও। আমাকে এখানে দেখতে পাচ্ছে না ওরা, কী করছি তাও বুঝতে পারছে না। জানে বাইরে থেকে কোনওরকম সাহায্য পাব না আমি: নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষা করছে আমাদের গর্দান নেওয়ার আশায়। কিন্তু আমি সহজে ধরা দেওয়ার বান্দা নই– আমাকে মারতে চাইলে ওদেরকেও মরতে হবে।

যে-ফাটলটা খুঁড়ছি, তার একপাশে বড় শিলাখণ্ড রয়েছে একটা। আট ফুট লম্বা, ওজন কমপক্ষে এক টন। গর্তটা আরেকটু গভীর হতে দেখলাম পাথরটা আলগা, মূল পাহাড়ের সাথে সংযোগ নেই।

তলদেশে সামান্য কিছু আলগা পাথর ছিল। আমি নেমে গিয়ে খসিয়ে ফেললাম সেগুলো। আমার মাথায় এখন একটা পরিকল্পনা এসেছে, ভাবছি কাজে লাগাব। এ-রকম মরিয়া পরিস্থিতিতে মানুষ অনেক উদ্ভট চেষ্টাই করে। আটকা পড়েছি আমরা, নীচে অ্যাপাচিরা ওত পেতেছে। আপাতত চলার মত পানি আছে আমাদের, গোলাবারুদ যা আছে তাতে ওদের অনেকক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব, কিন্তু বেরোতে পারব না এখান থেকে।

রোদে আমার পিঠ পুড়ে যাচ্ছে, ঘামে ভিজে উঠেছে শার্ট। তবে আমি খাটিয়ে লোক, কাজে ফাঁকি দেই না কখনও। আমরা ওসমানরা সবাই একরোখা, হাল ছাড়ি না।

অবশেষে গর্তটা যখন বেশ চওড়া হলো ওপরে উঠে গেলাম আমি। ফাটলের মাথায় এসে পিঠ ঠেকালাম একদিকে, পা শিলাখণ্ডে, ধনুকের মত বাঁকা হয়ে আছে হাঁটু। তারপর দুহাতে পেছনের পাথরটাকে জাপটে ধরে ঠেলতে শুরু করলাম।

ঘাম দেখা দিল আমার মুখে, স্রোতের মত গড়াতে লাগল দরদর করে। কিছুই ঘটল না– কিস্যু না। অল্পক্ষণ জিরিয়ে ফের চেষ্টা করলাম। তৃতীয়বারের চেষ্টায় যখন মনে হলো একটু নড়াতে পেরেছি, দ্বিগুণ উৎসাহে ধাক্কা দিলাম আবার।

ছোট ছোট নুড়ি গড়িয়ে পড়ল নীচের গর্তে। গ্রীন সাহায্য করতে ওপরে উঠে এল।

ঢাল, শিলাখণ্ডের অবস্থান জরিপ করে এপাশ-ওপাশ ঘাড় নাড়ল ও।

'পারবে বলে তো মনে হয় না– আর হলেই-বা, তারপর কী করবে?'

'আমাদের দিন ঘনিয়েছে,' বললাম আমি, 'কিন্তু বিনা যুদ্ধে হার মানব না। ভাবছি মেয়েটার কথা– বাচ্চাদের নিয়ে ওকে একটা পালানোর সুযোগ করে দেব।'

গোড়ালিতে ভর রেখে বসল গ্রীন, আমার দিকে তাকাল। 'কীভাবে?'

'ওই বাদামি রঙের ঘোড়াটা তেজী। পাহাড়ি মাসট্যাং। আমার ধারণা দরকার হলে ও গাছেও চড়তে পারবে। নোরার ঘোড়াটাও ভাল। দুটোই ছোট, জোরে ছুটতে পারে। ওদের পিঠে চাপিয়ে বাচ্চাসহ নোরাকে পার করে দেব। চাই কী, আমাদেরও হিল্লে হয়ে যেতে পারে একটা।'

আবার খুঁটিয়ে দেখল গ্রীন। পাথরের চাঙড়টা খসিয়ে ফেলতে পারলে, অসমান একটা পথ তৈরি হবে। দুজন শক্তিশালী লোক যদি লাগাম ধরে, একটা ঘোড়া তুলে আনা হয়তো অসম্ভব হবে না। এবং সে-ক্ষেত্রে ক্ষীণ একটা আশা আছে আমাদের। মেসার মাথায় থাকবে একটা ঘোড়া, ওর পমেলে দড়ি পেঁচিয়ে তুলে আনব অন্যটাকে।

ফাটলে নেমে শক্ত হয়ে দাঁড়াল গ্রীন, তারপর পিঠ ঠেকাল চাঙড়ে। দুজনে মিলে ধাক্কা দিলাম আমরা, জোর বাড়াচ্ছি। সহসা খসে গেল পাথরটা, গড়িয়ে খানিকদূর গিয়ে আটকে গেল আরেক জায়গায়। নেমে গিয়ে আবার চেষ্টা করলাম আমরা। সামান্য একটু নড়েই স্থির হয়ে গেল। এবং এরপর বহু পরিশ্রমেও আর কোনও ফলোদয় হলো না।

ফিরে এসে পরিস্থিতি বিচার করলাম আমরা। ফাটলের দিকে ঠায় তাকিয়ে রইল জেমস। আগের চেয়ে অনেক চওড়া হয়েছে, খাড়াভাবে নেমে গেছে নীচের নুড়ি-বিছানো ঢালে।

জেমস ফাটলটা দেখল একবার, তারপর ফের আমার দিকে ফিরল। 'চেষ্টা করব আরেকবার?' জিজ্ঞেস করল ও।

দোটানায় পড়লাম। অসম্ভব খাড়া, অথচ এটাই আমাদের একমাত্র রাস্তা। খাড়া ঢাল বেয়ে অনেক বুনো ঘোড়াকে উঠতে দেখেছি আমি, তবে সেগুলোর একটাও এ-রকম বিপজ্জনক ছিল না– অবশ্যি একটু হাত লাগালে...

নীচের গর্তে অপেক্ষমাণ সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেলাম আমরা। ক্যান্টিনে দীর্ঘ একটা চুমুক দিলাম আমি। তারপর, কোথায় ছিলাম দেখার জন্যে যখন তাকালাম ওপর পানে, আমার মাথা ঘুরে উঠল। স্রেফ একজোড়া ডানা দরকার আমাদের।

ইতিমধ্যে রোকার জন্যে ছোটখাট তাঁবুমত খাটানো হয়েছে। দুটো পাথরের ওপর পঞ্চো মেলে দিয়েছে, মাঝখানে খুঁটির কাজ করছে একটা লাঠি। ওর পাশে গিয়ে বসলাম আমি। 'খারাপ চোট, অ্যামিগো,' বলল রোকা।

'সেরে উঠবে।'

ওপরে, মেসার দিকে তাকাল ও। 'তোমার মতলবটা কী?'

'ওটাই একমাত্র পথ। আমরা থাকছি, মেয়েটার সাথে বাচ্চাদের পার করে দেব। নোরার সাহস আছে, এখান থেকে একবার বেরোতে পারলে ঠিক পৌঁছে যাবে সীমান্তের ও-পারে।'

'ডন লুইয়ের বাথানের কথা ভুলতে পারছি না,' বলল রোকা। 'কী সুন্দর জায়গা।'

'সত্যিই।'

'মরার জন্যে ওর চেয়ে ভাল জায়গা বোধ হয় আর হয় না। আমার বিশ্বাস স্বর্গ দেখতে অবিকল ওইরকম।'

পলক তুলল ও। 'কখন নামবে কাজে?'

'রাতে।'

চোখ মুদল রোকা। 'ইস্, আমি যদি সাহায্য করতে পারতাম।'

নোরা আসতে ওকে আমার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করলাম আমি। বাচ্চাদেরসহ ওকে এখান থেকে পার করার চেষ্টা করব আমরা; যদি পারি, ও সীমান্তের উদ্দেশে ছুটবে। সন্ধ্যে, অথবা ভোরের দিকে পথ চলবে শুধু। দিনের বাকি সময়টুকু লুকিয়ে থাকবে কোথাও।

অবান্তর কোনও প্রশ্ন করল না ও। জানে কী ঘটতে যাচ্ছে এখানে– কেবল দৈবই এখন রক্ষা করতে পারে আমাদের।

'ফিরে গিয়ে,' ওকে বললাম আমি, 'যদি পারো, মোরায় ও'নীল ওসমানকে চিঠি দিও একটা। সব জানাবে ওকে, বলবে কীভাবে আমাকে ফাঁসিয়েছিল কিটি।'

'লিখব,' মৃদু গলায় বলল ও। 'আমি নিজেই যাব কিটির কাছে।'

'যেও না! বিষাক্ত।'

মেসায় উঠতে কোনও কষ্টই হলো না ওদের। তরতর করে বাচ্চারা উঠে গেল ওপরে, চড়ুই পাখির মত। গ্রীন নীচে পাহারায় রইল, বেন আর আমি ঘোড়া তোলার দায়িত্ব নিলাম।

মেটে রঙের ঘোড়াটা চটপটে। সামান্য চেষ্টাতেই নুড়ি-বিছানো ঢালের মাথায় উঠে পড়ল আমার সাথে। কিন্তু যখন আরেকবার তাকালাম ফাটলটার দিকে, সংশয় জাগল আমার মনে।

চেনা পথ, লাগাম ধরে ঘোড়া টেনে নিয়ে যাচ্ছি আমি, পেছনে বেন। ফাটলের মুখে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল মাসট্যাং, আর এগোতে রাজি নয়।

ওর ঠিক পেছনে ছিল বেন, মাথা থেকে নিজের সমব্রেরোটা খুলে ঘোড়ার পাছায় আঘাত করল, চমকে উঠল মাদি ঘোড়াটা, দীর্ঘ এক লাফ দিল, কী ঘটেছে আঁচ পাওয়ার আগেই ফাটলের ওপর পড়ল ওর সামনের দুই পা, ঢাল আঁকড়ে ধরার প্রয়াস পেল পেছনের পায়ে।

আমি লাগাম টান দিলাম। ফের হ্যাট দিয়ে বাড়ি মারল বেন, ফাটলে উঠে এল ঘোড়াটা। দম নিতে ওখানে আমরা দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ।

এখন সন্ধ্যে। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। দিগন্তের যে-অংশে সূর্য ডুবে গেছে, সেখানে আকাশ এখনও পাণ্ডুর নীল। তবে মাথার ওপর গুটিকতক তারা ফুটেছে। লাগাম হাতে একটা পাথরে বসে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ফুসফুস ভরে নিলাম আমি।

হঠাৎ মাসট্যাংয়ের, বোধ হয়, মনে হলো খাড়া ঢালে এভাবে দাঁড়ানো নিরাপদ নয়, স্বেচ্ছায় কয়েক কদম ওপরে উঠে আবার থামল। আমরা বাদ সাধলাম না। চুড়ো আরও দূরে।

শরীর একটু ধাতস্থ হতে ফের শুরু করলাম আমরা, বহু কসরতের পর পৌঁছুলাম মাথায়। ইতিমধ্যে গাঢ় অন্ধকার নেমেছে, অথচ দ্বিতীয় ঘোড়াটা তোলা বাকি।

গ্রীন একা রয়েছে নীচে। রোকা সাহায্য করার অবস্থায় নেই, হয়তো ঘুমোচ্ছে। রাতে অ্যাপাচিরা আক্রমণ করে না, কিন্তু যদি ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করে– একলা ওদের বাধা দিতে পারবে না গ্রীন।

ঘোড়া আর বাচ্চাদের পাহারায় নোরাকে রেখে, বেন আর আমি বেসিনের পথ ধরলাম। নীচে পৌঁছুতে পৌঁছুতে কাহিল হয়ে পড়লাম আমরা, ধপ্ করে বসলাম মাটিতে।

গ্রীনের চোখে এ-যাবৎ বিপক্ষের কোনওরকম তৎপরতা ধরা পড়েনি। রোকা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। প্রচুর রক্ত হারিয়েছে ও, আমাদের কাছেও এমন জিনিস নেই যে ওর ক্ষত পরিচর্যা করব। ওপরের মেসায় হয়তো ভেষজ লতাগুল্ম রয়েছে, কিন্তু এখানে সে-রকম কিছু নেই।

বালুতে ছোটখাট গর্ত খুঁড়ে সেখানে ঘুমোল বেন। আমি গ্রীনের জায়গায় বসতে সেও শুয়ে পড়ল।

মৌন মরু-রাত। আকাশে জ্বলজ্বলে তারা। নীচের ক্যানিয়ন থেকে শীতল ভাব উঠে আসছে। অবসাদে ঘুমে ঢুলছি আমি, কিন্তু কান খাড়া। এ-সময়ে মুহূর্তের ঘুম আমাদের সবার কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে। কেবল সহজাত সতর্কতা আর আমার প্রতি ওদের আস্থার জোরে জেগে রইলাম।

অনেকক্ষণ পর বেন আমার কাছে এল। 'তুমি এইবেলা একটু ঘুমিয়ে নাও,' বলল ও; 'ওই ঘোড়াটা তোলার পর আবার তো যে কি সেই হবে।'

চেষ্টা করতে হলো না, শুয়ে চোখ মুদতেই আষ্টেপৃষ্ঠে আমাকে বেঁধে ফেলল ঘুম; নিদ্রা ভঙ্গ হলো কাঁধে একটা আলতো স্পর্শে।

'ওরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে নীচে,' বলল মারফি। 'আরেকটু পর আলো ফুটবে।'

'তোমরা দুজন ঠেকাও, আমি ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছি ওপরে,' বলে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

'একা? পারবে না।'

'পারতেই হবে,' বললাম আমি। 'বেশি দেরি করলে বুঝে ফেলবে

অ্যাপাচিরা। হয়তো এরই মধ্যে টের পেয়ে গেছে।'

জেমস প্রস্তুত; কোমরে গানবেল্ট, হাতে উইনচেস্টার, বাড়তি কার্তুজ বেল্টটা কাঁধের ওপর ফেলে রেখেছে।

'বেশি অসুবিধে হলে রোকাকে এনে বসিয়ে দিও,' বললাম আমি। 'আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব।'

ঘোড়াগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করল ও। 'ওদেরকে নীচের দিকে তাড়িয়ে দিলে কেমন হয়? একসাথে ওদের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়বে; এ-দিক থেকে গুলি করব আমরা?'

আইডিয়াটা মন্দ নয়, তবু তাড়াহুড়ো করতে বারণ করলাম। এখনও তার সময় হয়নি। ওদেরকে ওখানে রেখে দ্বিতীয় ঘোড়াটার কাছে গেলাম, ঢালের উদ্দেশে রওনা হলাম ওকে নিয়ে। অবাক কাণ্ড, নোরার মাসট্যাং অত্যন্ত হালকাভাবে নিল ব্যাপারটা। এতটুকু আপত্তি দেখাল না। বোধ করি আগের ঘোড়ার গন্ধ পেয়ে বুঝে থাকবে ওটাও গেছে এ-পথে। কিংবা হয়তো নোরার গায়ের গন্ধ পাচ্ছে। ট্রেইল অনুসরণে বুনো ঘোড়া অনেক সময় নেকড়েকেও হার মানায়– বহুবার স্বচোখে দেখেছি আমি। তা ছাড়া ইতিপূর্বে একটা ঘোড়া ওঠায় পথও বেশ সহজ হয়েছে।

প্রায় গোধূলির মুখে মেসায় পৌঁছুলাম আমি। এবং তখুনি গুলির আওয়াজ পেলাম। নীচে কেউ একজন উইনচেস্টার ব্যবহার করছে।

পরপর কয়েকবার রাইফেলের গর্জন তারপর, মুহূর্তে বিরতি দিয়ে, আর একটা।

বাচ্চাদের চোখে আতঙ্ক, যদিও সাহস হারায়নি; বিপদ আজ নতুন নয় ওদের কাছে। নোরা স্যাডলে চাপল, আমি ওর হাত ধরলাম।

'যাও,' বললাম আমি। 'রাতে চলবে, দিনে লুকিয়ে থাকবে,' মনে করিয়ে দিলাম আবার। 'যতক্ষণ না নাগালের মধ্যে পাচ্ছ, গুলি করবে না। আর যখন করবে, মারার উদ্দেশ্যেই করবে। দোয়া করি যেন ভালয় ভালয় পৌঁছাও, আমরা ওদের দিন দুয়েক ঠেকিয়ে রাখতে পারব।'

আমার হাতে হাত রাখল নোরা। 'ওরিন, আমার হয়ে ওদেরকে তুমি ধন্যবাদ জানিও। কেমন? জানাবে তো?'

'জানাব।'

তুমুল গোলাগুলি হচ্ছে নীচে। আমাকে এখন ওদের প্রয়োজন। অ্যাপাচিরা কীভাবে চড়াই ভাঙে আমি জানি। চকিতে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায় ছায়ার মত। নিশানা করার অবকাশ মেলে না। মাত্র এখানে, পরক্ষণে আর এক জায়গায়।

নোরার অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা আছে এ-ব্যাপারে। ঘোড়া ঘোরাল ও, বিদায় জানাল এক আঙুল কপালে ছুঁয়ে, বাচ্চাদের নিয়ে এগিয়ে গেল আসন্ন ভোরের আলোর ভেতর।

আর একটিবার পেছন ফিরে ওদের দেখলাম আমি, তারপর নামতে

লাগলাম ঢাল গড়িয়ে। দূর-নীচে ফুটকির মত দেখাচ্ছে ইন্ডিয়ানদের।

গ্রীন পাহাড়ের কিনারে, পাথরের আড়ালে উবু হয়ে শুয়ে আছে। থাক থাক পাথর সাজিয়ে একটা চলনসই দেয়াল তুলছে বেন। মরণপণ লড়াইয়ের প্রস্তুতি। এ-ক্ষেত্রে আমরা একটু সুবিধেজনক অবস্থানে রয়েছি, গর্তের পাড়গুলো উঁচু।

হঠাৎ একটা পাথরের পেছন থেকে উদয় হলো এক অ্যাপাচি, সামনে পা বাড়াচ্ছিল, অনেকটা যন্ত্রচালিতের মত ওর দিকে ঘুরল আমার রাইফেল, দ্রুত তাক করেই গুলি করলাম।

ঢালের বেশ ওপরে এবং মেসার ঠিক তলায় রয়েছি আমি, ফলে নীচে কী আছে দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট। প্রায় তিনশো গজ নীচে ছিল ওই অ্যাপাচি, পূর্ণবেগে বুলেট আঘাত হানল ওর বুকে।

থমকে গেল ও, গ্রীনের দুটো সীসে হজম করল, তারপর যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই লুটিয়ে পড়ল হাত-পা ছড়িয়ে।

একঝাঁক গুলি উড়ে এল আমার দিকে, তবে একটাও বিঁধল না গায়ে, পঞ্চাশ ফুট নীচে শেষ হয়ে গেল ওগুলোর দৌড়। ঠিক করলাম আমি আপাতত আর নড়ব না এখান থেকে।

থমথমে নীরবতা নেমে এসেছে। ধীর লয়ে বয়ে যাচ্ছে বিকেল।

বেন ঘোড়া এমন জায়গায় জড়ো করেছে যেন সব সময় রোকার কাছাকাছি থাকে ওগুলো। দিনে হামলা চালিয়ে সুবিধে করতে পারবে না অ্যাপাচিরা। এদিকে, আমার চিন্তার বিরাম নেই।

বুদ্ধি আঁটার ব্যাপারে আমার বাবার তুলনা ছিল না। আমাকে সর্বদা বলতেন বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে। 'এই যে আজ এত উন্নতি,' বলতেন তিনি, 'এর মূলে তার চিন্তাশক্তি। মানুষের কোনওদিনই হরিণের গতি বা গ্রিজলির থাবা ছিল না—যা কিছু করেছে বুদ্ধিকে পুঁজি করে।'

এ-মুহূর্তে অচলাবস্থা সৃষ্টি হলেও, আখেরে এতে লাভ অ্যাপাচিদেরই হবে। ঘাস, পানি ওদের নাগালের মধ্যে।

আর অপেক্ষা করবে না অ্যাপাচিরা, আমি নিশ্চিত। যদিও কষ্ট হবে, তবু ঘোড়া ছাড়াই মেসায় উঠতে পারবে ওরা। কাল ভোর নাগাদ পৌঁছে যাবে এখানে। তখনও যদি আমরা ওই গর্তে থাকি, ফাঁদে-পড়া পাখির মত পটল তুলব।

সুতরাং পালাতে হবে, এবং অবিলম্বে। মানুষ অমর নয়, তাই বলে কেউ মরতে চায় না যেচে।

ঢালে বসে চারদিক জরিপ শুরু করলাম আমি। সব ঘোড়া মেসায় তোলা যাবে না। অধিকাংশই বড় আর ভারি। চেষ্টা করলে হয়তো বড়জোর গোটা দুয়েক নেওয়া যাবে।

আমাকে ধরে আমরা চারজন। তার মধ্যে একজন আহত। গেলবারের মত

দুটো ঘোড়ায় কাজ হবে না। অতএব ও-চিন্তা বাদ। নীচের ক্যানিয়ন হয়ে বেরোতে হবে, অর্থাৎ অ্যাপাচি বেষ্টনী ভেদ করে।

ডান দিকের ঢালে পুরু বালুর স্তর, পাথর আগাছা প্রায় নেই। ম্লান আলোয় যতটুকু সম্ভব, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঢালটা পর্যবেক্ষণ করলাম আমি।

কোনওভাবে যদি পৌঁছুতে পারি ওখানে, হয়তো এ-যাত্রা রেহাই পেয়ে যাব। নামতে শুরু করলাম, পরামর্শ করব বন্ধুদের সাথে। বাঁ-চোখের কোণে আচমকা দেখতে পেলাম এক অ্যাপাচিকে, আলো-আঁধারির সুযোগে উঠে আসছিল। আমি রাইফেল ঘোরাতে লুকিয়ে গেল।

অপেক্ষা করছি... মট্ শব্দে ডাল ভাঙল একটা... রাইফেল তাক করলাম শব্দের উৎসস্থল বরাবর... তারপর অ্যাপাচিটা আড়াল ছেড়ে বেরোতেই গুলি করলাম। ও একটু নড়ল না পর্যন্ত।

চোদ্দ

আমি গড়িয়ে গর্তে নেমে আসতে বেন তাকাল আমার দিকে। 'আমি হলে থামতাম না,' বলল ও। 'যা অবস্থা, তাতে মনে হয় না বেরোতে পারব।'

'একটা উপায় আছে,' বললাম আমি।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল ও। 'হুম্, তোমরা ওসমানরা এ-ব্যাপারে ওস্তাদ। শুনেছি যখনই তোমাদের কেউ বিপদে পড়ে অন্যরা ছুটে আসে। এ-ক্ষেত্রেও বোধ হয় তাই হবে?'

'আমি কোথায় আছি ওরা জানে না।'

পাইপে তামাক ঠাসছিল জেমস। ক্লান্ত বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। এখনও রোকার দিকে তাকানোর সাহস অর্জন করতে পারিনি আমি। 'উপায়টা কী?' প্রশ্ন করল গ্রীন। 'এখন যা বলবে, তাই করব?'

'ডান দিকে,' বললাম আমি, 'কোণের ওই ঢালে পাথর বিশেষ নেই। সামান্য কিছু ঘাস, তাও ছোট ছোট। পুরোটাই একরকম বালু।'

'তাতে কী?'

'রাতে স্যাডলে চাপব আমরা। বাদবাকি ঘোড়া খেদিয়ে দেব অ্যাপাচি ক্যাম্পের দিকে। ওদের ভিড়ে আমরাও ঢুকে যাব– পার্থক্য শুধু আমরা পালাব পাশ কাটিয়ে।'

গ্রীন চিন্তামগ্ন হলো। বেন চোখ তুলল। 'শেষ-পর্যন্ত কজন সফল হবে বলে মনে করো?' জিজ্ঞেস করল ও।

'একজনও হতে পারে... আবার নাও হতে পারে।'

কাঁধ ঝাঁকাল গ্রীন। 'মন্দের ভাল– আমি রাজি।'

'রোকা?' বেন প্রশ্ন করল।

'ওর অবস্থা কেমন? এখানে থাকলে বাঁচতে পারবে?'

'না।'

'তা হলে আর কোনও কিন্তু নেই। ওকে একটা স্যাডলে উঠিয়ে দেব আমরা। দেখবে, ও ঠিকই বসে থাকবে– আমি জানি।'

'বেশ, বলল গ্রীন। 'কী করতে বলো এখন?'

'সেরা ঘোড়াটাকে বেছে নাও। প্যাক হর্সগুলোও নেব। কপালে থাকলে ওরাও আসবে আমাদের সাথে।'

খেতে বসলাম আমরা। গরুর জার্কি চিবুতে চিবুতে নানা কোণ থেকে বিচার করলাম পরিকল্পনাটা, লাভ হলো না, ভাগ্যই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা।

সময় বয়ে যাচ্ছে। তবু তাড়াহুড়ো করছি না। অ্যাপাচিরা আমাদের পরিকল্পনা টের পেয়ে গেলে সব মাঠেমারা যাবে। স্যাডল চাপানোর কাজকর্ম অন্ধকারে সারতে হবে। এখন খোদার কাছে একটাই প্রার্থনা, রাত নামার আগে ওদের কেউ যেন ওপরে উঠে না আসে।

ট্যাম্পিকো রোকা চোখ মেলে শুয়েছিল। ওর পাশে বসলাম আমি। 'বলতে হবে না,' বলল ও, 'তোমার কথা শুনতে পেয়েছি।'

'পারবে না বসতে?'

'একবার শুধু উঠিয়ে দাও। আর দুটো শটগান দেবে।'

'পাবে।'

এরপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম আমরা। ভয়ঙ্কর গরম, বসে থেকেও ঘামছি। বারবার পানি খাচ্ছি আমরা, এটা-ওটা খাওয়ার কমতি নেই... আবার আহারের সুযোগ আদৌ পাব কি না কে জানে!

একসময় রাইফেল হাতে মেসায় উঠলাম আমি। অ্যাপাচিদের এ-রকম ধারণা দিতে হবে যে ওরা বাগে পেয়েছে আমাদের। এখানে বসে দুটোকে খতম করেছি আমি, ফলে ওরাও ধরে নেবে আমি এখানেই থাকব।

নীচ থেকে মেসায় ওঠার পথে কোনও আড়াল নেই। এক রাতে ছাড়া আসতে পারবে না কোনও লোক। অ্যাপাচি ক্যাম্প থেকে কেউ বেরোলে আমার চোখে পড়তে বাধ্য।

ক্যাম্পটা রাইফেলের আওতার বাইরে। চুলোয় রান্না চাপিয়েছে ওরা, আশপাশে ঘোরাঘুরি করছে। মন্থর গতিতে এগোলে বোধ হয় সবার অগোচরে ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছুনো যাবে, তারপর একসাথে সব ঘোড়া তাড়িয়ে দেব ওদের দিকে। চাই কী, অ্যাপাচি টাট্টুগুলোও এ-সময়ে ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে পারে। তবে আমি কোনও ব্যাপারেই এতটা আশাবাদী নই।

যখন সম্পূর্ণ অন্ধকার নামল মেসা থেকে নেমে এলাম। কফি তৈরির উদ্দেশ্যে ছোট করে আগুন ধরালাম আমরা। প্রতিপক্ষ যেন আমাদের এখানে থাকা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয় আমরা তাই চাইছি– অবশ্যি পালানোর কথা ভাবছি

এটা ওদের মাথায় না খেলাই স্বাভাবিক। ওরা জানে আমরা কোণঠাসা।

এক কান খোলা রেখে কফি প্যানে বসলাম আমরা। রোকার ঘোড়ায় স্যাডল চাপানো হয়েছে, একজোড়া পাথরের আড়ালে অপেক্ষা করছে ওটা।

গুম মেরে বসেছিল জেমস গ্রীন, আচমকা বাড়ির কথা বলতে শুরু করল। নিউ ইংল্যান্ডে ওর দেশ, ভদ্রঘরের সন্তান। সমাজে ওর পরিচিতি ছিল, ছোটখাট ব্যবসা করত একটা। এক মেয়ের সাথে ভাব হয়। আরেকটি ছেলে ভালবাসত ওই মেয়েকে। একদিন সে গ্রীনকে খুন করবে বলে শাসাল। এবং সামনাসামনি গানফাইটে মারা পড়ল জেমসের হাতে।

বিচারে বেকসুর খালাস পায় গ্রীন। জেল থেকে বেরিয়ে দেখল সবাই ওকে এড়িয়ে চলছে, এমনকী সেই মেয়েটার বাসাতেও আদর নেই আগের মত। তখন ব্যবসা বেচে দিয়ে চলে এসেছে পশ্চিমে। নানাধরনের কাজকর্ম করেছে। ডেপুটি মার্শাল হয়েছিল কিছুদিনের জন্যে। শাইয়েনদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।

'মেয়েটার কী হলো?' বেন জানতে চাইল।

পলক তুলল জেমস। 'আর কী, বিয়ে করেছিল একজনকে। লোকটা ছিল পাঁড় মাতাল। একদিন নেশার ঘোরে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যায়, কিন্তু ওর পা রেকাবে আটকে থাকায় ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে– সকালে বিকৃত অবস্থায় লাশ আবিষ্কার করে লোকজন।

'চিঠিতে আমাকে সব ঘটনা জানিয়ে মেয়েটা ফিরে আসতে চেয়েছিল। মজার ব্যাপার কী জানো, অনেক চেষ্টা করেও ওর চেহারা মনে করতে পারিনি আমি।'

'ছবি ছিল না?'

'ছিল একটা। শাইয়েনদের সাথে লড়াইয়ের সময় হারিয়ে গেছে।' একটুক্ষণ চুপ থেকে আবার খেই ধরল জেমস। এখন ওর কণ্ঠস্বর স্বগতোক্তির মত শোনাচ্ছে, যেন দূর থেকে কথা বলছে। 'দেশের বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করছে আমার– আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে মন চাইছে।'

'আমি ভেবেছিলাম কেউ নেই তোমার,' বললাম আমি।

'আছে– এক বোন, দুই ভাই।' কফিতে চুমুক দিল ও। 'এক ভাই ব্যাঙ্কার, বস্টনে থাকে। অন্যজন শিক্ষক। ব্যবসায় ঢুকলেও, আমার ইচ্ছে কিন্তু ছিল শিক্ষক হওয়ার; অথচ যখন সুযোগ এল, দেখলাম পিস্তলেই আমার হাত বেশি পাকা।'

নীরবে কফি পান করছে সবাই। একটুবাদে জেমস আমার দিকে ফিরল। 'আচ্ছা, নিউ ইংল্যান্ডে তোমার কেউ ছিল কখনও? বিপ্লবের সময়ে এক ওসমান মেইন অঞ্চলে বেশ নাম করেছিল। আহত অবস্থায় একটা শীত কাটিয়েছিল আমার দাদুর বাসায়।'

'ছিল। আমার দাদু। ডিয়ারবর্নের সাথে সারাটোগায় ছিলেন।'

'বোধহয় উনিই।' কাপ নামিয়ে রেখে পাইপে তামাক ভরতে লাগল গ্রীন।

চারদিকে নজর বুলিয়ে ফিরে এল বেন। 'সব ঠাণ্ডা,' বলল, 'কেবল একটা

আগুন জ্বলছে।'

নিঃসাড়ে স্যাডল চাপালাম আমরা। অবশিষ্ট খাবার, মালপত্র আগেই তোলা হয়েছে প্যাক হর্সের পিঠে। তারা-জ্বলা আকাশ। নীরব রাত। আসন্ন যাত্রার জন্যে রোকাকে প্রস্তুত করছে অন্যরা, জখমগুলোতে পট্টি বাঁধছে ভাল করে। এই ফাঁকে হামাগুড়ি দিয়ে কিনারে গেলাম আমি, নামার জায়গাটা আরেক নজর দেখব।

শক্ত জমি। আলগা বালু নেই।

সরু একফালি জায়গা, অন্য সময়ে হয়তো আমল দিতাম না, কিন্তু এই মরিয়া পরিস্থিতিতে সামনে যা পাব তাই সম্বল করতে হবে। অ্যাপাচিরাও হয়তো-বা দেখেছে এটা, এবং অপেক্ষা করছে নীচে। একমাত্র এ-পথেই দ্রুতগতিতে পাহাড় থেকে নামা সম্ভব। তবে আমরা নীচ থেকে দেখতে পাইনি, মেসায় ওঠার পরেই চোখে পড়েছে শুধু।

কিনারে জমায়েত হলাম আমরা, আলগা ঘোড়াগুলো সামনে, বেন আর আমি সামাল দিচ্ছি। ট্যাম্পিকো রোকা স্যাডলে বসে, পাশে জেমস গ্রীন, আমাদের ঘোড়া দুটো ধরে রেখেছে।

মাঝরাতের দিকে ঘোড়াগুলোর বাঁধন কেটে দিয়ে স্যাডলে চাপলাম। 'ঠিক আছে,' বললাম আমি, 'এবার তা হলে চলো।'

এগোলাম আমরা। যথাসাধ্য চেষ্টা করছি শব্দ না করার। আমার শিরদাঁড়া ঋজু। শক্তমুঠিতে পিস্তলের বাঁট চেপে ধরলাম। এ-সময় ক্ষিপ্রতা দরকার--রাইফেলে সুবিধে হবে না।

সামনের ঘোড়াগুলো অদৃশ্য হলো কিনার পেরিয়ে, নীচে নামছে। যখন এক-তৃতীয়াংশ দূরত্ব অতিক্রম করল ওরা, একটা বিকট চিৎকার দিয়ে আমরা প্রত্যেকেই একবার করে গুলি ছুঁড়লাম।

ভয়-চমকিত ঘোড়াগুলো ছুটতে শুরু করল দিশেহারার মত, বর্ষার ঢলের মত আছড়ে পড়ল নীচের সমভূমিতে। ঠাস্ শব্দে একটা রাইফেল গর্জে উঠল, চিৎকার করল কেউ একজন, তারপর দপ্ করে জ্বলে উঠল আগুন। আলোর জন্যে আগুনের ব্যবস্থা রেখেছিল অ্যাপাচিরা, লেলিহান শিখায় তাই এখন আলোকিত করে তুলেছে ভয়াল দৃশ্যপটকে।

কালো স্ট্যালিয়নের পিঠে উবু হয়ে আছি আমি, তীরবেগে ছুটছি, হাতে পিস্তল নিচু করে ধরা, বিপদ মোকাবেলায় তৈরি। বাতাস ঝাপটা মারছে মুখে, ছত্রভঙ্গ ঘোড়াগুলো ঢুকে পড়ল অ্যাপাচি ক্যাম্পের ভেতরে।

আমার বাঁয়ে অবিরাম গর্জাচ্ছে রোকার পিস্তল। আচমকা একটা হিংস্র অ্যাপাচি মুখ বেরিয়ে এল অন্ধকার ফুঁড়ে, গুলি করল রোকা। আঁধারে ডুব দিল মুখটা। কাছেই কোথাও হ্রেষারব করল একটা ঘোড়া, গ্রীনের ক্রুদ্ধ ধমক শুনতে পেলাম আমি, ওর ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে গেছে পেছনের দুই পায়ে, গ্রীন ছিটকে পড়ল স্যাডল থেকে। গড়িয়ে থামল ও, পরপর দুটো গুলি ছুঁড়ল ধাবমান অ্যাপাচিদের উদ্দেশে। পরমুহূর্তে সোজা হলো, ছুটন্ত অবস্থায় পিস্তল রাখল হোলস্টারে, হাত

বাড়িয়ে জাপটে ধরল একটা ঘোড়ার কেশর, এক পা তুলে দিল পিঠে। আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল ও, সামলে নিয়ে ঝুলে রইল কাত হয়ে, কেশর ধরে আছে শক্ত করে।

গুলিবৃষ্টি হচ্ছে চারদিকে, তারপর আমরা ওদের ক্যাম্প পেরিয়ে ছুটে চললাম ক্যানিয়নের নীচের দিকে।

প্রাণপণে ছুটছে আমার স্ট্যালিয়ন, সামান্য ঘাড় ফেরালাম আমি। রোকা আসছে এখনও, নেতিয়ে পড়েছে স্যাডলের ওপর, হ্যাট ঘাড়ের পেছনে ঝুলছে, থুতনির ফিতে গলায় বেঁধে ধরে রেখেছে ওটা।

বেন আমার ডানে– অন্তত তাই মনে হলো– উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি আমরা। সামনে দিগ্‌ভ্রান্ত কয়েকটা ঘোড়া, বাকিগুলো ডানে-বাঁয়ে ছুটে পালাচ্ছে।

ঘোড়াগুলো স্বেচ্ছায় একটা ঘোরানো ট্রেইল আবিষ্কার করল। উঠতে লাগল আস্তে আস্তে। সঙ্গীদের উদ্দেশে হাঁক দিলাম আমি, জবাব পেলাম না। অনেক কসরত করে কিনার টপকে মেসায় উঠল স্ট্যালিয়ন। উজ্জ্বল তারায় বেশ আলোকময় জায়গা।

রাশ টানলাম আমি। এখানে-সেখানে দেখতে পাচ্ছি একটা-দুটো ঘোড়া, তবে আরোহী নেই কোনও।

এগোলাম ধীরে ধীরে, কথা বলছি ঘোড়ার সাথে, ডাকছি আসতে। ভোরের দেরি আছে, কিন্তু থামা চলবে না। আমার বন্ধুরা যদি বেঁচে থাকে, ওরাও এগোবে অবিরাম।

এখন খোঁজাখুঁজি অনর্থক। অন্ধকারে পথ হারানো বিচিত্র নয়, তা ছাড়া পাছে ইন্ডিয়ান হয় এই ভয়ে এক ঘোড়সওয়ার আরেকজনকে এড়িয়ে চলবে।

সারারাত পথ চললাম আমি। মাঝে একবার কয়েক মাইল জোরকদমে ছুটে ফের গতি মন্থর করেছি। টোটা পুরেছি পিস্তলে, পরখ করেছি রাইফেল। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলাম একবার।

অবশেষে, গোধূলিলগ্নে, থামলাম। সাবধানে রেকাবে দাঁড়িয়ে নজর বোলালাম চারদিকে। বহুদূর অবধি দৃষ্টি চলে, মরুভূমি আর আকাশ ছাড়া কিছু নেই। অবসন্ন দেহে রওনা হলাম আবার, উত্তর অভিমুখে।

দুপুর নাগাদ ঘোড়া থেকে নেমে স্খলিত পায়ে হাঁটতে শুরু করলাম আমি। এখনও দেখা পাইনি কারও।

কোনও ট্র্যাক নেই। সীমাহীন স্তব্ধতা। মাথার ওপর গোঁত্তা খেয়ে নেমে এল একটা শকুন, ফিরে গেল, অলসচক্রে বিলি কাটছে আকাশে। ছায়ার মত আমার পিছু লেগে রইল। বুঝলাম, আহার কোথায় মিলবে ভালই আঁচ পায় শকুন।

গনগনে সূর্য। একরত্তি হাওয়া নেই। বুলেটের ঘায়ে ফুটো হয়ে গেছে আমার ক্যান্টিন– খালি। নিশিতে-পাওয়া লোকের মত হাঁটছি আমি, পা ভেঙে আসছে, তবু সাহস পাচ্ছি না থামতে। শেষ-পর্যন্ত হাল ছেড়ে একসময় আবার উঠে বসলাম স্যাডলে।

দূরে, নীল দিগন্তের কাছে, ভাঙাচোরা দেখাচ্ছে পাহাড়টাকে। আমার পেছনে অটল পর্বতমালা, ডানে ধু-ধু প্রান্তর।

পানি... পানি পেতে হবে আমাকে, স্ট্যালিয়নেরও লাগবে। মরু সূর্যের নীচে পানি ছাড়া বেশিক্ষণ বাঁচতে পারে না মানুষ।

হঠাৎ-করে শেষ হয়ে গেল মেসা। অথচ নীচের এবড়োখেবড়ো ভূমিতে নামার কোনও রাস্তা নেই। ডানে-বাঁয়ে ত্রিশ ফুট খাড়া দেয়াল।

মনে হলো দূরে যেন তৃণভূমির আভাস পেলাম। পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম আমি। কিছুদূর যাওয়ার পর নাল-পরানো খুরের ট্র্যাক চোখে পড়ল।

পরিচিত ছাপ। ওটা বেন মারফির ঘোড়া, পাহাড়ি মাসট্যাং, কমপক্ষে একহাজার পাউন্ড ওজন। ঘুরে, কিনার ঘেঁষে অনুসরণ করলাম ট্র্যাক। আচমকা একটা ফাটলের সামনে এসে হাজির হলাম আমরা। পাহাড়ের দেয়াল ভেঙে নীচের উপত্যকায় নেমে গেছে ট্রেইল।

উপত্যকায় নামলাম, বন্ধুর সাথে মিলিত হওয়ার আশায় বেড়ে গেছে স্ট্যালিয়নের গতি। মাইল পাঁচেক যাওয়ার পর বাদামি রঙের মাসট্যাংটা দেখতে পেলাম, পিঠে কোনও স্যাডল নেই। দাঁড়িয়ে আছে, চোখ সামনে, কান খাড়া।

চট করে উইনচেস্টার বের করে হ্যামার পেছনে টানলাম আমি। মাসট্যাংয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সহজ সুরে কথা বললাম ওর সাথে, পলকে মাথা উঁচু করেই শান্ত ভঙ্গিতে এক পা পাশে সরল ও। চিনতে পেরেছে আমার গলা। তারপর ওর দৃষ্টি অনুসরণ করলাম আমি।

ট্রেইলের ধারে আয়রনউডের ঝোপ। একটা ঘোড়া মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। পিঠে একজন মানুষ। পমেলে দুহাত রেখে বসে আছে, ঘোড়ার মতই মাথা নোয়ানো। আমরা এগোনো সত্ত্বেও কোনওরকম ভাবান্তর ঘটল না তার মাঝে।

এর কারণ আছে। লোকটা ট্যাম্পিকো রোকা। মারা গেছে।

রোকার কাছে যাওয়ার আগেই ওর ভেস্টে চাপ চাপ রক্ত চোখে পড়ল। দুই জায়গায় গুলি খেয়েছে। তবু স্যাডলহর্ন ছাড়েনি।

রোকা বলেছিল স্যাডলে উঠতে পারলে ও ঠিকই বসে থাকবে। অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে নিজের কথা।

পনেরো

এখানে থাকা ঠিক হবে না, সাবধান হলাম আমি। অ্যাপাচিরা যদি আমাকে দেখে থাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে রোকাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করবে।

একটা পাথুরে কারনিসের পাশে আড়াল রয়েছে, একবার চকিতে চারদিকে নজর বুলিয়ে ওখানে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। কান খাড়া।

কয়েক মিনিট জরিপ করলাম রোকা আর তার ঘোড়াকে। আশপাশের পাথরগুলোও বাদ গেল না। বেশির ভাগ সময়ে ঘোড়াটাকেই লক্ষ্য করলাম আমি। ঘোড়ার আচরণ থেকে বুঝতে পারব ধারেকাছে আর কেউ আছে কি না।

কারনিস বরাবর উজানে কিছুদূর এগোতে, ক্যানিয়নের মুখে ঝোপ আর নিচু গাছপালা চোখে পড়ল। ওই ঝোপের আড়ালে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, তারপর ফিরে গেলাম ঘোড়া আর তার মৃত সওয়ারির কাছে।

আয়রনউডের ডালে আটকে রয়েছে লাগাম। রোকাকে পিঠ থেকে নামালাম আমি। কবর খোঁড়ার উপযোগী কোনও সরঞ্জাম নেই, অগত্যা একটা অগভীর নালায় শুইয়ে দিলাম ওর লাশ, তারপর পাথর আর ডালপালা দিয়ে ঢেকে দিলাম।

তবে প্রথমেই অস্ত্র আর গুলির বেল্ট খুলে নিয়েছি, যাতে অ্যাপাচিরা ওকে খুঁজে পেলেও ওর অস্ত্রশস্ত্র হাতাতে না পারে। রোকার ক্যান্টিনে একঢোক পানি ছিল, পান করলাম।

পেন্সিল আর কয়েকটা তুলট কাগজ পেলাম ওর পকেটে। নিজের নাম লেখা অভ্যেস করছিল রোকা। প্রথমে কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল নামটা, তারপর নানান জায়গায় বারবার মশক্ করছে। আমরা ওকে কখনও এ-রকম করতে দেখিনি। নিজের নাম লিখতে জানে না এটা ছিল ওর কাছে চরম লজ্জার বিষয়, কেউ দেখে ফেললে ওর অহমে আঘাত লাগত।

এমন কোনও ঠিকানা বা চিহ্ন পেলাম না যা দিয়ে বুঝব ওর কোনও উত্তরাধিকারী আছে কি না। তবে একবার একটা মেয়ের কথা উল্লেখ করেছিল রোকা, পকেটে সামান্য যে-কটা ডলার ও পেসো ছিল, সিদ্ধান্ত নিলাম ওই মেয়েটির কাছে পাঠিয়ে দেব।

লাশ কবরস্থ করতে বড়জোর বিশ মিনিট লাগল। তারপর বাড়তি ঘোড়াটা নিয়ে কারনিসের কাছে ফিরে গেলাম আমি, এবং প্রায় এক মাইল নরম বালুর ওপর দিয়ে ওই পথে অগ্রসর হলাম।

ইতিমধ্যে ডুবে গেছে সূর্য, আঁধার জমাট বাঁধছে। মরুভূমি ঠাণ্ডা। দূরে একটা কোয়েল ডাকল... প্রার্থনা করলাম ওটা যেন সত্যিকার কোয়েলের আওয়াজ হয়।

জড়তা বোধ করছি, খিল ছাড়াচ্ছি আঙুল নাড়িয়ে যাতে পিস্তল ধরা সহজ হয়। রোকার ঘোড়ায় চেপে অন্ধকারের ভেতর ছুটে চললাম। কোনও ট্রেইল নেই, কিন্তু আমি এগোচ্ছি নাক বরাবর, পানির খোঁজে দৃষ্টি সজাগ। তখন দূর থেকে যে-তৃণভূমি চোখে পড়েছিল সেটা কাছেই কোথাও হবে।

কালো স্ট্যালিয়ন আমার পাশে চলে এল, গতি বাড়াল রোকার ঘোড়া। পানির গন্ধ পেয়েছে ওরা।

ডানে একটা ক্যানিয়নের মুখ খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে, এক মিনিট কান পাতলাম আমি, তারপর ঘোড়াসহ এগোলাম সামনে। জানি এই পথ পানির কাছে গিয়ে শেষ হবে। চওড়া হয়ে গেল ক্যানিয়নটা, ছোট্ট এক মরূদ্যান চোখে পড়ল, সন্ধ্যার পরশে সুশীতল।

গোটা বারো কটনউড, মেসকিট আর উইলো গাছ ছড়ানো ছিটানো। ঢাল ঘাসে সবুজ। গাছের ফাঁক দিয়ে ঝিকমিক করছে পানি। পাখির কিচিরমিচির শুনতে পাচ্ছি আমি। খুশিতে লেজ নাড়ছে ঘোড়া দুটো, এগোতে চাইছে। উইনচেস্টার হাতে ধীরে ধীরে এগোলাম আমি, বিপদে ব্যবহার করতে একটা স্পার তৈরি রেখেছি।

সহসা পথ জুড়ে দাঁড়াল একটা নিচু পাথুরে দেয়াল। আদিম মানুষেরা বাঁধ বা আঙিনা ঘেরার কাজে এইধরনের দেয়াল তুলত। এর নাম ট্রিনচেরা। মেক্সিকোতে এ-জাতীয় বহু দেয়াল আমি দেখেছি।

নেমে ঘোরাপথে এগোলাম, দেয়ালের ভাঙা অংশে উপস্থিত হলাম এসে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে কালো নিরেট একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে। স্তব্ধ পরিবেশ। বাতাসে দোল খাচ্ছে কটনউডের পাতা। দীঘিতে ঢেউয়ের মৃদু আন্দোলন। আমার গা ছমছম করে উঠল। তবু এগিয়ে গেলাম সাহসে ভর করে, বনানীর ও-পাশে একফালি খোলা জমি, সেখানে প্রাচীন একটা দালানের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ল।

একসময় বেশ বড় কাঠামো ছিল, দীঘির পাড় থেকে পাহাড় অবধি উঠে গেছে, সেখানে যুক্ত হয়েছে মূল পাথরের সঙ্গে।

এখন কেবল মেঝে আর দেয়ালের একপ্রান্ত অক্ষত রয়েছে। দেয়ালটা ছয় ফুট উঁচু, নীচে শেষ হয়েছে পানির তিন ফুটের মধ্যে গিয়ে। চারপাশে সবুজ ঘাস। বহুকাল কোনও জনমানবের পা পড়েনি, থমথম করছে বদ্ধঘরের মত।

এক-এক করে ঘোড়াদের পানি খাওয়ার সুযোগ দিলাম আমি, তারপর নিজেও খেয়ে রোকার ক্যান্টিন ভরলাম। সর্বক্ষণ খোলা রয়েছে কান।

ঘোড়া বেঁধে ক্যাম্প করার উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে বেরোলাম। দেয়ালের একটা কোণ পছন্দ হলো, দুদিকে আড়াল রয়েছে। আরেক প্রান্তে রোদে-পোড়া ইট আর পাথরের স্তূপ। বুক-সমান উঁচু।

এত ক্লান্ত অথচ আমার চোখে ঘুম নেই। এ-ধরনের পরিবেশ বিষণ্ন করে তোলে মানুষকে। এককালে জনবসতি ছিল, ভাঙা ইমারত বাগান এগুলো সাক্ষ্য দিচ্ছে একেক সময় একেক প্রজাতির মানুষ এসেছে। প্রথমে পাহাড় কেটে দালান তৈরি হয়েছিল। যখন ধসে পড়েছে, সেখানে উঠেছে রোদে-পোড়া ইট আর পাথরের ঘর; তাও নিশ্চয়ই প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে। সম্ভবত ইন্ডিয়ানরা এর প্রথম স্থপতি। পরে, শ্বেতাঙ্গরা এসেছিল– অ্যাপাচি অত্যাচারে টিকতে পারেনি।

চমৎকার জায়গা। বাগান ছিল একসময়। ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। যখন

জেগে উঠলাম গাছের পাতা গলে ভোরের সূর্য উঁকি দিচ্ছে। সবকিছু আগের মত শান্ত। ঘোড়া দুটোকে পানি খাইয়ে স্যাডল চাপালাম, তারপর যাত্রার পূর্বমুহূর্তে আরেকবার জরিপ করলাম চারদিক।

পাহাড়ের একপাশে এবড়োখেবড়ো সিঁড়ি, যুগ-যুগান্তর ধরে ঝড়বাদলে পাথর ক্ষয়ে সৃষ্টি। ধাপগুলো পেরিয়ে একটা গর্তের সন্ধান পেলাম, উঁচু কিনারা, অনায়াসে লুকিয়ে থেকে পর্যবেক্ষণ চালানো যায়।

প্রায় তিন-চার মিনিট জরিপ করলাম মরুভূমি, দেখতে পেলাম না কিছু। নীচে নেমে স্যাডলব্যাগ হাতড়ে কফির ছোট্ট প্যাকেটটা বের করলাম। জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় সর্বদা এ-রকম একটা প্যাকেট থাকে আমার কাছে। জার্কি, ময়দা এগুলোও রাখি কখনও কখনও। তবে এখন শুধু কফি রয়েছে।

আগুন ধরালাম ছোট করে, একটা কুড়িয়ে-পাওয়া মাটির পাত্র ধুলাম পানি দিয়ে। তৈরি হলো কফি, কাপে ঢেলে কিছু মুখে দেওয়ার আশায় তাকালাম এদিক-ওদিক। শুকনো ভুট্টা চোখে পড়তে, তাই খেলাম খানিকটা। তারপর আর একনজর দেখার উদ্দেশে ফের ওপরে উঠলাম।

উত্তরে একটা শকুন উড়ছে। হয়তো কোনও বাছুর মরেছে, কিংবা আমার বন্ধুদের কেউ একজন হতে পারে। অজানা আশঙ্কায় বুক ধক্ করে উঠল, সব সময় মানুষের মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে থাকে না শকুন।

উত্তরে ছুটলাম আমি, তারপর বাঁক নিয়ে পুবে ঘুরলাম, কোনও ট্র্যাক রয়েছে কিনা দেখব। সামনে যাই থাকুক, নিশ্চয়ই যাওয়ার পথে ট্র্যাক রেখে গেছে, কার মোকাবেলা করতে হবে সেটা জানতে চাইছি আগাম।

'ওরিন,' নিজেকে বললাম আমি, 'সাবধান– মনে হচ্ছে সামনে বিপদ আছে।'

একটা কান নাচাল স্ট্যালিয়ন যেন আমার সঙ্গে সেও একমত। নির্জন মরু এলাকায় ঘোড়াই হয়ে ওঠে মানুষের প্রকৃত বন্ধু, কোনও কোনও ঘোড়া সহজেই তার মনিবের মনোভাব বুঝতে পারে।

না, ট্র্যাক নেই। যেখানে শকুন পাক দিচ্ছিল, তার পুবে গেলাম আমি, কমিয়ে আনলাম ব্যবধান। রেকাবে দাঁড়িয়ে তাকালাম সামনে, প্রথমে কিছু আগাছা আর চোলা চোখে পড়ল। ওপর দিকে সাদা সাদা কাঁটা, নীচে কালচে পাতা।

তারপর দেখতে পেলাম ঘোড়াটা– পড়ে আছে মাটিতে, পিঠে স্যাডল।

একপাক চক্কর কাটলাম, এগোলাম আরেকটু কাছে, তারপর ডাকলাম সাহস করে: 'বেন? আছ?'

অদূরবর্তী পালো ভার্দে গাছে বসেছিল দুটো শকুন, ব্যাজার হলো আমার উপস্থিতিতে, বোধ করি আমাকে ভয় দেখাতেই ডানা ঝাপটাল একটা।

তবু সাড়া নেই। এগোলাম আমি, রাশ টেনে তাকালাম চারপাশে।

স্বাভাবিক পরিবেশ– যেমনটা মানায় এখানে– রৌদ্রালোকিত, নিস্তব্ধ।

কৌতূহলী হয়ে উঠেছে স্ট্যালিয়ন। কিছু একটা গোলমাল টের পেয়েছে ও যা আমি পাইনি, সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে ঘোড়াটা, ভয়ও পাচ্ছে। সম্ভবত ওই মৃত ঘোড়াটাই ওর ভয়ের কারণ।

সাবধানে এগোলাম, উইনচেস্টারের হ্যামার পেছনে টানা।

প্রথমে চোখে পড়ল শার্ট, তারপর বুট আর বড় বড় দাঁতঅলা মেক্সিক্যান স্পার। বেন মারফি।

নামলাম আমি, মেসকিটের ডালে ঘোড়া বেঁধে ওর কাছে গেলাম।

মুখ গুঁজে পড়ে আছে বালুতে, স্যাডলব্যাগ দুটো কিডনির দুপাশে টেনে নিয়েছে; এর অর্থ মাটিতে পড়ার সময়ে জীবিত ছিল ও, জ্ঞান হারায়নি। শকুনের প্রথম লক্ষ্য থাকে চোখ আর বৃক্ক, ও জানে, তাই উপুড় হয়ে পড়েছে, জিনের থলেগুলো টেনে নিয়েছে কাছে। খুব একটা লাভ বোধহয় হবে না, তবু ওকে ওখান থেকে সরাতে পারলে আরও ভালভাবে লড়ার সুযোগ পাবে শকুনের সাথে।

থলেগুলো সরিয়ে, বেনকে চিত করলাম আমি।

সারা বুক রক্তে মাখামাখি, শুকনো রক্ত, মনে হয় কাঁধের জখম থেকে বেরিয়েছে। পেটের আশপাশে কোথাও আর একটা ক্ষত আছে, রক্তক্ষরণ হয়েছে সেখান থেকে। তবে শ্বাস চলছে।

একেবারে খোলা প্রান্তরে রয়েছি আমরা, শকুন দেখে অ্যাপাচিরা আসতে পারে; বেনের কোনও উপকার হোক চাই না হোক, সরতে হবে আমাদের।

অস্ফুটে কিছু একটা বলল ও, জানাতে চেষ্টা করলাম কার সঙ্গে রয়েছে সে। 'সব ঠিক হয়ে যাবে, বেন,' বললাম আমি, 'টুসানের ওই মেয়েটার কাছে আবার যাবে তুমি।'

শুশ্রূষা করার অবকাশ নেই এখানে। ওকে পাঁজাকোলা করে বাড়তি স্যাডল ঘোড়ায় তুলে দিলাম আমি; তারপর কবজি পমেলে আর বুটজোড়া বাঁধলাম রেকাবে। জিনের থলে দুটো নিয়েছি, যদিও জানি না কী আছে ভেতরে। এরপর ওর ঘোড়াটা পরখ করলাম, মারা গেছে। স্যাডল স্ক্যাবার্ডে রাইফেল ছিল, বের করে নিলাম ওটা। কোনও ক্যান্টিন নেই।

ক্ষিপ্র গতিতে ওখান থেকে সরে এলাম আমরা। সম্মুখবর্তী অঞ্চলে কোনও আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না। সীমান্ত পেরোতে আর দু-তিন দিন লাগবে, তবে পিট কিচেনের বাথান বা সীমান্তবর্তী বসতিতে না পৌঁছুনো অবধি আমরা নিরাপদ নই।

ট্রেইল লুকোনোর যতরকম কায়দা-কানুন জানা আছে সব ব্যবহার করছি, যথাসাধ্য প্রয়াস পাচ্ছি ধুলো না ওড়ানোর। উত্তরে যাচ্ছি আমি, রোকার ঘোড়ায় বেন, লাগাম আমার হাতে। বেনের সেই মাসট্যাংটা আনিনি, বাঁধাছাঁদার সময় ছিল না। বাতাসের বেগ বাড়ছে, এতে বালু উড়ে ঢাকা পড়বে আমার ট্র্যাক,

তবে সেটা সময়মত হবে এমন সম্ভাবনা কম। প্রায়ই গতি হ্রাস করে পশুপাখির ট্র্যাক লক্ষ করছি আমি, দেখছি পানির হদিস দিতে পারে এ-রকম কোনও চিহ্ন মেলে কিনা।

পেছনের ট্রেইল ফাঁকা, সামনে পরিষ্কার, মনে হয় না কেউ আছে। নিজের ছায়া মাড়িয়ে যাচ্ছি আমি, বাতাসে ঘাম-ধুলোর গন্ধ। সামনে, ডানে, করাতের দাঁতের মত একটা খাঁজ উঁকি দিল।

আমি ঘোড়ার গতিবেগ হাঁটার পর্যায়ে নামিয়ে আনলাম, ওর গায়ে ঘামের বিচিত্র রেখা। একটা ক্যানিয়নের মুখ খুলে গেল আমার সামনে, ভেতরে ঢুকতে উল্টো দিকের ঢালে রাস্তা চোখে পড়ল। ঢালের মাথায় উঁচু ঢিবি।

একটা বুলেট আছড়ে পড়ল স্যাডলের পমেলে, তারপর ঠিকরে ক্রুদ্ধ গর্জন তুলে চলে গেল অন্যদিকে, রাইফেলের ভোঁতা প্রতিধ্বনি উঠল পাহাড়ে প্রান্তরে। ঘোড়ার পেটে স্পার মেরে এগোলাম আমি, ডান দিকে একটা পাথরের আড়াল থেকে তিনজন অ্যাপাচি বেরিয়ে এল। ওত পেতেছিল ওরা, কিন্তু আমি ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ায় বোকা হয়ে গেছে, তেড়ে আসছে এখন।

স্যাডলে ঘুরে লক্ষ্যস্থির করলাম আমি, এই অবস্থায় যতটা নির্ভুল সম্ভব, গুলি করলাম... এক, দুই... তিনবার। টলে উঠল একটা ঘোড়া, আছাড় খেলো, পড়ে রইল বালুতে মাথা রেখে।

সামনে আরও তিনটে অ্যাপাচি উদয় হলো মরুভূমির বুক ফুঁড়ে। গুলি থামিয়ে ওদের দিক থেকে একটু সরে ছুটে চললাম আমি, পেছনে ময়দার বস্তার মত আসছে বেন, প্রতিকদমে ঝাঁকুনিতে লাফিয়ে উঠছে ওর শরীর, তবু কীভাবে যেন রয়ে যাচ্ছে স্যাডলে।

ধেয়ে এল ওরা, আচমকা কালো স্ট্যালিয়নকে ওদের দিকে পরিচালিত করলাম আমি, এক হাতে উইনচেস্টারের ট্রিগার টিপছি যেন ওটা পিস্তল।

আকস্মিক দিক্‌পরিবর্তনে হতচকিত হলো ওরা, একজন এত দ্রুত ঘুরল যে ওর ঘোড়াটা আছাড় খেলো বালুতে। আরেকজন ঠিক আমার রাইফেলের নলের সামনে চলে এল, মাত্র গজ ত্রিশেক দূরে, গুলি করলাম আমি, ইন্ডিয়ানের বুক এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল। লুটিয়ে পড়ল ও, এবং আমরা ওদের ব্যূহ ভেদ করে ছুটলাম ঢিবির উদ্দেশে।

পেছনে গুলি হলো একটা, টান পড়ল আমার কাঁধে, কিন্তু ওদের নাগালের বাইরে চলে এলাম। উইনচেস্টার স্ক্যাবার্ডে তুলে; সিক্স-শূটার বের করলাম আমি। কেউ কাছে এলেই নিশানা করে গুলি ছুঁড়ছি। প্রথম গুলিটা ফসকাল; দ্বিতীয়টাও। এরপর যখন বুড়ো আঙুলে হ্যামার পেছনে টানলাম, এক অ্যাপাচি বেরিয়ে এল ছোট্ট সিডার গাছের আড়াল থেকে। আমার দিকে মুখ করে ছিল ও, ট্রিগার টিপলাম, শব্দ পেলাম হাতুড়ি পড়ার, স্যাডলে লাফিয়ে উঠল অ্যাপাচিটা. তারপর কাত হয়ে পড়ল একপাশে, রেকাবে বেধে আছে একটা পা।

হঠাৎ, সামনে থেকে গর্জে উঠল একটা রাইফেল, পেছন ফিরে দেখলাম

আরেকজন ইন্ডিয়ান ধরাশায়ী হয়েছে। উর্ধ্বশ্বাসে সামনে এগোলাম আমি, যদিও এতে বিন্দুমাত্র লাভ হবে বিশ্বাস করতে বাধছে, ধাওয়া করল অ্যাপাচিরা। বেন এখনও আসছে আমার পেছনে।

দীর্ঘ ঢালের কিনারে বসেছিল জেমস গ্রীন, ধূলিধূসর রক্তাক্ত শরীর, টুপি নেই, শার্ট ছিঁড়ে গেছে, আমাদের এগোতে দেখে দোল খেয়ে স্যাডলে চাপল... সঙ্গে ওর প্যাক হর্সটা রয়েছে।

'খুঁজে বের করেছে আমাকে,' বলল ও। 'একাকী ছুটছিল মরুভূমিতে। কিছু মালপত্র খোয়া গেছে, বাকিটা ঝুলছিল পেটের কাছে।'

'বাচ্চাদের কাউকে দেখেছ?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'না।' বেনের দিকে তাকাল ও। 'খারাপ চোট?'

'দেখার সময় পাইনি। মনে হয়।'

এগিয়ে চললাম আমরা, কামনা করছি আজ অন্ধকার যেন তাড়াতাড়ি নামে, অবশেষে নামল রাত। গতি কমাল ঘোড়াগুলো, ওদেরকে খানিকটা আরাম দেওয়ার জন্যে নামলাম আমরা।

'সীমান্ত আর কদ্দূর?' জিজ্ঞেস করল গ্রীন।

'বোধহয় ষাট মাইল,' বললাম আমি। 'কম হতে পারে কিছু।'

থেমে বুটের অগ্রভাগ দিয়ে গোড়ালি মালিশ করতে লাগল গ্রীন। ওই সঙ্কেত আমার চেনা, দুজনেই আমরা ভীষণ ক্লান্ত। আমার বিশ্বাস গ্রীনের চেয়ে আমার শক্তি বেশি, স্নায়ুর জোরে টিকে আছি এখনও। ব্যথায় টনটন করছে শরীর, শ্রান্তিতে বুজে আসছে চোখ, প্রতিপদে থামার আকাঙ্ক্ষা জাগছে। অনুভব করছি একই হাল ঘোড়াগুলোর।

তবু এগিয়ে চললাম, থামতে জানি না বলে। অবশেষে একসময় হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল গ্রীন, অনেক সময় নিল উঠতে।

'তুমি ঘোড়াটা নিয়ে পালিয়ে যাও,' বলল ও। 'দরকার হলে খাটিয়ে মেরে ফেলো ওকে, তবু আশ্রয় নাও নিরাপদ জায়গায়। এভাবে পারব না আমরা।'

জবাব দিলাম না আমি, হাঁটছি শুধু। পা টেনে টেনে এগোচ্ছি, একেক কদমে মনে হচ্ছে একটু হলেও ব্যবধান কমিয়ে আনছি সীমান্তের সাথে। তারপর যখন আমি নিজেও হোঁচট খেলাম দুবার, স্ট্যালিয়নের লাগামে টান পড়ল– পুবে যেতে চাইছে ও।

'গ্রীন, ওঠো,' বললাম আমি। 'বোধহয় এখন একটা সুরাহা হবে। তবু সাবধানের মার নেই, রাইফেল তৈরি রেখো।' আমার মুখ এত শুকিয়ে গেছে যে রীতিমত কসরত করে বললাম কথাগুলো।

স্যাডলে উঠে ঘোড়ার ওপর সব দায়িত্ব অর্পণ করলাম। শরীরের শেষ-শক্তিটুকু একত্র করে দ্রুতবেগে রওনা হলো ও। অন্যরা অনুসরণ করছে। বেন এমনভাবে বসে রয়েছে জিনে যেন একজন পাদ্রি দণ্ড শোনাচ্ছে শয়তানকে, ওর মাথা নোয়ানো কিন্তু উঁচু হয়ে আছে দুই কাঁধ, যেন আশঙ্কা করছে আর একটা

আঘাত হানতে পারে শয়তান।

অল্পক্ষণের ভেতর ঠাণ্ডা হাওয়ার পরশ পেলাম আমরা, একটা ক্যানিয়নের ভাটিতে যাচ্ছিল ঘোড়াগুলো, হঠাৎ একটা ছোট্ট ক্যাম্পফায়ারের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। চার-পাঁচজন অ্যাপাচি বসে আছে গোল হয়ে, ঘোড়ার মাংস ঝলসে খাচ্ছে।

আমরা দুপক্ষই চমকে উঠলাম একসাথে, তবে গ্রীনই প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে গুলি করল। দাঁত দিয়ে মাংস ছিঁড়ছিল এক ইন্ডিয়ান, বুলেটের আঘাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আগুনের পাশে। অন্যরা ভূতের মত গা ঢাকা দিল আঁধারে। এক অ্যাপাচিকে ঝোপের আড়ালে লুকোতে দেখে তেড়ে গেলাম আমি। লাফিয়ে আগুন টপকাল স্ট্যালিয়ন, ঢুকল ঝোপের ভেতর। আমার মাথায় আঘাত করল একটা কিছু, ব্যথায় ককিয়ে উঠলাম, পড়ে গেলাম মাটিতে, একপাটি বুট আটকে রইল রেকাবে।

গড়ান দিলাম একটা, উইনচেস্টার হারিয়ে গেছে ঝোপের কোথাও, হাত বাড়ালাম পিস্তলের দিকে। এবং পরক্ষণে জমে গেলাম, একজন অ্যাপাচি আমার বুকের ওপর বসে, হাতের ক্ষুর কণ্ঠনালিতে ধরেছে। সরাসরি আমার চোখের পানে তাকিয়ে আছে ও, মুখে আগুনের প্রতিফলন। সেই আলোয় থুতনির ক্ষতচিহ্নটা চোখে পড়ল আমার। প্রথম দর্শনেই আমরা পরস্পরকে চিনতে পারলাম। কাহতেনি— এই ইন্ডিয়ান যোদ্ধাকেই হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিলাম আমি।

'ক্ষুরটা সরাও,' বললাম, 'কেটে যেতে পারে।'

ষোলো

তবু আমার বুকের ওপর বসে রইল সে, ছোরাটা ধরে আছে গলায়, একচুল সরায়নি। অপলক তাকিয়ে আছে আমার চোখের দিকে, আমিও পাল্টা চেয়ে আছি ওর পানে, জানি আমার দিন শেষ করতে একটামাত্র পোঁচ চালাতে হবে ওকে।

ওর কব্জি পর্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে ডান হাতখানা তুললাম আমি, আস্তে করে ঠেলে সরিয়ে দিলাম ক্ষুর।

'ছোরাটা ভাল— ধার আছে,' বললাম আমি।

'তুমি সাহসী লোক— যোদ্ধা।'

'আমরা দুজনেই লড়াকু,' বললাম আমি। 'ভালই হয়েছে, আমরা একে অন্যকে চিনি।'

ওর সঙ্গীরা বেরিয়ে আসছে আঁধার ছেড়ে, কালো কালো চোখগুলো জরিপ

করছে আমাকে, একজন শক্তিশালী বন্দীকে নির্যাতন করার আমোদটুকু উপভোগ করতে চায়।

একনজরেই ওদের মাঝে টোকলানিকে চিনতে পারলাম আমি। একসময় সেনাবাহিনীতে ছিল, এমেট ক্রফোর্ডের অ্যাপাচি স্কাউট কোম্পানিতে। টোকলানি আর আমি, আমরা একসাথে পথ চলেছি, আমাদের খাবার ভাগাভাগি করেছি, পাশাপাশি লড়েছি অন্য অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এখন সেটা কোনও উপকারে আসবে কিনা বুঝতে পারছি না। টোকলানি আবার বুনো জীবনে ফিরে যাওয়া বিচিত্র নয়। ব্রংকো অ্যাপাচিরা ভীষণ হিংস্র, কাউকে রেয়াত করে না।

আমাকে মেরে ফেলবে তাতে একটুও সন্দেহ নেই আমার। ভাগ্যে কী ঘটবে আমি জানি, বস্তুত সীমান্তের সব লোকই তা জানে, কিন্তু আমার শঙ্কার কারণ বেন আর গ্রীন। ওরা কী পালাতে পেরেছে? বেন জীবন্মৃত, গ্রীনের অবস্থাও খুব একটা ভাল নয়– বেন বা আমার তুলনায় ওর মরুযাত্রার অভিজ্ঞতা কম।

আমাকে বাঁধার চেষ্টা করেনি কেউ, তবে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়েছে, ওগুলো হাত করার কোনও সুযোগ নেই। তা ছাড়া, আমার হাল সঙ্গিন। একঢোক পানি দরকার, আগুনে মাংস ঝলসানোর গন্ধে মেঘ ডাকছে পেটের ভেতর।

দুটো অ্যাপাচিকে খতম করেছি আমরা, কিন্তু গোলাগুলির শুরুতে কমপক্ষে আরও জনাবারো ঝোপের ভেতর লুকিয়েছিল। এখন আগুনের ধারে বেরিয়ে এসেছে ওরা, পাশেই জ্বালিয়েছে আরেকটা।

অদূরে পড়ে আছে আমার কোল্ট আর উইনচেস্টার। কিন্তু এই ত্রিশ ফুট পাড়ি দেওয়ার মত কোনও সুযোগই নেই আমার। কাহ্‌তেনি সরে গেছে একদিকে, আগুনের ও-পাশে; আলাপ করছে সঙ্গীদের সাথে, তবে ওদের বক্তব্য একবিন্দু উদ্ধার করতে পারছি না আমি। কেবল বুঝতে পারছি কোনও কারণে তর্ক চলছে ওদের, নিঃসন্দেহে আমিই ওই বিতর্কের মূল বিষয়বস্তু।

অ্যাপাচিরা আহারে মত্ত হলেও, অন্তত তিনজন নজর রাখছে আমার ওপর, টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম আমি, বালিশ হিসেবে ব্যবহার করলাম মাথার টুপিকে, ঘুমিয়ে পড়লাম।

প্রায় দুঘণ্টা বাদে ঘুম ভাঙল। আগুন নিভে গেছে। বেশির ভাগ অ্যাপাচি ঘুমোচ্ছে আশপাশে। এখনও আমার হাত-পা বাঁধা হয়নি। এর কোনও কারণ খুঁজে পেলাম না আমি, যদি না কোনওরকম নিষ্ঠুর কৌতুকের ইচ্ছে থাকে ওদের– আমি পালানোর প্রয়াস পেলেই শুরু করতে পারে সেটা।

পিপাসা আমার টুঁটি চেপে ধরেছে। ক্যাম্পের কিনারেই ওঅটর হোল। উঠে দাঁড়ালাম আমি, পায়ের আওয়াজ গোপনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করছি না, হেঁটে গেলাম ওঅটর হোলের কাছে, বসে পানি খেলাম। তারপর ফিরে এসে লম্বা হলাম আবার।

জানি কমপক্ষে চার-পাঁচজোড়া চোখ এতক্ষণ অনুসরণ করছিল আমাকে,

অস্ত্র ওঠানোর চেষ্টা করলেই পাকড়াও করত। তাই শুয়ে পড়লাম নীরবে, পানি খাওয়ার পর অনেকটা ভাল বোধ করছি।

কাহ্‌তেনি এ-বার উঠে আমার পাশে এসে বসল। দক্ষ হাতে একট সিগারেট বানিয়ে ধরাল। যখন আধাআধি হলো পুড়ে মুখ খুলল ও।

'তোমাকে খুন করতে চায় কেউ।'

'আমাকে?' শব্দ করে হাসলাম আমি। 'অনেকেই চায়। হয়তো।' একটু বিমূঢ় দেখাচ্ছে ওকে, অবাক হলাম। 'তোমার লোকেরা তো?'

'না। সাদাচামড়া।'

'শ্বেতাঙ্গ লোক? আমাকে মারতে চায়? এমন মনে করার হেতু?'

'আমার বউকে আটকে রেখেছে ও। বলেছে, তোমাকে মারলে ওকে ফিরিয়ে দেবে। ওর হাতে তোমার লাশ তুলে দিলে আমার বউকে ছেড়ে দেবে।'

'তা হলে আর দেরি করছ কেন?'

কাহ্‌তেনি হতবুদ্ধি। 'কিন্তু মারতে চায় কেন? আমার ধারণা এটা একটা চাল?'

'কীভাবে খবর পেলে? টোকলানির মারফত?'

আমি টোকলানিকে চিনি বলে বিস্মিত হলো না ও। 'হ্যাঁ... ও-ই এনেছে। আমার বউ... স্যান কার্লোতে ওর বোনের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে ঢুকে পড়ে ও, আসার পথে এই লোকগুলো বন্দী করেছে।'

'মারধোর করেছে?'

'না। টোকলানির জানা মতে।' তাকাল ও। 'টোকলানির সঙ্গে আমি লড়েছি– কিন্তু ও ভাল লোক। আমার বউ ভাল-মেয়ে। টোকলানির ওর ওপর নজর রাখতে লোক লাগিয়েছে।'

'ওদের নাম কী?'

'লোগান। অনেক কজন। টোকলানি দেখেছে। তোমাকে খুন করতে চায় কেন?'

কোয়ার্টয রক স্যালুনের ঘটনাটা খুলে বললাম কাহ্‌তেনিকে। কিন্তু ও সন্তুষ্ট হলো না। 'টোকলানি তোমার প্রশংসা করছিল। তুমি নাকি বড় যোদ্ধা।'

এ-ক্ষেত্রে আমার বলার কিছু নেই, কাজেই কুলুপ আঁটলাম মুখে, অপেক্ষা করছি, তবে মাথা কাজ করছে দ্রুতবেগে। নিজেকে আমি কখনোই একজন ভাল চিন্তাবিদ বা সফল পরিকল্পক হিসেবে দাবি করি না। আমি একজন সাধারণ পাহাড়ি লোক, ভবঘুরের মত মানুষ হয়েছি, তবে বুঝতে পারছি ঠিক পথে এগোলে এই বন্দিদশা ঘুচবে।

তবু বিপদ আছে। খেলতে হবে খুবই সাবধানে– আমার হাতে কোনও তুরুপের তাস নেই। একটা দিক কাজ করছে আমার পক্ষে: সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে কাহ্‌তেনি, পুরো ব্যাপারটাকেই ও ফাঁদ বলে ভয় করছে।

নিজের বিশ্বাসের কারণে আমাকে খুন করা ওর জন্যে কোনও সমস্যাই নয়,

কিছুক্ষণ নির্যাতন চালিয়ে দেখবে আমি কোন ধাতুতে গড়া, তারপর মেরে ফেলবে অনায়াসে। কিন্তু বাইরের একজন, আমার স্বজাতির লোক আমাকে হত্যা করতে চায়– ওর সন্দেহের কারণ এটাই।

যতটুকু বুঝেছি, কাহ্‌তেনির বউ বোনের সাথে দেখা করতে রিজার্ভেশন এলাকায় গোপনে ঢুকেছিল। এবং সে-সময়ে লোগানের লোকেরা ধরেছে ওকে।

একজন বুনো অ্যাপাচির কিছুকাল রিজার্ভেশনে কাটিয়ে আসা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। আর্মি ওদের ফিরিয়ে আনতে সদা তৎপর। অধিকাংশ সময়ে মেয়েরাই উদ্‌যোগী হয় এ ব্যাপারে– সরজমিনে দেখে আসে পরিস্থিতি।

কাহ্‌তেনির বউকে বন্দী করেছে লোগানরা, ও ফিরে পেতে চায় তাকে। কিন্তু কাহ্‌তেনির স্বভাব বুনো জন্তুর মত, সামান্যতম হেরফেরে বিপদের আলামত দেখে। বর্তমান ঘটনায় সন্দেহের যথেষ্ট উপাদান আছে।

চুপচাপ বসে ধূমপান করছে ও। 'ওদের বিশ্বাস করা ঠিক হবে না,' বললাম আমি।

'মেরে ফেলবে ওকে?'

'ওরা মন্দলোক। বিনা কারণে মারতে চেয়েছিল রোকাকে। আমার ধারণা, তুমি আমার লাশ নিয়ে যাওয়ার পর তোমাকে খুন করবে। তারপর তোমার বউকেও।'

নীরব রইল ও। গাছের ডাল দিয়ে খুঁচিয়ে আগুনটা উসকে দিলাম আমি। তারপর বললাম, 'আমার বন্দুক ফেরত দাও, তোমার বউকে উদ্ধার করব।'

অনেকক্ষণ গুম মেরে রইল ও, তারপর আচমকা উঠে আরেকটা আগুনের পাশে গিয়ে বসল। শলা-পরামর্শ জুড়ল নিচু স্বরে। একটুবাদে ফিরে এসে ধপ্ করে বসল বালুর ওপর। 'পারবে উদ্ধার করতে?'

'কাহ্‌তেনি, তুমি নিজেও একজন সৈনিক। যুদ্ধে বহু কিছুই ঘটতে পারে তা তোমার অজানা নয়। তবে ওয়াদা করছি, সম্ভব হলে ওর নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমি করব।'

এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে আরও শান্ত স্বরে যোগ করলাম, 'লোগানরা অ্যাপাচি নয়। কঠিন লোক কিন্তু অ্যাপাচি নয়। তোমার স্ত্রীকে আমি উদ্ধার করতে পারব।'

'ও খুব ভাল মেয়ে। অনেকদিন হলো আছে আমার সাথে।'

'কোথায় আছে জানো?'

'তোমাকে নিয়ে যাব। সীমান্তের কাছেই।'

আমার বিপদ সবে শুরু হলো। কার্যসিদ্ধির পর কাহ্‌তেনি আমাকে খুন করা অস্বাভাবিক নয়। অ্যাপাচিরা অকৃতজ্ঞ তা বলছি না, কিন্তু আমাদের সাথে ওদের জীবনবোধের তফাত আছে। স্বগোত্রের নয় এমন সবাইকে ওরা শত্রু বলে মনে করে– এবং দ্বিধা বোধ করে না হত্যা করতে।

বেন আর জেমসের পাত্তা নেই। অ্যাপাচিদের মুখেও কোনও কিছু শুনতে

পাইনি। বোধ হয় নিরাপদে পালাতে পেরেছে। দুজনের মঙ্গল কামনা করলাম আমি।

ভোরে, কালো স্ট্যালিয়নকে আমার কাছে নিয়ে এল ওরা। যথেষ্ট সময় নিয়ে, স্যাডল চাপালাম আমি; কিন্তু অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াতেই বাধা পেলাম, টৌকলানি আমার গানবেল্ট আর উইনচেস্টার তুলে নিল। আমাকে ক্যান্টিনে পানি ভরার সুযোগ দিল ওরা, তারপর সবাই রওনা হলাম।

আজ আমার বারবার নেইসের পরিণতির কথা মনে পড়ছে। এপ্রিল, ১৮৬১। পাঁচ বন্ধু যাচ্ছিল স্টেজে করে। স্টেইনস্ পীকের কাছে সদলে ওদের ওপর চড়াও হয় কোচিজ। শুরুতেই নিহত হয় ড্রাইভার আর এলডার নামে এক লোক। অন্যরা যখন লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল নেইস শান্ত করে তাদের। বলে কোচিজ তার বাল্যবন্ধু, সে বুঝিয়ে বললে ও শুনবে। রাজি হলো যাত্রিরা। কিন্তু কোচিজ ওকে বেঁধে ছেঁচড়ে তোলে ক্যানিয়নের ওপরে। অন্যদেরও একই দশা হয়। তারপর নির্যাতন করে ওদেরকে মেরে ফেলে ওরা।

তাই ওদের ওপর ভরসা পাচ্ছি না। শ্যেন দৃষ্টিতে আমাকে নজরে রাখছে ওরা, তবু আমি তক্কেতক্কে রয়েছি– সুযোগ পেলেই পালাব।

পেলাম না।

পথশ্রমে স্ট্যালিয়নের অবস্থা শোচনীয়। মওকা যদি-বা পাই, বেশিদূর যেতে পারব না। আমার কাছে অস্ত্র নেই, কোথাও যে যাব তারও জায়গা নেই কোনও... সময়মত আশ্রয় নিতে পারব না।

সূর্য অবিরাম অনল ঢালছে আমাদের ওপর। ধু-ধু প্রান্তর। ন্যাড়া পাহাড় আর বিক্ষিপ্ত কাঁটা বন। অসমতল ট্রেইল। চারপাশে অজস্র পাথর, মরা বালিয়াড়ি, জমাট-বাঁধা কালচে লাভার স্তর। ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমরা। আমার সামনে-পেছনে, ডানে-বাঁয়ে ইন্ডিয়ান। সদাসতর্ক, সদাপ্রস্তুত।

টুঁ শব্দ করছে না কেউ।

প্রতিপদে স্ট্যালিয়নটা যেন আমাকে মৃত্যুর দিকে বহন করছে... পরিত্রাণের সম্ভাবনা নেই।

লোগানদের কাছে কোনওরকম সাহায্যের আশা বৃথা। কাহ্‌তেনির বউকে কীভাবে মুক্ত করব জানি না, তবে নিশ্চিত বুঝতে পারছি সহজে ওকে ছেড়ে দেবে না লোগানরা। এমনকী নিরীহ ভদ্রলোকেরাও অ্যাপাচিদের অত্যাচারে বিপর্যস্ত, ক্রুদ্ধ, সমূলে বিনাশ করতে চায় ওদের... সেখানে লোগানরা ভালমানুষের সংজ্ঞায় পড়ে না।

আমি, অ্যাপাচিদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা সর্বদা অটুট। রুক্ষ, সম্ভাবনাশূন্য এলাকায় বাঁচার কৌশল রপ্ত করেছে ওরা। আমাদের উচিত ওদেরকে বোঝার চেষ্টা করা, কী চায় জানা।

কিছুদূর যাওয়ার পর প্রচুর পরিমাণে চোলা গাছের দেখা পেলাম আমরা।

অবারিত প্রসারিত বন, প্রখর সূর্যের নীচে পাণ্ডুর দেখায়, গোড়ার দিকে কালচে খয়েরি অথবা কালো কালো মরা ডাল। মরুবাসীরা একে জামপিং ক্যাকটাস নামেও ডাকে, কারণ ওই গাছের খুব কাছাকাছি গেলে লাফিয়ে মারতে ওঠে। তাই বনের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময়ে এককাতারে এগোল অ্যাপাচিরা।

আমরা আচমকা রাশ টানলাম। সামনে, পুবের একটা নিচু পাহাড় দেখাল কাহ্‌তেনি। 'ওখানে আছে,' বলল ও, ডেড ম্যানস্‌ ট্যাংকে। ওরা ছজন, আর আমার বউ। ওদের লক্ষ্য তুমি।'

আমার লাশ চায় ওরা।

কাহ্‌তেনি যদি নিশ্চিত হত আমাকে খুন করলে তার স্বার্থ হাসিল হবে, একটুও দেরি করত না। কিন্তু আমার মত সেও বিশ্বাস করতে পারছে না লোগানদের। ওরা আমার লাশ নেবে ঠিকই, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে কাহ্‌তেনি তার বউকে ফেরত পাবে।

'অস্ত্রগুলো দাও,' বললাম আমি। 'খালিহাতে গেলে আমরা দুজনেই মারা পড়ব। লোগানদের আমি সামলাতে পারব। আর একবার যদি ওদের কাবু করতে পারি, মনে হয় না অন্যরা বাড়াবাড়ি করবে।'

অবাক কাণ্ড, আজ সারাদিন আমার মন এই উত্তপ্ত মরুভূমি ছেড়ে আমাদের দেশের বাড়ি, কামবারল্যান্ড পাহাড়ে উধাও হয়েছিল। লোকে বলে, মৃত্যুর সময় মানুষ তার পুরো জীবনকে একঝলক দেখতে পায় তার চোখের সামনে। বলছি না তাই হয়েছে আমার... তবে বহুকাল আগের পুরোনো সব ছবি ভিড় জমাচ্ছিল।

কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে, যখন শিশির-বিন্দু ঝরে গাছের পাতা থেকে, পাহাড়ে পাহাড়ে বুনো শুয়োরের সন্ধান করতাম আমরা। কখনও কখনও মিলত। তখন আমাদের সেই আনন্দ দেখে কে! লোহার কড়াইতে ওলকপি দিয়ে বেকন রেঁধে খেতাম।

আমি আর অ্যাঞ্জেল রোজ বেরোতাম শীতের সকালে। যদিও ছোট ছিল, প্রায়ই আসত ও'নীল।

কতদিন দেখিনি জন্মভূমিকে... তবে আমার হৃদয়ে সব সময়েই আছে। প্রায়শ মরু-রাতের তারার পানে চেয়ে বাড়ি ফিরে যেতে সাধ হয় আমার। ভাবতে ভাল লাগে, রান্নাঘরের দরজাটা খোলা রয়েছে, আলো এসে পড়েছে বাইরে, আর আমি হাঁড়িতে করে দুধ দুইয়ে আনছি, ছলকে পড়ছে হাঁটার সময়ে।

সামনে ঘোর বিপদ, অথচ আমি স্মৃতি রোমন্থন করছি। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। বরং কোনও কঠিন কাজের আগে কিছুক্ষণ মনকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে, স্নায়ুর জড়তা যায় কেটে।

স্টিমারে চেপে বিগ সাউথ ফর্কের ভাটিতে, নিউ অরলিনস্‌ যেতাম আমি। সাথে বিক্রির পণ্য থাকত— ভুট্টা, রবিশস্য, গুড়, এবং মাঝে-মধ্যে তামাক। গা-গতর ছাড়া কাউকে আমাদের ওসমানদের দেওয়ার মত বিশেষ কিছু ছিল না

কখনও। খরা লেগেই থাকত আমাদের এলাকায়, ফলে ফসল যা হত, নিজেদের পেটই ভরত না তাতে। তবে ভাটির দেশে ওসমানদের কদর সর্বদা– উচ্ছৃঙ্খল লোকদের শায়েস্তা করতে।

বর্তমানে ফিরে এলাম আমি। দেখলাম পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করছে কাহ্‌তেনি। 'তুমি যাও,' বলল ও, 'আমার বউকে নিয়ে এসো।'

উইনচেস্টার আর গানবেল্ট ফেরত দিল সে, টোটা ভরা আছে কিনা পরখ করলাম। শুষ্ক বালিয়াড়ির মত খটখট করছে আমার মুখ।

'বিপদের জন্যে তৈরি থেকো,' বললাম আমি।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা, তারপর একটা হাত বাড়ালাম আমি। 'একটা পিস্তল ধার দাও,' বললাম ওকে, 'লাগতে পারে।'

একবার শুধু আমার মুখের দিকে তাকাল ও, তারপর নিজের সিক্স-শূটারটা বের করে বাড়িয়ে দিল। নেভি .৪৪, চমৎকার জিনিস। ভেসটের তলায়, কটিবন্ধে গুঁজে রাখলাম আমি।

টোকলানি এগিয়ে এল। 'আমিও আসছি,' বলল ও।

'না, ধন্যবাদ। এখানেই থাকো। ওরা যদি দেখে আমি একা, হয়তো কাছে গিয়ে কথা বলার সুযোগ দেবে। কিন্তু দুজনকে দেখলে গুলি করার ভয় আছে।'

স্ট্যালিয়নের ঘাড়ে আদরের হাত বুলিয়ে ওকে চলার নির্দেশ দিলাম আমি। পেছন থেকে ভেসে এল কাহ্‌তেনির জলদগম্ভীর গলা, 'আমার বউকে আনা চাই।'

তা যদি পারি আমার সৌভাগ্য বলতে হবে। অক্ষত দেহে ফিরতে পারব কিনা তাই সন্দেহ।

'চল, বেটা,' বললাম আমি, 'কথা বলে আসি ওদের সঙ্গে।'

চোলা বনের ভেতর দিয়ে ডেড ম্যানস্ ট্যাংকের উদ্দেশে যাত্রা করলাম আমরা।

সতেরো

জমাট-বাঁধা লাভার পাহাড়। ক্ষীণ নীলচে আঁকাবাঁকা ধোঁয়ার পালক উঠছে। ফিসফিস শব্দে বালু মাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আমার ঘোড়া, খুরের আঘাতে পাথর ছিটকে পড়ছে এদিক-ওদিক। ঋজু হয়ে স্যাডলে বসেছি আমি, উইনচেস্টার স্ক্যাবার্ডে, মন খোলা ও হুঁশিয়ার।

এ-রকম অবস্থায় কোনও আগাম পরিকল্পনাই কাজে আসে না। সমস্যার কেন্দ্রে না পৌঁছুনো অবধি বিপক্ষের অবস্থান, পরিবেশ বোঝা যায় না কিছু। আচমকা উপস্থিত হয়ে কার্যোদ্ধার করতে হয়, ভাগ্যের সহায়তা লাগে।

আমাকে খুন করতে চায় সামনের ওই লোকগুলো। নিঃসন্দেহে এখন আমি ওদের দৃষ্টিসীমায় চলে এসেছি। বোধ হয় খানিকটা তামাসা করার লোভে গুলি করছে না এখনও, কিংবা শুনতে চায় আমার কী বক্তব্য। অ্যাপাচি রমণীর ব্যাপারে একটুও মাথা ব্যথা নেই ওদের। লোগানরা অ্যাপাচি এলাকায় নবাগত, কার বিরুদ্ধে লেগেছে জানে না। কাহ্‌তেনি যদি তার স্ত্রীকে ফেরত না পায়, অক্ষত দেহে একজনও পালাতে পারবে না এখান থেকে... অন্তত সে-চেষ্টাই করবে কাহ্‌তেনি।

পাথরের ভিড়ে অল্পবিস্তর কাঁটাঝোপ। তবে ভাঙা শিলাখণ্ড আর নুড়িপাথরের সংখ্যাই বেশি।

পেছন ফিরতে দেখলাম দুজন অ্যাপাচি দাঁড়িয়ে আছে, মাত্র দুজন। এর অর্থ ছড়িয়ে পড়েছে অন্যরা, চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ, ভদ্র জীবনযাপন এবং ক্যাম্পফায়ারের ধারে নির্ভেজাল আড্ডা পছন্দ করি। আমার চারপাশে অ্যাপাচিদের উপস্থিতি যত বাড়ছে ততই শান্তিপ্রিয় হয়ে উঠছি আমি। একে একে পাশ কাটাচ্ছি পাথরগুলোকে, অনুভব করছি করোটিছাল হারানোর আশঙ্কায় আমার মাথার চুল দাঁড়িয়ে গেছে।

আলতোভাবে হোলস্টারে রেখেছি কোল্ট, ওপরের ঢাকনা খোলা। সংকীর্ণ ট্রেইল ধরে একটা অগভীর বেসিনে হাজির হলাম আমি। অনতিদূরে ডেড ম্যানস্ ট্যাংক, স্বচ্ছ পানি, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে দশ ফুট। ডোবার ও-পাশে একটা আগুন, চিকন ধোঁয়ার রেখা হারিয়ে যাচ্ছে ওপরের নীল আকাশে। ছয়টা ঘোড়া বাঁধা আছে, মনে হলো পাথরের পেছনে যেন আরও দুটোর কান আবছাভাবে দেখতে পেলাম।

লোগান ভ্রাতৃদ্বয় পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে, মুখ আমার দিকে। পাহাড়ের কটিদেশের কাছে বসে আছে এক লোক, হাঁটুর ওপর আড়াআড়িভাবে উইনচেস্টার রাখা। আগুনের পাশে রয়েছে দুজন, বাকি লোকটা সম্ভবত লুকিয়ে আছে কোথাও।

আগুনের ঠিক পেছনে কাহ্‌তেনির স্ত্রী, হাত-পা বাঁধা, এমনকী এই দূরত্বেও স্পষ্ট বোঝা যায় ও তরুণী এবং সুন্দরী। সোজা আমার চোখের দিকে তাকাল মেয়েটা, নিশ্চয়ই ভাবছে ওকে এই ফাঁদ থেকে উদ্ধার করবে ওর মরদ।

এবং পরক্ষণে চোখে পড়ল নোরাকে।

নোরা, আর একজন বালক। চট করে চোরাচোখে আশপাশে নজর বোলালাম আমি, দেখতে পেলাম না আর কাউকে। হয় মারা গেছে, নয়তো সীমান্তের কাছাকাছি রয়েছে, অচিরে পৌঁছে যাবে নিরাপদ স্থানে।

কটমট করে তাকিয়ে আছে টম লোগান। মুখে কুৎসিত হাসি। 'দেখ-দেখ, কে এসেছে,' বলল ও, 'সেই ডেঁপো ওসমানটা।'

'তোমার জন্যে খবর আছে টম,' পমেলে ডান হাতের ওপর বাঁ-হাত রেখে

বললাম আমি। 'কাহ্তেনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ওর বউকে ফেরত চায়।'

'ওকে তোমার লাশ পাঠাতে বলেছিলাম।'

'নিশ্চয়ই ভুল করেছিল শুনতে,' জবাব দিলাম আমি। 'তাই বেঁচে আছি এখনও।'

'বেশিরক্ষণ থাকবে না,' খেঁকিয়ে উঠল অপর লোগান।

'আমার বিশ্বাস অ্যাপাচিদের তোমরা চেনো না,' শুরু করলাম আমি। 'মাথা ঠাণ্ডা করে শোনো।'

'কাহ্তেনি ভয়ঙ্কর লোক, নির্দয়। একা দেখছ বলে ভেবো না আর কেউ নেই। চার গণ্ডা ইন্ডিয়ান আছে ওর সাথে, এই পাহাড় ঘিরে ফেলেছে ওরা– এবং আরও আসছে। প্রাণে বাঁচতে চাইলে ওর বউকে ছেড়ে দাও।'

পাহাড়ের ওপর যে-লোকটা বসেছিল, সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ইন্ডিয়ানদের সাথে আগেও লড়েছি আমরা। মেয়েটাকে ছাড়ব না। খাসা মাল।'

পাশার দান ফেলা হয়েছে, এইবার খেলা জমবে। সবকিছু লক্ষ করছিলাম আমি, ভাবছি শেষ কবে বাঁ-হাতে পিস্তলচালনা অভ্যেস করেছি। ডান হাত পিস্তল থেকে দূরে রয়েছে, বাঁয়ের নীচে, ব্যাপারটাকে ওরা কী চোখে দেখছে? ইচ্ছে করে এটা করেছি আমি, হয়তো এর ফলেই পেয়ে যাব আমার অতিপ্রয়োজনীয় সুযোগ।

'তোমাদের মাথায় যদি ঘিলু বলে কোনও পদার্থ থাকে,' আবার বললাম, 'ওকে ছেড়ে দাও– আর ওই মেয়েটাকে। শ্বেতাঙ্গ মহিলার গায়ে হাত তোলার পরিণাম কী তোমরা ভালই জানো।'

'কচু,' খিকখিক করে হাসল রাইফেলধারী। 'বলি, জানছেটা কে!'

'আমার বন্ধুদের কথা ভুলে গিয়েছ,' বললাম আমি, 'ওরা জানে। ওরাই বলবে সবাইকে।'

'অন্তত বেন মারফি না,' বলল টম লোগান। 'ও কাউকে কিস্যু বলবে না। ওকে ঘোড়ার পিঠে বাঁধা অবস্থায় পেয়েছিলাম আমরা। মনে হলো এমনিতেই মারা যাবে– তো আগেই সাফ করে দিয়েছি।'

ইন্ডিয়ান রমণীর ঠিক পেছনে চলে এসেছে নোরা। বুঝলাম এই চরম বিপদেও বুদ্ধি হারায়নি ও। নিশ্চয়ই মেয়েটার বাঁধন খুলে দিচ্ছে।'

আমাকে এখন সময় কাটাতে হবে। 'খামোকা বিপদ ডাকছ,' বললাম আমি। 'ওকে ছেড়ে দাও, এখনও সময় আছে, পালাতে পারব। আমাদের বিবাদ পরে মীমাংসা করলেও চলবে।'

'নাহ্, তুমি দেখছি খুব বাচাল,' ঘেউ ঘেউ করে উঠল উলফ লোগান। 'তোমাকে মেরে ফেলব আমরা, বুঝতে পারোনি!'

হাসলাম আমি। যেভাবেই হোক ওদের কথায় ব্যস্ত রাখতে হবে। শত্রুকে বাগে আনতে হলে কাল হরণ করতে হবে। সাহস হারালে চলবে না।

'অ্যাপাচিদের সঙ্গে যারা লড়তে চায়, তাদের অধিকাংশই হেরে গিয়ে

নিজেদের ভুলটা ধরতে পারে,' বললাম আমি। 'কিন্তু তখন আর সেই জ্ঞান তাদের কোনও কাজে লাগে না। আমার পরামর্শ শোনো, ছেড়ে দাও মেয়েটাকে, তা হলে হয়তো কাহ্‌তেনির ক্ষমা পাবে।'

'ভয় পাচ্ছ?' বলল রাইফেলধারী, কণ্ঠে বিরক্তির ছোঁয়া, যেন ওর কানের কাছে ভন্‌ভন্ করছে মশা।

'হ্যাঁ, পাচ্ছি। ওরা কী নিষ্ঠুর আমি দেখেছি। আমি–'

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল একজন, 'টম। ইন্ডিয়ান কুত্তিটা–'

বাঁধনমুক্ত হয়ে পালাচ্ছিল মেয়েটা, ক্ষিপ্রবেগে। রাইফেলধারী নিশানা করল। চকিতে বিদ্যুৎ খেলে গেল আমার বাঁ-হাতে, বেরিয়ে এল কটিবন্ধে লুকোনো পিস্তলটা। রাইফেলধারীর এক সেকেন্ড পূর্বে করলাম আমি।

মেয়েটাকে গুলি করেছিল ও, কিন্তু আমার বুলেট তার আগেই ওর হৃদ্‌পিণ্ড ভেদ করায় লক্ষ্য নড়ে গেল। ওদিকে একটা রেমিংটন নেভি শোভা পাচ্ছে উলফ লোগানের হাতে, ঝট্ করে ঘুরলাম আমি।

নোরা আচমকা ওর সবচেয়ে নিকটবর্তী লোকটার উদ্দেশে ঝাঁপ দিল, লাথি মারল হাঁটুর পেছনে। ঢালের ওপর দাঁড়িয়েছিল লোকটা, আকস্মিক আক্রমণে হকচকিয়ে গেল, সাবধান হওয়ার সময় পেল না, সশব্দে আছাড় খেল মাটিতে, পাথরে ঠুকে গেল মাথা।

আগুনের ধারে যে-লোকটা বসেছিল, নিজের পিস্তল বের করার পরিবর্তে নোরাকে পাকড়াও করতে উদ্যত হলো সে। এবং ওই সময়ে উলফকে গুলি করেই টমের দিকে ঘোড়া পরিচালিত করলাম আমি।

দৈত্যাকার স্ট্যালিয়নের পথ থেকে সরার জন্যে সভয়ে এক কদম পিছু হটল। টম, এবং ওর পায়ের তলায় একটা পাথর পিছলে গেল। আছাড় খেল ও, ইতিমধ্যে ওর হাতে পিস্তল উঠে এসেছিল, পড়ে গেল সেটা।

ঘুরে, উলফকে আরেকটা গুলি করলাম আমি। ওর প্রথম গুলিতে আমার কাঁধ ছড়ে গেছে। মোক্ষম মারের জন্যে পিস্তল তাক করছিল উলফ, এমন সময়ে দ্বিতীয় বুলেটটা আঘাত হানল, ও পিছিয়ে গেল এক পা। স্ট্যালিয়নটা তাড়া করল ওকে, গড়িয়ে একপাশে সরে গেল উলফ। আমার চারপাশে এখন গুলিবৃষ্টি হচ্ছে।

কীভাবে যেন একটা পিস্তল জোগাড় করেছে নোরা। লোগানদের এক অনুচরকে গুলি করল সে, তারপর বাচ্চাটাকে পাঁজাকোলা করে ছুট লাগাল ঘোড়ার দিকে।

এইসময়ে ঢালের মাথায় এক অ্যাপাচিকে দেখতে পেলাম আমি, গুলি ছুঁড়ছে আমাদের লক্ষ্য করে। আবার ঘোড়া ঘোরালাম আমি, অনুসরণ করলাম নোরাকে।

ফালতু সময় ব্যয় করল না ও। দুটো ঘোড়ায় স্যাডল চাপানো ছিল, একটার দড়ি খুলে তার পিঠে বাচ্চাটাকে বসিয়ে দিল, তারপর নিজেও উঠল দোল খেয়ে– এবং প্রাণভয়ে মরুপথে ছুটতে শুরু করলাম আমরা।

হঠাৎ সামনে একটা ফাটল পড়ল, প্রায় দশ ফুটের মত চওড়া। লাফিয়ে পার হলো নোরার ঘোড়া। স্ট্যালিয়নের পেটে স্পারের খোঁচা মারলাম আমি, এমনভাবে উড়াল দিল ও যেন ওটা ওর সহজাত বৈশিষ্ট্য। আমরা দুজনেই অবতরণ করলাম নিরাপদে, এবং আবার ছুটলাম।

পেছনে তাকিয়ে কিছু চোখে পড়ল না আমার। কয়েক মাইল পাড়ি দিয়েছি, মন্থর গতিতে সিডার বনের ছায়ায় প্রবেশ করলাম আমরা, এখন হাঁটছে ঘোড়া দুটো। কাঁধ থেকে উইনচেস্টার নামালাম আমি, পরখ করলাম ফের, স্ক্যাবার্ডে ফেরত পাঠালাম। তারপর দুটো পিস্তলেই টোটা পুরলাম নতুন করে। চার-পাঁচবার গুলি ছোঁড়ার কথা মনে আছে আমার, কিন্তু দেখলাম আটটা বুলেট খরচ হয়েছে। অর্থাৎ, কোনও একফাঁকে বের করেছিলাম দ্বিতীয় পিস্তলটা, যদিও সেটা কোনসময়ে স্মরণ হলো না।

গুলি ভরে নোরার পাশে সরে এলাম আমি। বাচ্চাটাকে ওর সামনে স্যাডলের ওপর এক হাতে ধরে রেখেছে।

'অন্যরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'পালিয়ে গেছে। হ্যারি নিজেই একটা ক্ষুদে অ্যাপাচি। ওই লোকগুলোকে দেখামাত্র উধাও হয়েছে।'

'দোয়া করো, যেন বর্ডার পার হতে পারে।'

বদলে যাচ্ছে আমাদের চারপাশের প্রকৃতি। আগের চাইতে ভাঙাচোরা প্রান্তর, তবে গাছগাছালি আছে। সম্প্রতি বৃষ্টিপাত হয়েছে এইদিকে। মরুভূমিতে মাঝে মাঝে হয় এমন, অল্পটাক জায়গা জুড়ে কিছুক্ষণ বৃষ্টি হয়েই মিলিয়ে যায়। এই বৃষ্টিতে পাহাড়ি খানাখন্দ ভরে গেছে। ঘোড়া দুটোকে পানি খাওয়ালাম আমরা।

ভাপ বেরোচ্ছে আমার চোখ থেকে, ঘোরাতে কষ্ট হচ্ছে। আড়ষ্ট হয়ে গেছে আঙুল, নাড়াচাড়া করে রক্তসঞ্চালন স্বাভাবিক করার প্রয়াস পেলাম। মুখে খরা, এক ঢোক পানি খাওয়ার পরেও কাটল না।

সহসা আবার ভীষণ ক্লান্ত বোধ করলাম আমি। পথের ধকল, লড়াই, পালানোর চিন্তা সব একজোট হয়ে ছেঁকে ধরেছে। তবু রওনা হলাম আমরা।

স্খলিত পায়ে এগোচ্ছে ঘোড়া। বার কয়েক স্যাডলে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি; প্রতিবারেই আতঙ্কে সজাগ হলাম, তাকালাম আশপাশে। মন-মরা বোধ করছি। বেন মারা গেছে...ট্যাম্পিকো রোকা নেই... জেমস গ্রীন কোথায়?

শিগগিরই আঁধার নামবে, সীমান্তে পৌঁছুতে চাইলে রাতের মত কোথাও ঠাঁই নিতে হবে আমাদের। প্রয়োজনে আমরা চলতে পারব, ঘোড়াগুলো পারবে না, ওদের বাদ দিয়ে সীমান্তে পৌঁছুনো অসম্ভব।

'ওরা কি এখনও অনুসরণ করছে?' প্রশ্ন করল নোরা।

'জানি না,' জবাব দিয়ে ফের নীরব হলাম আমি।

সূর্য ডুবে গেল, ছায়ারা জমায়েত হলো পাহাড়ে পাহাড়ে। হলুদ আকাশের

পটভূমিতে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত জেগে আছে সাহুয়ারো পর্বতমালা। দূরে ডাকছে একটা কোয়েল, আচমকা দমকা হাওয়ায় কাঁপন ধরল গাছের শুকনো পাতায়। বালুতে আমাদের খুরের ফিসফিস।

চকিতে দেখা দিল একটা নিঃসঙ্গ কয়োট, পরমুহূর্তে হারিয়ে গেল ছায়ার মত। তারা ফুটতে শুরু করেছে...নীচের আকাশে জ্বলজ্বল করছে একটা, স্থির হয়ে রইল। মাঝে মাঝে আমি তাকাচ্ছিলাম ওই তারার দিকে, একসময় বললাম, 'ওই যে একটা আলো। বোধহয় আগুন।'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল নোরা। বলল, 'ইন্ডিয়ান না।'

রাশ টানলাম আমরা। ঘুরে, রেকাবে দাঁড়িয়ে তাকালাম আমি।

'খুব সম্ভব লোগানদের,' বললাম।

নোরার চোখে সংশয়। 'মনে হয় না। তুমি মেরেছো দুটোকে। বাকিদের নিশ্চয়ই অ্যাপাচিরা খতম করেছে।'

নিরুত্তর রইলাম আমি, বড়াই করা আমার স্বভাব নয়।

'যাবে?' বললাম আমি। 'সীমান্তের চেয়ে কাছে হবে।'

'কাছে থেকে একবার দেখলে মন্দ হয় না,' উত্তর দিল নোরা। এগোল আগুনের দিকে।

অন্ধকারের কালো পর্দা এখন ঢেকে দিয়েছে হলুদ আকাশ। দূর থেকেই আমরা দেখতে পেলাম ওটা আর্মি ক্যাম্পফায়ার। বড় দেখাচ্ছে কারণ তিনটে আগুন ধরানো হয়েছে পাশাপাশি। অশ্বারোহী সেনা। আনুমানিক চল্লিশজনের একটা দল। আমরা থামলাম, হাঁক ছাড়লাম আমি।

'হাউডি। ভেতরে আসতে পারি? আমার সাথে একজন মহিলা আর একটা বাচ্চা রয়েছে।'

কোনও সাড়া এল না...

অনেকক্ষণ পর আভাস পেলাম কেউ একজন ফিল্ড গ্লাসের সাহায্যে লক্ষ্য করছে আমাদের।

'ঠিক আছে,' হেঁড়ে গলায় জবাব এল, 'এসো। কোনও চালাকি না।'

আমার পরিচিত গলা। ক্যাপটেন জনসন। পাশে লেফটেন্যান্ট ডেভিস দাঁড়িয়ে।

জনসনের দৃষ্টি আমার কাছ থেকে সরে নোরা পিটারের ওপর স্থির হলো। হ্যাটের কিনারা ঈষৎ উঁচু করল ক্যাপটেন। 'কেমন আছেন, ম্যাম? আপনার জন্যে চিন্তায় ছিলাম।'

'ভাল। সব কৃতিত্ব মি. ওসমানের।'

'আর কোনও বাচ্চা এসেছে, ক্যাপ'ন্?' প্রশ্ন করলাম আমি। 'হ্যারি ব্রুক-'

'এসেছে, সে-জন্যেই তো আপনাদের প্রতীক্ষা করছি,' আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল জনসন।

ক্যাম্পে ঢুকে ঘোড়া থেকে নামলাম আমরা। মাটিতে পা রাখতেই বোঁ করে

ঘুরে উঠল আমার মাথা, টলে উঠলাম। পাশেই দাঁড়িয়েছিল ক্যাপটেন। 'বসে পড়ুন, মি. ওসমান,' বলল সে।

'ঘোড়াটার যত্ন নিতে হবে। ক্যাপ'ন্, আপনি ওদের নিয়ে এগোন, আমি–'

'না।' আচমকা কঠোর শোনাল জনসনের গলা। ঘাড় ফেরাল। 'কর্পোর‍্যাল, এঁর ঘোড়াটা নিয়ে যাও। ভাল করে যত্ন নেবে।'

আমার দিকে ফিরল সে। 'মি. ওসমান, আমি খুব দুঃখিত, কিন্তু আপনি আমাদের বন্দী।'

বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকালাম আমি। 'বর্ডার পেরোনোর দায়ে? ক্যাপ'ন্, কিটি ওসমান আমাকে বলেছিল, তার ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে অ্যাপাচিরা।'

'ওঁর কোনও ছেলে নেই!' রুক্ষ স্বরে জবাব দিল ডেভিস। 'ভাঁওতা দিচ্ছেন আ–'

চাবুকের মত আছড়ে পড়ল জনসনের কণ্ঠস্বর। 'লেফটেন্যান্ট!'

চুপ করল ডেভিস, মুখ লাল। 'আমি বলছি, ক্যাপটেন, এই লোক–'

'থামো! লেফটেন্যান্ট ডেভিস, তুমি বরং গার্ডদের তদারক করো গিয়ে। মি. ওসমানকে যা বলার আমি বলব।'

গোড়ালির ওপর ঘুরে গট্‌গট্ করে চলে গেল ডেভিস। 'কিছু মনে করবেন না, মি. ওসমান। কাঁচা বয়েস, কিটি ওসমানকে চোখে ধরেছে। ভাবছে তার সম্মান রক্ষা করা ওর দায়িত্ব।'

'যত খুশি রক্ষা করুক, ক্যাপ'ন্। কিন্তু আমার কাছ থেকে দূরে থাকতে বলবেন। তখনকার কথাটা আবার বললে মুখ ভেঙে দেব।'

'না, মি. ওসমান, ভুলে যাবেন না, আপনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

নীরবে হেঁটে গিয়ে আগুনের পাশে বসলাম আমি। থলে হাতড়ে কাপ বের করলাম। হাত বাড়িয়ে কফি ঢাললাম পট থেকে।

'বেশ, ক্যাপ'ন্,' বললাম আমি, 'এখন তা হলে বলুন, কেন আমাকে গ্রেফতার করেছেন?'

'খুনের দায়ে। বিলি হিগিন্সকে খুন করেছেন আপনি।'

'হিগিন্স?'

'ইউমার রাস্তায় ওর লাশ পেয়েছি আমরা। মাথায় গুলি করা হয়েছে।'

'অ্যাপাচিরাও আঘাত করেছিল ওকে,' বললাম আমি।

'কিন্তু খুন করেছেন আপনি।'

'করেছি।' আগ্রহী শ্রোতার ভিড় জমে গেছে চারপাশে। ধীরে ধীরে পুরো ঘটনাটা খুলে বললাম আমি। এর কিছু কিছু অংশ আগেও একবার শূ-ফ্লাই রেস্তোরাঁয় ক্যাপটেনকে বলেছিলাম, যখন আমাকে কাহ্‌তেনির কথা জিজ্ঞেস করেছিল সে।

'মেরে ফেলার জন্যে অনুনয় করেছিল বিলি। ওই অবস্থায় আমি নিজেও তা-ই করতাম।'

'হয়তো। কঠিন চোখে তাকাল জনসন। 'ওসমান, আপনি কী অস্বীকার করেন হিগিন্স পরিবারের সাথে আপনাদের বিরোধ নেই? আপনারা একে অপরকে খুনের নেশায় খোঁজেন না?'

'বহুদিন হলো মিটে গেছে সে-সব,' বললাম আমি। 'হিগিন্সদের শেষজন মারা গেছে আমার ভাইয়ের হাতে। তা ছাড়া এই হিগিন্স অন্য লোক, আমাদের দেশের কেউ না।'

'যাই হোক, বিলি হিগিন্স নিহত হয়েছে আপনার বুলেটে। মি. ওসমান, এ-কাহিনি সবাই জানে, টুসানের লোকেরা আপনার ওপর ক্ষুব্ধ। হিগিন্সের বন্ধুবান্ধব আছে ওখানে।'

'আ...আমি বললাম তো, আমি–'

'আমাকে বলে কোনও লাভ নেই। জুরিকে বলবেন।'

চলে গেল ক্যাপটেন, আগুনের ধারে বসে রইলাম আমি, শিখার পানে চেয়ে আছি। দূরপথ পাড়ি দিয়ে এসেছি। প্রাণপণ লড়তে হয়েছে। প্রথমে অ্যাপাচি, তারপর লোগানদের সাথে। আর এখন এমন এক অপরাধে গ্রেফতার হয়েছি আদপে যা কোনও দোষ নয়– অথচ এই অপরাধেই অনায়াসে আমাকে ফাঁসি দিতে পারবে ওরা।

টুসানে হিগিন্স-ওসমান বিবাদের কথা মাত্র একজন ব্যক্তিই জানে।

কিটি ওসমান...

আঠারো

পাহাড়ি লোকের জন্যে হাজত-ঘর খুবই অস্বস্তিকর জায়গা। আমরা যেখানে বড় হয়েছি মানুষ সেখানে পাহাড়চুড়োর দিকে তাকিয়ে থাকত, যদিও আমাদের বেশি উঁচুতে তাকানোর সুযোগ ছিল না, প্রায় খাঁজের মাথায় ছিল আমাদের বাড়ি।

আমার এই ঘরটা নিতান্ত অপরিসর। একটামাত্র জানালা। এত ছোট যে আলো-হাওয়া খেলে না ঠিকমত, পালানোর প্রশ্ন অবান্তর। দরজায় কয়েক ইঞ্চি পরপর লোহার মোটা শিক বসানো। আমাকে হাজতে ঢুকিয়ে ওরা যখন সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল মোটেও খুশি হইনি আমি। কেবল জানতাম ঘুমোতে পারব, আর তিনবেলা খানা মিলবে। তখন আমি এত ক্ষুধার্ত ছিলাম যে একটা পুরোনো স্যাডল, রেকাব খেয়ে ফেলতে পারতাম।

আমার প্রথম দর্শনার্থী ক্যাপটেন জনসন। পরদিন খুব ভোরে এল সে, একটা চেয়ার নিয়ে হাজত-ঘরে ঢুকল। একজন সরকারি কর্মচারীকেও এনেছে সঙ্গে।

'ওসমান,' শুরু করল ক্যাপটেন, 'আপনি পুরো ব্যাপারটা নিজের জবানিতে আরেকবার বলুন। সম্ভব হলে আমি আপনাকে সাহায্য করব। টুসানবাসীরা এখন দোটানায় পড়েছে। বিলি হিগিন্সকে হত্যার দায়ে আপনাকে ফাঁসি দিতে চায় একদল, আবার কেউ কেউ বলছে ওই বাচ্চাদের উদ্ধার করেছেন বলে আপনাকে মেডাল দেওয়া উচিত।'

ফের গোড়া থেকে সব ঘটনা– ইউমায় আমাদের পরিচয়পর্ব, পথে অ্যাপাচি হামলা, বিলির মৃত্যু– খুলে বললাম আমি। তারপর কিটির চিঠি, টুসানে সাক্ষাৎ, এবং ওর হারানো পুত্রের কাহিনি জানালাম।

'আপনি চলে যাওয়ার পর আমি খোঁজ-খবর করেছিলাম,' বলল জনসন। 'কিটির সঙ্গে আপনার ভাইয়ের ডিভোর্স হয়ে গেছে। আপনার ভাইদের সঙ্গে কিটির বাবার ঘোর শত্রুতা ছিল।'

'আমি এ-সব কিছুই শুনিনি আগে। ভাইয়েরা বলেনি। বোধ হয় ভেবেছিল যা মিটে গেছে তা নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।'

'কাল রাতে আপনার কথা মিস কিটিকে বলেছিলাম আমি,' বলল ক্যাপটেন জনসন। 'উনি সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।'

আমি ভাবলেশহীন চোখে তাকালাম জনসনের দিকে। কথাটা যে ডাহা মিথ্যে নতুন করে বলার দরকার হয় না।

'বরং উনি বললেন, আপনার কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়েই আপনি মেক্সিকোতে পালিয়ে গিয়েছিলেন।'

'আমার সঙ্গীরা তো জানত– ওরা তা হলে এল কেন?'

'কিন্তু আপনার বন্ধুরা এখন কোনও উপকারে আসছে না। আপনিই বলেছেন ওরা মারা গেছে।'

'আমি নিজের হাতে কবর দিয়েছি রোকাকে। বেন মারফিকে খতম করেছে লোগানরা। জেমস গ্রীন... ম্, মনে হয় সেও পৌঁছুতে পারেনি শেষ-পর্যন্ত।'

'তার মানে আপনার কোনও সাক্ষী নেই?'

'না, স্যার। একজনও না। দেখুন, ক্যাপ'ন্, ঘটনার সময়ে ওরা কেউই কাছাকাছি ছিল না। দেখা দূরের কথা, শুনতেও পায়নি বিলি কী বলেছিল আমাকে।'

আরও কিছুক্ষণ আলাপ করলাম আমরা, নানান প্রশ্নে আমাকে জর্জরিত করে তুলল ক্যাপটেন, তবে আমরা দুজনেই দিব্যি উপলব্ধি করলাম যে আশাবাদী হওয়ার মত কোনও কারণ নেই আমার। দশ বছর আগে ওই বিবাদের প্রসঙ্গ মুছে গেছে আমার মন থেকে, ইউমায় যখন ওদের সাথে দেখা হয়েছিল হিগিন্স নামটা আমার মাঝে কোনওরকম বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি।

অথচ সেই আমিই কিনা হাজতে বাস করছি, আর জলজ্যান্ত তিন তিনটে খাঁটি মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েও অবাধে এখানে সেখানে বিচরণ করছে কিটি হার্স্ট।

ক্যাপটেন বিদায় নেওয়ার পর বিছানায় বসে সাদা দেয়ালের পানে অপলক চেয়ে রইলাম আমি, উদ্ধার পাওয়ার রাস্তা খুঁজছি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। কোনও উপায়; অবশেষে একসময় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন আবার চোখ খুললাম আমি বেলা পড়ে গেছে, জেইলর দরজায় দাঁড়িয়ে।

'আপনার সাথে একজন মহিলা দেখা করতে এসেছেন,' বলল সে।

'ঠিক আছে।' উঠে দাঁড়ালাম আমি, এখনও ঘুম দূর হয়নি, মাথা ঝিমঝিম করছে। নিশ্চয়ই নোরা, ভাবলাম।

কিন্তু যাকে দেখলাম তাকে মোটেও প্রত্যাশা করিনি আমি। কিটি ওসমান হাজত-ঘরে ঢুকল।

জেইলরের উদ্দেশে ফিরল সে। 'ওর সাথে একটু একা কথা বলতে পারি?'

যখন চলে গেল সে ওর বিশাল নীল চোখজোড়া ঘুরে আমার ওপর স্থির হলো।

'তুমি ফিরে আসবে ভাবিনি,' শীতল গলায় বলল কিটি। 'তবে খুশিই হয়েছি। এখন স্বচোখে তোমার ফাঁসি দেখতে পাব।'

সিদ্ধান্ত নিলাম আমিও মিষ্টি কথায় আঘাত করব ওকে। 'তোমার মনোভাব কিন্তু বন্ধুসুলভ নয়।'

'এখন অ্যাঞ্জেল এখানে থাকলে কী মজাই না হত,' হিসহিস করে উঠল কিটির গলা, পলক পড়ছে না চোখে। 'আর ও'নীল...ওকেই আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি।'

'এর কারণ, বোধ হয় তুমি ওকে বোকা বানাতে পারোনি,' বললাম আমি। 'কিন্তু, ম্যাম, তুমি কি সত্যিই আমার ফাঁসি দেখতে চাও? আমি তোমার কোনও ক্ষতি করিনি। তোমাকে এই সে-দিন পর্যন্ত চিনতাম না।'

'হ্যাঁ, চাই। খবরটা জানার পর অ্যাঞ্জেলের মুখখানা কেমন হয় যদি দেখতে পেতাম।'

'দোয়া করো, পেয়েও যেতে পারো তার দেখা,' বললাম আমি। 'অ্যাঞ্জেল ডাকসাইটে উকিল। সম্ভব হলে ও নিশ্চয়ই আদালতে আমার পক্ষে লড়বে।'

কিটির মনঃপূত হলো না কথাটা। অ্যাঞ্জেলের ব্যক্তিত্ব আকর্ষণীয়, কীভাবে কথা বলতে হয় জানে। ও কতটা নাছোড়বান্দা হতে পারে কিটিরও তা জানা আছে ভাল করে।

'ওর আসা হবে না। তুমি খবর পাঠালে আমি টম লোগানকে লাগাব খুন করার জন্যে।'

'টম? আচ্ছা, তাই তো বলি, এত গোপনীয়তা সত্ত্বেও ও জানল কীভাবে আমরা কোথায় আছি।'

'হ্যাঁ, আমিই লাগিয়েছিলাম তোমার পেছনে। দরকার হলে অ্যাঞ্জেলের বিরুদ্ধেও লাগাব।'

টম এখানে?' সহসা মনে হলো হাজতের দেয়ালগুলো যেন চেপে আসছে আমার দিকে। টম লোগান নিশ্চয়ই জানে আমি হাজতে রয়েছি, আমাকে হত্যা করতে আসবে সে। আড়চোখে জানালাটা একবার দেখলাম, হঠাৎ খুব স্বস্তি বোধ করলাম ওটা উঁচুতে আর ছোট বলে।

'অ্যাঞ্জেলকে ডেকে পাঠাও। ভালই হবে। একঢিলে দুই শিকার পাব।' ওর চোখ দুটো অপ্রকৃতিস্থ দেখাচ্ছে।

'অ্যাঞ্জেলকে এত কাঁচা ভেবো না। টম লোগান গান ফাইটে দাঁড়াতে পারবে না ওর সামনে।'

এতক্ষণ বাতাসের সাথে বকবক করছিলাম। আমার কথা ওর কানে যায়নি, আর গেলেও আমল দিত কিনা সন্দেহ: মুখোমুখি লড়াইতে ও যাবে না। কিটির পরিকল্পনা গোপনে খুন করা, কোনও স্টেজ স্টপে পাহাড়ের মাথা থেকে।

ও যখন চলে গেল, ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করলাম আমি, তারপর ডাকলাম জেইলরকে।

'ক্যাপ'ন্ জনসনকে একটু খবর দিতে পারবেন? জরুরি কথা আছে।'

'নিশ্চয়ই।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল জেইলর। 'আপনি কি সত্যিই হিগিন্সকে খুন করেছেন?'

'আপনি যদি গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ট্রেইলে পড়ে থাকতেন, জ্বলন্ত তীর ছুঁড়ত অ্যাপাচিরা, আপনিও কি নিজের মৃত্যু কামনা করতেন না?'

'এই ব্যাপার? আমি শুনেছিলাম ও আপনার শত্রু ছিল।'

তখন হিগিন্স-ওসমান বিবাদের কাহিনি ব্যাখ্যা করে বললাম আমি। তারপর যোগ করলাম: 'গত দশ বছরের মধ্যে ওই লড়াই নিয়ে মাথা ঘামাইনি আমি। তা ছাড়া যে-লোককে অ্যাপাচিরাই মেরে ফেলবে তার জন্যে একটা বুলেট খরচা করে কী লাভ বলুন?'

'ঠিক,' বলল জেইলর।

ও বিদায় নিলে আবার একলা হয়ে গেলাম আমি, চুপচাপ বসে রইলাম নির্জন সেলে। একটুবাদে দোর খুলে নোরা ভেতরে ঢুকল, হাতে একটা ঢাকনা-দেয়া প্লেট। 'শ্-ফ্লাইরের মহিলা পাঠালেন,' বলল ও। অপরাধীর ভঙ্গিতে মুখ তুলল নোরা। 'আমার কাছে টাকা নেই, থাকলে তোমার জন্যে কিছু আনতাম।'

'এমনিতেই যথেষ্ট করেছ। তোমার বোন কেমন? থাকার ব্যবস্থা হলো কিছু?'

'ক্রীডদের বাসায়। ওরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে আসবে। ডীন ক্রীড বলেছেন, তুমি চাইলে উনি তোমাকে জেল ভেঙে বের করবেন।'

'না। এক নোয়েল ছাড়া আমাদের কেউ আইন ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করেনি কখনও।'

কিছুক্ষণ গল্প করলাম আমরা, তারপর ও চলে গেল। জেইলর ফিরে এসেছে, ক্যাপটেন জনসনের কোনও হদিস পায়নি। কিটি ওসমানের সঙ্গে

ঘুরছিল লেফটেন্যান্ট ডেভিস, তাই এড়িয়ে গেছে ওকে।

আবার একলা হয়ে, গভীর চিন্তায় মগ্ন হলাম আমি। ট্যাম্পিকো রোকা আর বেন মারফি মারা গেছে। সম্ভবত গ্রীনও তাই, কিন্তু ওরা বেঁচে থাকলেও ওদের কেউ আমার পক্ষে ওকালতি করতে পারত না, কারণ হিগিন্সকে গুলি করার সময়ে আমি একা ছিলাম। ঘটনাটা কিটিকে বলা বোকামি হয়েছে। আমার হৃদয় তখন ভারাক্রান্ত ছিল, তা ছাড়া সে-সময় ওকে আমি আপনজন বলেই মনে করেছিলাম।

এমন লোককে খুন করেছি আমি যার নামের সাথে, আমাদের পারিবারিক বিরোধ ছিল এ-রকম আর একটি পরিবারের নামের মিল রয়েছে। এটাই যাবে আমার বিপক্ষে। লোকটা আগেই ইন্ডিয়ানদের হাতে মারাত্মকভাবে জখম হয়েছিল, কিন্তু সেটা আমার মুখের কথা। জ্বলন্ত তীর নিক্ষেপের ব্যাপারটা অ্যাপাচিদের কীর্তি, কেউ তা অস্বীকার করবে না। অথচ যেভাবে গুজব ছড়ানো হয়েছে তাতে ঘটনাটা দাঁড়ায় এ-রকম: একজন পুরোনো শত্রুকে খতম করতে আমি অ্যাপাচি হামলার সুযোগ গ্রহণ করেছি। এই মামলায় আমার জেতার আশা নেই।

টুসানে বিলি হিগিন্সের বন্ধুবান্ধব রয়েছে। শুধু নামে ছাড়া আমাকে বিশেষ কেউ চেনে না। নিজের অজান্তেই আমার বিপক্ষে কাজ করছে লেফটেন্যান্ট ডেভিস। কিটির প্রতি তার বিশ্বাস অগাধ।

ঘটনাবিহীন দুটো দিন পার হয়ে গেল। বিছানায় বসে জেইলরের সাথে দাবা খেলে সময় কাটিয়েছি আমি। একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। আমাকে একা রেখে কোথাও যায় না জেইলর, এবং সদর দরজাটা সব সময় বন্ধ রাখে।

শেরিফ শহরের বাইরে গেছে, হপ্তাখানেকের মধ্যে ফিরবে না। আমি উপলব্ধি করছি মামলার শুনানি যত তাড়াতাড়ি শুরু হয় ততই মঙ্গল। ওরা দেরি করলে, অতিউৎসাহী লোকজন বাড়াবাড়ি শুরু করতে পারে। সে-ক্ষেত্রে হয়তো ধরে-বেঁধে ফাঁসিকাঠে লটকে দেবে আমাকে। পাহাড়ের ডাক লেগেছে আমার রক্তে। হাজত-ঘরের বাইরের দেয়ালে আমার মালপত্র– জিন, লাগাম, স্যাডলব্যাগ, রাইফেল, গানবেল্ট– ঝোলানো রয়েছে। আমি এখন আমার দুই হাঁটুর মাঝে একটা ঘোড়া আর হাতে উইনচেস্টারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি ভীষণভাবে।

ডীন ক্রীড দেখা করতে এল আমার সাথে। জেইলর চেনে তাকে, বিনা দ্বিধায় ঢুকতে দিল ভেতরে। 'আমি বরং একটা পিস্তল এনে দিই তোমাকে,' জেইলর ফিরে যাওয়ার পর বলল ক্রীড। 'ওরা তোমাকে ফাঁসিতে ঝোল্যানোর মতলব করছে। আমি অনেক বুঝিয়েছি– কাজ হয়নি।'

'ওরা কী বলছে?'

'বলছে অ্যাপাচিরা সরে যাওয়ার পর হিগিন্সকে খুন করেছ তুমি।'

জনসনের কোনও পাত্তা নেই। অথচ আমি ওকে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মনে করেছিলাম। অ্যাঞ্জেল, আর ও'নীলকে যদি-বা খবর পাঠানো সম্ভব হয়, সময়মত পৌঁছুতে পারবে না ওরা। এইবার বোধ হয় সত্যি সত্যি আমার সময় ঘনিয়েছে।

লিঞ্চিংয়ের ব্যাপারে উৎসাহী লোকের অভাব হয় না কখনও, যদিও এই নিষ্ঠুর প্রথা বিলোপ করার পক্ষপাতী এমন মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। কিন্তু সৎসাহসের অভাবে ওরা সেটা জোরগলায় প্রচার করতে ভয় পায়। আমি স্বপ্নেও কোনওদিন ভাবিনি আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হতে পারে।

এখন বাইরে চাপা অথচ ক্রুদ্ধ গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি। ওরা ভেতরে আসবে নাকি কথায় ক্ষান্ত হবে বুঝতে পারছি না, ভয় ভয় করছে।

হঠাৎ রাস্তায়, জানালার নীচে দাঁড়িয়ে গলা ফাটাল কেউ একজন। 'আজ তোর শেষ, ওসমান। তোকে ফাঁসিতে ঝোলাব!'

সজোরে মেঝেতে পা ঠুকলাম আমি। 'আয়, হারামির বাচ্চা,' বললাম, 'তোর গলা শুনলেই চিনতে পারব আমি। ভেতরে আয়, দেখাচ্ছি মজা।'

নুড়িপাথরের ওপর কয়েকজোড়া বুটের শব্দ উঠে হারিয়ে গেল দূরে।

সহসা উপলব্ধি করলাম আর ক্লান্তি বোধ করছি না আমি। শ্রান্ত অবস্থায় এখানে এসেছিলাম, গত তিনটে দিনের বিশ্রামে ঝরঝরে হয়ে গিয়েছি। উঠে দরজার কাছে গেলাম।

'জিম।' ডাকলাম জেইলরকে, 'জলদি!'

কোনও সাড়া এল না। আবার চিৎকার করলাম।

তবু কোনও জবাব নেই, ওদিকে ফিসফিস।

জেইলর চলে গেছে– ওরা নিতে এসেছে আমাকে।

উনিশ

সুনাগরিক হিসেবে টুসানবাসীদের সুনাম আছে, আইন মেনে চলে। আমি জানি, বাইরের ওই জনতাও জানে সে-কথা। কিন্তু তারা কী সময়মত আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে? চুপিসারে কাজ সারতে চাইছে ওরা, ঠিক করলাম ওদেরকে সেই সুযোগ দেব না আমি।

সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালাম চারপাশে, খাটিয়ার কাঠামোটা ছাড়া এমন কিছু চোখে পড়ল না যা দিয়ে একটা চলনসই হাতিয়ার তৈরি করা যায়। কাঠামোটা পাইপের, আধ-ইঞ্চি ব্যাস। টান মেরে দেয়াল থেকে খাটিয়াটা খসিয়ে ফেললাম আমি। দুটো পাইপ খুলে নিলাম। একটা প্রায় সাত ফুট লম্বা, অপরটা তিন ফুট, মাথায় এলবো লাগানো।

দুটো টুকরোই হাতের কাছে রেখে বসে রইলাম চুপচাপ। বাইরে কেউ একজন কথা বলছে জানালার কাছে; অফিস-ঘরের কারাসংলগ্ন দরজাটা খুলে গেল দড়াম করে। করিডরে ঢুকে পড়ল কিছু লোক, অফিসে দেখতে পাচ্ছি অন্যদের।

উঠে দাঁড়ালাম আমি। 'তোমরা কি কিছু খুঁজছ?' তাচ্ছিল্যের সুরে বললাম। 'সে-ক্ষেত্রে ভুল জায়গায় এসেছ।'

'বিলি হিগিন্সকে তুই খুন করেছিস– আমরা তোকে ফাঁসি দেব।'

'করেছি খুন– ও বলেছিল করতে। ওই জায়গায় তোমরা হলে, তা-ই করতে।'

ওদের গা থেকে হুইস্কির গন্ধ পাচ্ছি আমি। সাহস সঞ্চয় করতে মদ গিলেছে, তবু এরা যে কঠিন লোক তাতে সন্দেহ নেই। দরজায় চাবি ঢোকানোর প্রয়াস পাচ্ছে কেউ একজন, শব্দে টের পেলাম। আর দেরি করা চলে না।

'এই শেষবারের মত বলছি ভাগো।'

আলো ছাড়া এসেছে ওরা, মাইন-পিটের মত ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমাকে সেল থেকে বের করার জন্যে আলোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি, যথাসম্ভব কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে কাজ হাসিল করতে চায়। আমি একা– ওরা বিশজন।

'দেখ, আবার হুকুম দিচ্ছে!' টিটকারি মারল একজন।

লম্বা পাইপটা তুলে নিলাম আমি, তারপর যখন শুনলাম তালা খোলার চেষ্টা চলছে, দুহাতে আঁকড়ে ধরলাম ওটা, কাঁধ বরাবর তুলে সজোরে ঢুকিয়ে দিলাম গরাদের ফাঁকে। আঁধারে স্বল্প পরিসর জায়গায় এটা মারাত্মক অস্ত্র। করিডরটা সরু, গাদাগাদি করে দাঁড়িয়েছিল ওরা।

সারা শরীরের শক্তি দিয়ে পাইপটা ঠেসে ধরলাম আমি। ভাঙল একটা কিছু, তারপর একটা চাপা বুকফাটা আর্তনাদ।

'কী ব্যাপার?' চেঁচিয়ে উঠল একজন, বক্তার স্বরে আতঙ্ক।

পাইপটা পেছনে টেনে কোমরের কাছে ধরলাম আমি, আবার ঢুকিয়ে দিলাম গরাদের ফাঁক দিয়ে।

আরেকটা আর্তনাদ, তারপর চিৎকার, 'চলে এসো! আল্লার দোহাই, তাড়াতাড়ি ভাগো এখান থেকে!'

আরেকজন ধমক লাগাল, 'হলোটা কী? পাগল হয়েছ নাকি? বের করো ওকে!'

এ-বার ওই কণ্ঠস্বরের উদ্দেশে পাইপ হাঁকালাম আমি। ফের আর্তচিৎকার শুনলাম একটা। তারপর আরেকটা গলা ভেসে এল, 'চলো! চলো!'

হুলস্থুল পড়ে গেল করিডরে, তাড়াহুড়ো করে পালাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে সবাই। আবার ঢোকালাম আমি, এ-বার গোড়ালি-সমান উঁচুতে, হুমড়ি খেয়ে পড়ল কয়েকজন। এলোপাতাড়ি গুলি চালাল কেউ একজন, আমার কয়েক ফুট

দূর দিয়ে চলে গেল বুলেট। আগুন লক্ষ্য করে গুঁতো মারলাম আমি, ককিয়ে উঠল লোকটা, তারপর দুড়দাড় করে ছুটে পালাল। সহসা ফাঁকা হয়ে গেল করিডরটা, কেবল একজন মেঝেতে পড়ে গোঙাচ্ছে।

'উচিত সাজা,' শান্ত গলায় বললাম আমি।

'প্লিজ! আমাকে তোলো!'

'কীভাবে?' বললাম আমি। 'তুমি বরং হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে যাও, তোমার ওই খুনে বন্ধুদের বলো সাহায্য করতে।'

আবার কাতরানির আওয়াজ শুনলাম, তারপর হামা দিয়ে রওনা হলো অজানা আততায়ী। দেয়ালের পাশে পাইপটা রাখলাম আমি, অপেক্ষা করছি। ওরা যদি আসে, নিশ্চয়ই গুলি করবে– তবে আমার বিশ্বাস আর আসবে না।

সদর রাস্তায় রাগত স্বরে জেরা করছে কে যেন। তারপর বাইরের দরজাটা খুলে গেল। ফস্ শব্দে একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠল, লণ্ঠন ধরাল কেউ একজন। একসাথে কয়েকটা মুখ উঁকি দিল করিডরে। একজনকে আমি চিনি, জন টিটাস।

'কী ব্যাপার? কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল টিটাস।

এক লোক পড়ে আছে মেঝেতে। রক্তের ধারা দেখে বোঝা যায় আরেকজন বুকে হেঁটে বেরিয়ে গেছে এখানে থেকে। সেলের বাইরে দড়ির বান্ডিল আর একটা পিস্তল পড়ে আছে।

'আমাকে নিতে এসেছিল,' গরাদে হেলান দিয়ে বললাম আমি, 'ফাঁসি দেবে। আমি বাধা দিয়েছি।'

টিটাসের মুখে মেঘ। 'দুঃখিত, মি. ওসমান। ওরা মাতাল, ভবঘুরে– টুসানের কেউ নয়।'

'আমারও তাই মনে হয়েছিল,' বললাম আমি। 'মি. টিটাস, একটা উপকার করবেন, কাউকে পাঠিয়ে এক পট কফি আর কিছু খাবার আনিয়ে দিতে পারবেন আমাকে– ক্ষিদে পেয়েছে।'

'দাঁড়ান, সব ব্যবস্থা হবে। জিম'– জেইলরের দিকে ঘুরল টিটাস– 'চাবি দাও। ওসমানকে আমি ডিনারে নিয়ে যাব।'

আবার চারদিকে তাকাল সে। আহত লোকটাকে পরীক্ষা করছিল ডাক্তার, মুখ তুলল। 'পাঁজরার তিনটে হাড় ভেঙেছে, ফুসফুস ফুটো হয়ে গেছে,' রায় দিল সে।

'সে ওর সমস্যা,' ঝাঁঝাল গলায় বললাম আমি।

'ঠিক,' একমত প্রকাশ করল টিটাস।

ঘটাং শব্দে উন্মুক্ত হলো সেলের দরজা। 'চলুন, মি. ওসমান, আপনি আমার মেহ্‌মান।'

'যাচ্ছি,' বললাম আমি, 'তবে আগেই বলে রাখি, আমি কিন্তু পেটুক মানুষ।'

আমরা যখন ঢুকলাম শূ-ফ্লাই ফাঁকা ছিল, কিন্তু একটুবাদেই ভরে গেল রেস্তোরাঁ।

আহার-শেষে চেয়ারে হেলান দিলাম আমি। একজন টুসানবাসী আমার উইনচেস্টার আর গানবেল্ট নিয়ে এল। 'এগুলো রাখুন,' বলল সে, 'দরকার হতে পারে।'

'ভাবছি,' বললাম আমি, 'এই ঝামেলা না মেটা পর্যন্ত এখানেই থাকব। একজন ভালমানুষকে খুন করেছি আমি। না মারলে হয়তো আরও কিছুক্ষণ বাঁচত ও—'

আমি হলেও মেরে ফেলতে বলতাম,' নিজের অভিমত জানাল টিটাস।

এরপর চুপ হয়ে গেলাম আমি। পেট পুরে খেয়েছি, ফেরত পেয়েছি অস্ত্রশস্ত্র, এখন এই ঝামেলা মিটলেই নিউ মেক্সিকোতে, ও'নীলের বাথানের উদ্দেশে রওনা হতে পারি।

থমথমে মুখে রেস্তোরাঁয় ঢুকল ডাক্তার, তাকাল আমার দিকে। 'আপনি খুব খারাপ লোক,' বলল সে। 'চারজন লোককে শয্যাশায়ী করেছেন। চোয়াল ভেঙে নটা দাঁত হারিয়েছে একজন। কাঁধের পেশী ছিঁড়ে গেছে আরেকজনের। মাথা ফাটিয়েছেন একটার, ফুসফুসে জখমঅলা লোকটা বাঁচলে সে ওর ভাগ্য।'

'ওরা লাগতে এসেছিল আমার সঙ্গে,' বললাম আমি।

দোর ঠেলে দুজন লোক ঢুকল ভেতরে। ক্যাপটেন জনসন, সঙ্গে টোকলানি। চারদিকে তাকাল ওরা, তারপর আমার ওপর চোখ পড়তে এগিয়ে এল।

'ওসমান,' বলল ক্যাপটেন, 'কাহ্‌তেনির সঙ্গে কথা বলেছে টোকলানি। আপনার বক্তব্য সমর্থন করেছে ওরা। কাহ্‌তেনি সব ঘটনা খুলে বলেছে আমাদের।'

কাহ্‌তেনির সাথে কথা বলেছ তুমি?' টোকালানিকে প্রশ্ন করলাম আমি।

'উনিও,' ক্যাপটেনের দিকে ইঙ্গিত করল টোকলানি। 'আমরা দুজন অ্যাপাচি ক্যাম্পে গিয়েছিলাম।'

'বিরাট ঝুঁকি নিয়েছেন আপনি,' জনসনকে বললাম।

'কিছু না। অ্যাপাচিরাই সব বলতে পারবে আমি জানতাম। আপনার খুব প্রশংসা করেছে কাহ্‌তেনি।'

'ওর বউকে ফিরে পেয়েছে?'

'হ্যাঁ,' বলল ক্যাপটেন, 'ও আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে, ওসমান। বলেছে দরকার হলে নিজে এসে আপনার জন্যে সাক্ষ্য দেবে।'

এভাবেই ইতি হলো ঘটনার। আর কেউ হাজতে ফেরত পাঠাতে চাইল না আমাকে। তবু শেরিফের অপেক্ষায় শহরে থাকা সাব্যস্ত করলাম আমি, যেন পরে কোনওরকম বিতর্কের সূচনা না হয়। রাস্তায় পথচারীদের অনেকেই বাচ্চাদের উদ্ধার করায় ধন্যবাদ জানাল আমাকে।

কিন্তু কিটির ছায়াও দেখতে পেলাম না কোথাও... ও কি চলে গেছে? না আবার কোনও চক্রান্ত শানাচ্ছে?

নোরার কথা মনে পড়ে। ইচ্ছে থাকলেও, ওর সাথে মাখামাখি করার উপায় নেই, টানাটানি চলছে আমার, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মি.রকফেলোর গরুর পাল সালফার স্প্রিংস্ ভ্যালিতে পৌঁছে দিয়ে সামান্য যা রোজগার হয়েছে, পেট চালাতেই তার প্রায় সবটা বেরিয়ে যাচ্ছে।

শেরিফ ফিরে এল। শুনানির পর আমাকে নিঃশর্ত রেহাই দিল সে। এখন যাত্রার পালা, অথচ রসদ কেনার মত সামর্থ্য নেই আমার।

শূ-ফ্লাই রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে শুনলাম পায়ারিটোসের কাছে মাইন ক্লেইম করেছে পিট কিচেন। ওর সঙ্গে দেখা করলাম আমি। এ-কাজে আমার অভিজ্ঞতা আছে শুনে আমাকে চাকরি দিল ও।

খাবার দেওয়ার সময় এক বাক্স .৪৪ কার্তুজ আনল পিট। 'তোমার যা শত্রু,' বলল ও, 'এগুলো রাখো– কাজে লাগবে।'

পাহাড় হিসেবে পায়ারিটোস এমন আহামরি কিছু নয়। টিলার মাথায় পাখির মত পাথরের বিন্যাস– তাই এই নামকরণ। একটা মালবাহী খচ্চরসহ স্যাডলে চেপে ওখানে গেলাম আমি, খুঁজে বের করলাম খনিটা।

পাহাড়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে একটা ঝরনা। কিছু আকরিক সোনা রয়েছে নীচে। উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, তবে গভীরে আরও পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

একটা টিলার পেছনে, ঝোপ আর পাথরচাঁইয়ের আড়ালে ক্যাম্প করলাম আমি। তারপর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ভাবতে বসলাম।

এই জায়গাটা ওলটপালট হয়েছে ভূমিকম্পের ফলে। ভূ-বিদ্যায় একে বলে স্তরভঙ্গ বা স্তরচ্যুতি। অতীতকালে মাটি তোলপাড় হয়ে সৃষ্টি হয়েছে এইসব পাহাড়। সোনা যা আছে তা স্ফটিকের আকারে, শিরার মত। ওই ঝরনাবক্ষ মূলত চুনাপাথরের, পাললিক শিলার ওপর ভর করে আছে। তবে যে-সব জায়গায় ভিন্ন কোনও স্তরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সেখানে আকরিক আছে।

আমার দায়িত্ব ওইসব এলাকা খুঁড়ে সেখানে কিচেনের দাবি প্রতিষ্ঠা করা, এবং সম্ভব হলে দেখা নীচে কী আছে। এতে খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হয় না, তবু কিচেনের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি, কারণ কখনোই যেনতেন প্রকারে কোনও কাজ শেষ করা আমার স্বভাব নয়। আমার মতে যে-কোনও কাজই মন-প্রাণ ঢেলে সম্পাদন করা উচিত। তাই শাবলহাতে ঝরনার পাড়ে গেলাম আমি।

আমার কাছে ডিনামাইট আছে, কিন্তু ব্যবহার করার ইচ্ছে নেই। বিস্ফোরণে বিকট শব্দ হয়, এ-অঞ্চলের সব অ্যাপাচি ছুটে আসবে। কিন্তু আমি গোপনে কাজ সেরে পিটের বাথানে ফিরে যেতে চাই।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরিশ্রমের পর বিশ্রাম নিলাম। হঠাৎ মৌ-মাছির

আনাগোনা চোখে পড়ল। কৌতূহল জাগল। শাবল, গাঁইতি আর উইনচেস্টার নিয়ে অনুসরণ করলাম ওদের। পাহাড়ের স্কন্ধদেশের কাছে মরু-শেয়ালের ট্র্যাক দেখতে পেলাম।

ওই ট্র্যাক আর মৌ-মাছির পিছু নিয়ে অচিরেই একটা পাহাড়ি ফাটলের ধারে উপস্থিত হলাম আমি। টলটল করছে পানি। দুটো ঝরনাধারা ওপর থেকে নেমে এসেছে ওই গর্তে। মাটি থেকে ভাঙা অকোটিওর ডাল কুড়িয়ে নিয়ে পানির গভীরতা মাপলাম। প্রায় ছফুটের মত গভীর... আমাদের চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট। একটা চাতালের আড়ালে গর্তটা লুকোনো, পরিষ্কার বরফশীতল পানি।

পরদিন সকালে দ্রুত নাস্তা সেরে আবার কাজে মন দিলাম আমি। এখানে-সেখানে কিছু উৎকৃষ্ট আকরিক চোখে পড়তে একপাশে সরিয়ে রাখালাম। অধিকাংশ সোনাসন্ধানী যা করে এখন তাই করছি আমি। বেছে বেছে ভাল খণ্ডগুলো আলাদা করে রাখছি। প্যানে বালু ছেঁকে রঙ পেলাম কিছু। আশান্বিত হওয়ার মত কিছু নয়। যেখানে আমি খুঁড়ছি, সেখানে গিয়ে ওই শিরা যদি চওড়া না হয়, পিটের খরচা পোষাবে না।

রাত নাগাদ মনে হলো আমার পরিশ্রম সার্থক হতে চলেছে। তিন থলে নমুনা সংগ্রহ করেছি আমি, বালু ছেঁকেও কিছু গুঁড়ো পেয়েছি।

পরবর্তী দুটো দিন উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খাটুনি দিয়ে কিচেনের ক্লেইম পাকাপোক্ত করার ব্যবস্থা করলাম। আর একদিন, তারপর আমি ফিরব টুসানে।

এই ফাঁকে নিজের জীবন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ পেয়েছি আমি। এভাবে উড়নচণ্ডীর মত ঘুরে বেড়ানোর কোনও অর্থ হয় না– এখন আমার কোনও চাকরিতে লেগে পড়া উচিত, সারাজীবনের জন্যে।

এর অর্থ কঠোর পরিশ্রম। জীবন চালানো অনেকটা পর্বতচড়াই ভাঙার মত– চুড়ো সব সময়েই কল্পনার চেয়ে দূরে থাকে, তবে মানুষের যখন কোনও লক্ষ্য থাকে, সে উৎসাহ পায় কাজের।

পরদিন সকালে, সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা পর পকেটে পৌঁছুলাম আমি।

ভাঙাচোরা, বিকৃত স্ফটিকের একটা শিরা। আপাতদৃষ্টিতে বোঝার উপায় নেই ভেতরে কী আছে। বড়জোর একটা পিয়ানোর সমান আয়তন, তবে এটা আরও বৃত্তাকার একটা শিরার অংশ মাত্র। যাই হোক, পরের তিনটে ঘণ্টায় ওই স্ফটিক ভেঙে প্রায় দুহাজার ডলার মূল্যের সোনা বের করলাম আমি।

পিট কিচেন খুব খুশি হবে। গর্তে একটা থলে ঢুকিয়ে দামী পদার্থগুলো তাতে ভরলাম। শেষ থলেটা ভরছি নিবিষ্ট মনে, কোনওদিকে খেয়াল করার সময় নেই, হঠাৎ পেছনে একটা পরিচিত গলা শুনলাম। 'আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম– একেবারে ডবল লাভ!'

কিটি ওসমান, সঙ্গে তিনজন লোক– টম লোগান, জনি হুইলার, একটা চোরাচালানি দলের ভাড়াটে পিস্তলবাজ, এবং আর একজন। ডেড ম্যানস্ ট্যাংকের লড়াইয়ে লোগান বাহিনীতে এও ছিল।

এখানে ওদের আসার উদ্দেশ্য একটাইঃ আমাকে খুন করা। এ-বার আর কথায় কাজ হবে না, তাই আমিও বৃথা সময় নষ্ট করলাম না।

ঘুরেই দেখলাম ওদের, এবং আমার .৪৫ বের করে গুলি করলাম। পুরো ঘটনাটাই ঘটল একনিশ্বাসে। আমার প্রথম গুলি আঘাত করল জনি হুইলারকে, ওর হাত ছিল পিস্তলের বাঁটের কাছে।

পাঁজরা ভেদ করে বেরিয়ে গেল বুলেট। দ্বিতীয় গুলিটা করেছিলাম টম লোগানের উদ্দেশে, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলাম। সহসা ঘোড়া ঘুরিয়ে পালাতে শুরু করেছে টম।

হ্রেষারব করে পেছনের পায়ে সোজা হলো কিটির ঘোড়া, স্যাডল থেকে পড়ে গেল ও। তিন নম্বর খুনী জমে গেছে পাথরের মত, দৃষ্টি আমার পেছন দিকে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে একদল অ্যাপাচি, ওদের ভেতর কাহ্তেনিকে চিনতে পারলাম।

আমাকে পাশ কাটাল অ্যাপাচিরা, একটা অ্যাপাচি পিস্তল গর্জে উঠল, দেখলাম পড়ে যাচ্ছে লোগানের সাঙাৎ, কলকল করে রক্ত বেরোচ্ছে পেট থেকে। আবার ওঠার প্রয়াস পেল লোকটা, আরেকটা বুলেট ওর ভবলীলা সাঙ্গ করল।

টম লোগানকে পাকড়াও করেছে ওরা।

কাহ্তেনি এবং আরও দুজন ধাওয়া করছিল ওকে। শেষ-মুহূর্তে রুখে দাঁড়িয়েছিল টম, কিন্তু পরপর তিনটে ল্যাসো উড়ে গেল ওর দিকে।

আগেই ওকে সাবধান করেছিলাম আমি। কাহ্তেনির স্ত্রীকে অপহরণ করেছিল ও, এর খেসারত ওকে দিতে হবে। এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা– কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে টম লোগান।

এ বড় কঠিন দেশ, এখানকার জীবনধারাও কঠিন। নিয়ম ভাঙলে তার মাশুল গুনতেই হবে।

আমি উঠে আমার ঘোড়ার কাছে গেলাম। সিক্স-শূটারে টোটা পুরলাম আবার। তারপর, যাকে গুলি করেছিলাম সে বেঁচে আছে কিনা দেখতে গেলাম। নেই। জনি হুইলার শকুনের খোরাকে পরিণত হয়েছে।

ওর পিস্তল এবং পকেটে যা কিছু ছিল সংগ্রহ করলাম আমি। শনাক্তকরণের জন্যে লাগবে। ওর খবর জানার ব্যাপারে হয়তো আগ্রহ থাকতে পারে কারও।

ওদিকে উঠে দাঁড়িয়েছে কিটি, পরস্পরের দিকে তাকালাম আমরা। কোনও মানুষের চোখে অত ঘৃণা আমি দেখিনি কখনও।

'পাপের ফল,' বললাম, আমি।

'নিশ্চয়ই আমাকে খুন করবে তুমি?' বলল ও।

'না। মারলে মানবজাতির উপকারই হত, কিন্তু আমি মেয়েলোকের গায়ে হাত তুলি না। না, তোমাকে রেখে যাব এখানে।'

'এখানে?' কিটি আঁতকে উঠল।

'ওখানে একটা ঘোড়া আছে। ওটায় চেপে চলে যাও।'

রেকাবে পা রেখে স্যাডলে চাপলাম আমি। তবে মুহূর্তের জন্যে চোখ সরাইনি কিটির ওপর থেকে।

প্যাকহর্সের দড়িটা স্যাডলহর্নের সাথে পেঁচিয়ে বাঁধলাম। 'ইন্ডিয়ানরা যদি ফিরে আসে?' প্রশ্ন করল কিটি।

'এলে ওদের কপাল পুড়ল,' বললাম আমি। 'না এলেই ভাল করবে। অ্যাপাচিরা খারাপ লোক না। এমনিতেই ওদের সমস্যার শেষ নেই, তার ওপর যদি তোমাকে নেয়, ওদেরকেও বিষিয়ে তুলবে তুমি।'

হ্যাটের কারনিসে আঙুল ছোঁয়ালাম আমি। 'চলি!'

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল আমার স্ট্যালিয়ন, যেন জানে ওর পেছনে কী আছে। যখন ও টিলার মাথায় উঠল, আমরা রাইফেলের আওতার বাইরে এসে পড়লাম। রাশ টেনে পেছনে তাকালাম আমি।

একটা ঘোড়া ধরে ওঠার চেষ্টা করছে কিটি। ওর স্কার্টের ঘষায় ভড়কে গেছে ঘোড়াটা, বারবার সরে যাচ্ছে।

কিটির সাথে এরপর আর দেখা হয়নি আমার।

পুবের পথে রওনা হলাম আমি। পেছনে অস্ত যাচ্ছে সূর্য, সন্ধ্যা আগমনের সাথে সাথে শুরু হয়েছে ফুরফুরে বাতাস। একটা চওড়া গর্তে নেমে গেল ট্রেইল, আঁধার ঘনাচ্ছে, কাছেই কোথাও কোয়েল ডাকল। পিট কিচেনের বাথান দূরের পাহাড়ে, কয়েক ক্রোশ পথ। ওখানে পৌঁছুনোর আগেই ক্যাম্প করব আমি। রাতের বেলায় কিচেনের র‍্যাঞ্চে সুস্থমস্তিষ্কে কোনও মানুষ যায় না।

এই কাজের জন্যে আমাকে বিশ ডলার মজুরি দিচ্ছে ও, হয়তো মুনাফার একটা অংশও দেবে। তবে সবই আমার অনুমান। ভাবছি বিদায় নেওয়ার পূর্বে নোরার সাথে দেখা করব একবার।

মেয়েটাকে ভাল লেগেছে আমার। ভদ্র সুন্দরী সাহসী।

একটা তারা ফুটল। কোমল মরু-রাত। ঠাণ্ডা নামছে।

গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার, পাছে ঘোড়াটা ভড়কে যায় তাই আর সাহস করলাম না।

***